

আমি মারী আঁতোয়ানেৎ

শৌনক গুপ্ত

১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০৭৩

লোকান্তরিতা

পূরবী মুখোপাধ্যায়কে

মৃত্যু যাঁর কাছে/আশ্চর্য ভঙ্গিতে নতজানু

প্রচ্ছদ/অরুণকুমার ঠাকুর

প্রকাশক/কল্যাণ দে

মুদ্রক/কনটেমপোরারী প্রিণ্টার্স

১৩, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯।

প্রথম প্রকাশ/রথযাত্রা/১৩৭১

ইতিহাসে কোনো চরিত্র মারী আঁতোয়ানেৎ-এর মতো এত প্রাণোচ্ছল নয়, কোনো জীবন এত অভিশপ্তও নয়। কোনো যুগ এত বর্ণময় নয়, এত আতঙ্কময়ও নয়, যেমন ছিলো ফ্রান্সে, যখন অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী-কন্যা অপরিণত মনের এই মেয়েটি হাসিখুশিতে উচ্ছল হয়ে এসেছিলো ফরাসী যুবরাজকে বিয়ে করতে।

যখন আকস্মিক দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠলো, রানী স্থির করলেন নিজের বিষয়ে চিঠি ও কাগজপত্র সংগ্রহ করে ঘটনার একটা বিস্তারিত বিবরণী লিখে রাখবেন যাতে উত্তরপুরুষরা তাঁকে সঠিক বিচার করতে পারেন। বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থ বিশ্বের অদ্বিতীয়া মোহময়ী সম্রাজ্ঞীর নিজেরই জবানীতে লেখা সেই দুর্লভ কাহিনীর উপন্যাস রূপ।

শৌনক গুপ্তর অন্যান্য গ্রন্থ

পাখি আমার একলা পাখি (উপন্যাস)

গ্রীষ্ম শীতে অনেক ঋতু ('দুই পৃথিবী' নামে চলচ্চিত্র আসছে)

হো চি মিন (জীবনী)

ফিদেল কাস্ত্রো (জীবনী)

অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া (উপন্যাস)

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে, কান্না হাসির দোল দোলানো অনেক অন্তরঙ্গ অথচ অচেতন মুহূর্তকে নিঃশেষে পাশ কাটিয়ে, আজ আমার সময় হলো নিজের স্মৃতিচিত্রণে মনোনিবেশ করার। জীবনে অনেক ভালবাসার সঙ্গে অনেক ঘৃণা, নিন্দা আর অপযশের অংশীদার হয়েছি। তবে এখনও সন্দেহ রয়ে গেছে, সে সব নিঃসংশয়ে আমার প্রাপ্য কিনা। হয়তো বা বুদ্ধিবৃত্তিতে সূক্ষ্মতার অভাব, অন্ধকার রাতের কাঠিন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রখর সূর্যালোকে নিরন্তর অবগাহনে আমার একান্ত অভীপ্সা, আমার চরিত্রগত ভালমানুষী এবং চাপল্য অনেক অজানা, অচেনা ভুলের দিকে আমার পদক্ষেপকে এগিয়ে দিয়েছে, তবু আমার একান্ত বিশ্বাস সারাজীবন ধরে কারও কোন ক্ষতি করতে চাইনি আমি, কারও ওপর প্রতিশোধ নেবার প্রবল যন্ত্রণায়ও অস্থির হয়ে উঠিনি। হয়তো বা কোন কোন মুহূর্তে স্বামীর ওপর অন্যায় আব্দার করেছি, নিপাট ভালমানুষ স্বামীও আমাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নিজের চরম বিপদ ডেকে এনেছেন কিন্তু এই মুহূর্তেও আমি একান্তভাবে জানি সে সব ঘটনার আবর্তে যাঁরা আমাকে টেনে এনেছেন, তাঁরা আমার চরমতম ক্ষতি করতে, আমাকে ধ্বংস করে ফেলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। মূর্খ আমি, তাঁদের ছলনার জালকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার মতো বুদ্ধিবৃত্তি আমার কখনই ছিলো না। আমার এই অক্ষমতা সম্পর্কে আমার মা, অস্ট্রিয়ার ভূতপূর্বা সম্রাজ্ঞী, মারিয়া থেরেসা বরাবরই অবহিত ছিলেন, জানতেন তাঁর নিযুক্ত আমার উপদেষ্টারাও। আমার দুর্ভাগ্য তাঁদের সব উপদেশ, সব সতর্কবাণী আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, আমোদ-প্রমোদের উচ্ছলতায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে বারবার ভেবেছি এমনি করেই বুঝি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবো। এখন বুঝতে পারছি কারও কাটে না, আমারও কাটলো না। কিন্তু সে সব

ছেলেমানুষী চাপল্যের দাম যে এমন কঠিনভাবে, স্বামী সন্তান এমনকি নিজের জীবন দিয়ে পরিশোধ করতে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আজ জল ঝরছে ; সারা দেহে, সারা মনে।

মনের মনিকোঠায় কত যে ছবি পরপর সাজানো রয়েছে, তাদের কাকে ছেড়ে কাকে যে টেনে আনি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার সঠিক পরিচয়ই বা কি ? আমি মারী আঁতোয়ানেৎ অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা, যৌবরাজ্যে অভিষিক্তা হয়ে প্রথম এই ফ্রান্সে পা বাড়িয়েছিলাম, তারপর দীর্ঘকাল আমি ফ্রান্সের রানী। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্ত্রী, মা, প্রেমিকা। আজ সব হারিয়ে শুধু মনে হচ্ছে আমি মা। এতকাল ধরে এই অসহ্য শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও যে বেঁচে রয়েছি তার একমাত্র কারণ আমার মেয়ে আর ছেলে। এই মুহূর্তে ওদের জন্যে উদ্গত অশ্রুতে আমার চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, তবু জানি ওরা আছে, ওরা এখনও এই পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এতবড় বিস্ময় বুঝি আমার জন্যে আর কিছু নেই। সেই মাতৃত্বের অবিস্মরণীয় ইতিহাস আমি বলে যেতে চাই অমোঘ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। এখন আমি জানতে পেরেছি মৃত্যু মোটেই ভয়াবহ হতে পারে না। সাহস চাই বেঁচে থাকার জন্যে, প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার যন্ত্রণাকে জয় করার জন্যে। মৃত্যু তো সর্বংসহা।

চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেমানুষী চোখে দেখা সেই অপরূপ দৃশ্যটা এখন চোখের ওপর ভাসছে। মাকে ছেড়ে এসেছি প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। শুধু মাকে নয় আমার আবাল্য পরিচিত পরিবেশকে, আমার শৈশব-কৈশোরের ভালো লাগা আর ভালবাসার জীবনকেও। যেন স্বপ্নের ঘোরে দিনরাত্রির সব মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে। স্বামীর সঙ্গে মিলতে যাচ্ছি আমি, ফরাসী দেশের মাটিতে ফ্রান্সের যুবরাজ লুইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি হবো ফ্রান্সের যুবরানী। ভয়ে আর বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। ওদের রীতিনীতি জীবনবোধ

কিছুই জানা নেই আমার। শেখানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মা আর আমার জন্যে বিশেষভাবে নিযুক্তা শিক্ষিকারা। আমি কিছু শিখতে পারিনি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ফরাসী ভাষা খানিকটা লিখতে পারলেও ফরাসী রাজগৃহের বধূ হবার জন্যে যে রীতি, যে শৃঙ্খলাবোধ, যে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে আমাকে বারবার তালিম দেওয়া হয়েছে, তার ছায়াটুকুও মনের কোণে আশ্রয় পায়নি। শুধু নিজের সম্পর্কে ভাসা-ভাসা একটা ধারণা আছে মাত্র। আমার মুখশ্রী সুন্দর, আমার গায়ের রঙ পরিশীলতায় স্বচ্ছ, আমার ত্বক মাখনের মতো কোমল আর রমণীয়। মাথায় একগোছা ঢেউখেলানো সুন্দর চুল, যদিও আমার উঁচু কপালের সবটুকু তাতে ঢাকা পড়েনি। ছেলেবেলা থেকেই জানি আমার হাসি অত্যন্ত সুন্দর, একবার যদি কারও সামনে হেসে ফেলতে পারি তিনি আমার মুখের ওপর থেকে আর চোখ সরাতে পারবেন না। মাত্র এটুকু সম্বল করেই জীবনের অজানা অচেনা মহাসমুদ্রে আমি পাড়ি দিতে উদ্যত হয়েছি।

রীম্‌স শহর ছাড়িয়ে চাঁলো, তাও পেরিয়ে আমরা তখন কোম্পেনের জঙ্গল পার হচ্ছি। জানতাম আমার নতুন পরিবারের লোকজন আর বেশি দূরে নেই। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই, নতুন সম্পর্ক অনুযায়ী এখন আমার ঠাকুর্দা, আর তাঁর সঙ্গে আমার বর সামনে কোথাও অবস্থান করছেন। কিন্তু আমাকে যাঁরা এগিয়ে নিতে এসেছেন সেই ফরাসী মহিলাকুলকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হলো না। বরং তাঁরা, বিশেষ করে প্রধানা অভিভাবিকা মাদাম দ্য নোয়ালে, এমন চোখে আমাকে দেখলেন যেন কিছু জিজ্ঞেস করতে যাওয়াই ফরাসী শিষ্টাচার ভাঙা। চুপ করে থাকতেই হলো।

জঙ্গলের ধারে এসেই দেখতে পেলাম সুন্দর পোশাকে সজ্জিত রক্ষীর সারি আর বিচিত্র পোশাকের চাকরবাকর। আমার গাড়িটা থামতেই টুক করে নেমে পড়লাম। মাদাম নোয়ালে তো একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। রীতি অনুযায়ী আমার তো গাড়িতে বসে থাকারই কথা যতক্ষণ না কেউ এগিয়ে এসে আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যান। কথাটা আমার

মনেই আসেনি। তিন সপ্তাহ ধরে স্নেহবঞ্চিতা আমি। মা বলেছেন আমার নতুন ঠাকুর্দা ফ্রান্সের রাজা আমাকে সাদরে গ্রহণ করে ভালবাসবেন আর আমার বন্ধু হয়ে উঠবেন।

একজন অবশ্যই এগিয়ে আসছিলেন—রাজকীয় ভঙ্গিমায়, মুখে অপরূপ হাসি ফুটিয়ে। বয়স্ক মানুষটার দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি তাঁর পাশ কাটালাম। অবাক হলেও তিনি হাসলেন। একটু পরেই জেনেছিলাম তিনিই হলেন বহুল আলোচিত দু দ্য চোয়াস্যু, আমাকে নিয়ে আসার জন্যে রাজা যাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

কাউকেও দরকার ছিলো না আমার। সরাসরি রাজার সামনে এসে নতজানু হয়ে বসলাম।

আমাকে তুলে ধরে দু গালে আদরের চুমু এঁকে দিলেন তিনি। 'আরে, ভারি সুন্দরী মেয়েটি তো!' তাঁর গলা যেমন মিষ্টি, তেমনি সুরেলা। বন্ধুত্বের গভীরতায় তাঁর দু চোখের দৃষ্টি উত্তপ্ত।

'মহানুভব রাজামশায়···'

হেসে ফেলে তাঁর কোটের সঙ্গে আটকে ধরলেন তিনি। মূল্যবান মণিমাণিক্যের জাঁকজমকে কোটটি ভারি সুন্দর।

'খুব খুশি হয়েছি যে শেষ পর্যন্ত তুমি এসে পৌঁছলে।'

মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভয় কেটে গেলো আমার, এতদিনের একাকীত্বও। তিনি বৃদ্ধ কিন্তু তাঁর দিকে তাকালে সে কথা মনেও আসে না। রাজকীয় অথচ নরম মনের মানুষ তিনি, শিষ্টাচারে কোন খুঁত নেই। ভালো ফরাসী বলতে পারি নে বলে আমারই লজ্জা করছিলো।

আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। গভীর চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। তারপর অন্যদিকে একটুখানি চোখ ফেরাতেই একটি ছেলে এগিয়ে এলো। লম্বা হলেও কেমন যেন জবুথবু গোছের চেহারা, আমার মুখের ওপর থেকে চোখের দৃষ্টি এমনভাবে সরিয়ে নিলো যেন আমার প্রতি ওর বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ নেই। রাজার এমন উত্তপ্ত সম্বর্ধনার পর ওর এই অবহেলা যেন আমাকে সজোরে চড় কষিয়ে

দিলো। নিজের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতেও ভয় পেলাম কারণ এই-ই আমার স্বামী। ওর পোশাকের আড়ম্বরে কিছু কমতি নেই কিন্তু ঠাকুর্দার পাশে যেন ওকে একটুও মানাচ্ছে না। হাত দুটো নিয়ে যে কি করবে, কিছুই যেন ঠিক করতে পারছে না বেচারা।

'যুবরানী তাঁর উপস্থিতিকে আমাদের সামনে টেনে এনে আমাদের আনন্দিত ও গৌরবান্বিত করে তুললেন।' রাজা বললেন।

ছেলেটা শুধু দাঁড়িয়ে রইলো, মুখে কোন কথা ফুটলো না। ওর উদাসীনতা ভাঙতে আমিই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওর মুখের কাছে নিজের মুখ তুলে ধরলাম। চমকে উঠে একটু যেন কুঁকড়ে গেলো ও, তারপর এগিয়ে এলো এমনভাবে যেন কোন অরুচিকর কাজ করতে যাচ্ছে একান্ত বাধ্য হয়েই, আমার গালে ওর গালের স্পর্শটুকু পেলাম মাত্র কিন্তু রাজার মতো আমাকে চুমু খেলো না ও।

রাজার দিকে তাকালাম। ওঁর মুখে কোন ভাবান্তর নেই। মনে হচ্ছিলো রাজকুমারের পছন্দ হয়নি আমাকে। রাজা কিন্তু আমার কোমর জড়িয়ে আমাকে তিনজন অদ্ভুত মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরা আমার পিসি—আদেলেদ, ভিকতোয়ার এবং সোফি। সবচেয়ে বয়স্ক যিনি, নিঃসন্দেহে ওঁদের নেত্রী, একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন মোটা কিন্তু মুখের রেখায় উদারতার আভাস ছিলো। তৃতীয়জন সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে। তবু ওঁরা আমার পিসি। আদেলেদের কাছে গিয়ে ওঁকে চুমু খেলাম। তাঁর ইঙ্গিতে এগিয়ে এলেন ভিকতোয়ার, তাঁকেও চুমু খেলাম। এবার সোফির পালা। রাজা জানালেন পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমার দেখা হবে পরে। হাত ধরে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। যুবরাজ আর ওঁর মাঝখানে বসলাম। তূরীধ্বনি উঠলো আকাশে, সঙ্গে ঢাক। কোম্পেন শহরের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। সেখানে রাত কাটিয়ে আগামীকাল ভার্সাই অভিমুখে রওনা হবো।

যেতে যেতে রাজাই কথা বলতে লাগলেন আমার সঙ্গে, পিঠে হাত রেখে আদর করতে লাগলেন। জানালেন যে আমায় তিনি ইতিমধ্যেই

ভালবেসে ফেলেছেন, আমি তাঁর নাতনি হয়ে গেছি।

খুব হাসতে ইচ্ছে করছিলো। এঁর সম্পর্কে কি প্রচণ্ড ভয়ই না ছিলো আমার মনে। মা বলেছেন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা উনি। ভেবেছিলাম ভীষণ গম্ভীর আর কড়া মেজাজের লোক হবেন। এখন এমন গলায় কথা বলছেন, এমন আদরের ভঙ্গিতে হাত নাড়ছেন যেন উনিই আমার প্রেমিক, ওঁর নাতিকে বিয়ে করে ওঁকেই উদ্ধার করেছি আমি। আমরা দুজনে মিলে এমন চাপল্যের মধ্যে যখন সময় কাটাচ্ছিলাম, আমার পাশে স্বামী নামক বস্তুটি আগাগোড়াই গোমড়া মুখে বসে রইলেন।

কোম্পেনে এসে রাজামণায় জানালেন যে রাজপরিবারের আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। সানন্দে সম্মতি জানালাম। 'ওদের তোমার ভালো লাগবে।' রাজা হেসে বললেন, 'তোমাকে দেখে মুগ্ধ ও খুশি হবে ওরা, দেখবে বেচারা বেরিকে সবাই ঈর্ষা করতে শুরু করেছে।'

রাজকুমারের নামই তো দু দ্য বেরি। কথাটা শুনেই পা পা করে আমাদের কাছ থেকে সরে গেলেন। খুব নরমভাবে আমার হাতে চাপ দিয়ে রাজা বললেন, 'এমন রত্ন হাতে পাওয়াতে বেচারা বেরি যেন বেসামাল হয়ে পড়েছে।'

রাজার কক্ষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজকুমারদের প্রথমজন হলো দু দ্য অলিয়াঁ। রাজার কাকার নাতি। এগিয়ে এলেন দু দ্য পেনথিবর, রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নাতি। তারপর কণ্ডি ও কন্টি রাজকুমারদ্বয়। এঁদের সকলেই বেশ বয়স্ক। কমবয়সীও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ওখানে। রাজকুমারী দ্য লঁব্যালকে প্রথম দর্শনেই খুব ভালো লেগে গেলো। বয়স ওঁর একুশের কম নয় তবু মনে হচ্ছিলো ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো যাবে।

উৎসবের মধ্যে কোথাও আড়ম্বরের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ছিলো না। ঠিক কোন্ আংটিটি আমার আঙুলে ঠিকমতো বসবে তার প্রচেষ্টা চললো খানিকক্ষণ। আমার ঘরে উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা এলেন রাজার সঙ্গে,

সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের রাজকুমাররা, পিসিরাও, মোট বারোটা আংটি পর পর পরতে হলো শুধুমাত্র দেখার জন্যে কোন্‌টা সবচেয়ে সুন্দরভাবে আঙুলে বসছে। ঠিকমতো আংটিটি সযত্নে তুলে রাখা হলো। পরে রাজকুমার আমার আঙুলে পরিয়ে দেবেন। রাজা আমাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন, পদমর্যাদা অনুযায়ী রাজকুমাররাও একে একে চলে গেলেন।

ক্লান্তি লাগছিলো। শুতে পারলে যেন ভালো হতো। পরিচারিকারা বিছানা ঠিক করছিলো। রাজকুমারের মুখটা ভেসে উঠলো মনের আয়নায়। সবার থেকে কত আলাদা ও। দু-একটার বেশি কথা বলেনি আমার সঙ্গে, চোখ তুলে আমাকে দেখেছে কিনা সন্দেহ। ওর মুখের সব আদলটুকুও যেন ধরতে পারছি নে। অথচ রাজা অথবা লঁব্যালের মুখ কত সহজেই চোখের ওপর ভাসছে।

পরিচারিকাদের সঙ্গে সামান্য কথা বলে জানতে পারলাম রাজকুমার এখন আমার ঘরে রাত কাটাবেন না। রীতি অনুযায়ী বিয়ের রাতের আগে তা ঘটবে না। শুয়ে শুয়ে ঘুম আসার আগে পর্যন্ত ভাবতে লাগলাম। রাজকুমারও কি এমনি করে আমার কথা ভাবছে। অনেক বছর পরে ওকে ঠিকমতো চেনার সুযোগ যখন হয়েছিলো, ওর সেদিনের দিনপঞ্জী দেখার সুযোগ হয়েছিলো আমার। দেখেছিলাম শুধু একটিমাত্র লাইন লেখা আছে ওতে। 'ভাবী পত্নীর সঙ্গে পরিচিত হলাম।'

পরের দিন রওনা হয়ে দ্য লা মুয়েৎ-এর দুর্গে পৌঁছনো গেলো। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভার্সাই রওনা হতে হবে।

চলতে চলতে বুঝতে পারলাম রাজা আমাদের সঙ্গে নেই। এগিয়ে গেছেন তিনি। জানতে পারলাম ভার্সাই পৌঁছতে হলে আমাদের পারীর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। রাজার অনেকদিনের অভ্যাস পারী শহরের জনগণকে পরিহার করে চলা। ওদের গোমড়ামুখো চালচলন পছন্দ নয় ওঁর। বিশেষ করে এমন একটা অনুষ্ঠানে। এ ব্যাপারে সামান্য অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়েছে আমার। স্ট্রাসবুর্গের প্রধান গীর্জায় প্রিন্স লুই দ্য রোহা যখন ওঁকে 'সর্বজনপ্রিয় লুই' বলে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন,

দর্শকদের মুখগুলো যেন কালি-লেপা বলে মনে হচ্ছিলো। প্রথম জীবনে অবশ্যই ওঁকে তাই বলে ডাকা হতো। কিন্তু এখন? জনসাধারণ ওঁকে ঘৃণা করে। ওরা দরিদ্র, দু-বেলা রুটি জোটে না আর ওঁর ওপর ক্রুদ্ধ এ কারণে যে রাজপ্রাসাদ আর রক্ষিতাদের পেছনে উনি জলের মতো টাকা ঢেলে যাচ্ছেন।

আমার বন্ধুদের মধ্যে এ ব্যাপারে অবশ্য কোন মাথাব্যথা নেই। ওদের সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা। মার্সির মনোভাব খানিকটা অনিশ্চিত। আবি আর স্টারহেমবুর্গের চোখের ভাষায় উৎকণ্ঠা। নিশ্চয়ই কিছু ভুলচুক ঘটে গেছে আমার দিক থেকে।

পারীর কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখলাম রাস্তার পাশে সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে আছে। শহরের বাইরের রাস্তা ধরে চললেও ওদের হর্ষ-ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিলো। হাসিমুখে, মাথা নুইয়ে ওদের অভিবাদন নিচ্ছিলাম। 'চমৎকার।' ওরা চেঁচিয়ে বলছিলো আর সেই মুহূর্তেই মার্সির উৎকণ্ঠার কথা মনে রইলো না আমার। লোকের অভি-বাদন আমাকে ভয়ানকভাবে নাড়া দিতে লাগলো।

লা মুয়েৎএ পৌঁছে দেখি রাজা আগেই এসে গেছেন। দেওরদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে প্রস্তুত তিনি। কঁৎ দ্য প্রোভঁসের বয়স চোদ্দ বছর, আমার থেকে ষোল দিনের ছোট। আমার স্বামীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর ও, তবে একটু যেন মোটার ধাত। সবচেয়ে ছোট ভাই কঁৎ দ্য আরতোঁর বয়স আমার থেকে বছর খানেক কমই হবে কিন্তু ওর চোখে মুখে এমন একটা সবজান্তা ভাব বিরাজ করছে যে ওকে দাদাদের থেকেও বয়স্ক মনে হচ্ছে। আমার হাত তুলে বেশ রসিয়ে রসিয়ে চুমু খেলো। কেউ আমার প্রশংসা করলেই গলে যাওয়া তো আমার স্বভাব। অন্য দুই ভাইয়ের চেয়ে আরতোঁকেই আমার পছন্দ হলো বেশি।

এরপর পারিবারিক ভোজনোৎসব। আমার কক্ষে এসে রাজা বললেন আমার জন্যে কিছু উপহার এনেছেন উনি। এক বাক্স হীরা মুক্তা। ভারি খুশি হলাম। আমার আনন্দ দেখে ওঁরও খুশির অন্ত

রইলো না। বাক্স থেকে মুক্তার একটা হার বের করে তুলে ধরলেন তিনি। সব কটি মুক্তাই বেশ বড় বড়, চমৎকার ওদের রঙের বাহার। 'এটা ফ্রান্সে এনেছিলেন অস্ট্রিয়ার রানী অ্যান। আমার মা পরেছেন এটি, আমার স্ত্রীও। কি সৌভাগ্য যে অস্ট্রিয়ার আর একজন রানীকে এটা পরাবার সুযোগ এলো।' উনি নিজেই আমার গলায় পরিয়ে দিলেন ওটা। লজ্জাজড়িত গলায় ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। ওঁর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম ওঁর গলা। এখানেই ভুল হয়ে গেলো। মাদাম নোয়ালে কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু উনি অথবা আমি—কেউই গ্রাহ্য করলাম না।

রাজা বিদায় নেবার পর মাদাম নোয়ালের একপ্রস্থ বক্তৃতা শুনতে হলো। ফ্রান্সের রাজার সামনে আমার আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে। শুনছিলাম না। মনে পড়ছিলো আগামীকালই আমার বিয়ের দিন।

ভোজসভায় সব নতুন আত্মীয়দের দেখলাম। যুবরাজের পাশে বসেছিলাম। উনি কিছু বললেন না, আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। কেবল আরতোঁ হাসছিলো আর বলছিলো যে আমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু আবহাওয়া যেন গুমোট হয়ে আসছিলো। দেখলাম টেবিলে বসা একজন যুবতী মহিলা যেন সবার থেকে গলা উঁচিয়ে কথা বলছেন। ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি আমার। ভাবছিলাম উনি কে হতে পারেন। টেবিলে বসা সবার চেয়ে সুন্দরী উনি। ওঁর চুল সুন্দর, ঘন আর কোঁচকানো। গায়ের রঙ ভারি সুন্দর। নীলচে চোখ দুটো বেশ বড় বড়। চমৎকার পোশাক পরনে ওঁর, মণিমুক্তায় ঝলমল করছেন। সবাই দেখছেন ওঁকে, এমনকি রাজার চোখ দুটিও ওঁর মুখের ওপর বারে বারে আছড়ে পড়ছে। পিসিরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিলেন, বড় পিসি আদেলেদ একবার ওঁর দিকে তাকালেন। দৃষ্টি তো নয়, যেন বিষের ছুরি। এদিকে রাজা বারবার আমাকে দেখছিলেন আর আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার অগোছালো ফরাসী শুনেই হেসে ফেলছিলেন, অন্যান্য সবাইও হেসে উঠছিলেন।

কিন্তু ওই মহিলা সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য বাগ মানছিলো না। পাশে বসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নীল চোখ আর তোতলানো-ভাবে কথা বলছেন, ওই সুন্দরী মহিলাটি কে?' ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে মনে হলো আমি ওঁকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলাম। ভাগ্যিস, মাদাম নোয়ালে ওখানে ছিলেন না!

'উনি হলেন মাদাম দ্যু বারি, যুবরানী।' অনেকক্ষণ পরে জবাব এলো।

'মাদাম দ্যু বারি? আমার সঙ্গে তো ওঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি।'

প্রত্যেকের চোখ যেন খাবারের দিকেই নিবদ্ধ, কেউ কেউ আবার যেন মুখ টিপে হাসছেন।

'ওঁকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার?' একজন জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব সুন্দরী। রাজসভায় ওঁর ভূমিকাটি কি?'

আবার সেই স্তব্ধতা, কারও কারও মুখে হাসির রেখা। 'মাদাম, রাজাকে খুশি রাখাই হলো ওঁর কাজ।'

'রাজাকে খুশি রাখা!' হেসে ফেলে রাজার দিকে তাকালাম। 'তাহলে আমি ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে চাই।'

কি বললাম! সাদামাটা কথাই বলতে চেয়েছি। তার প্রতিক্রিয়া যে এমন ভয়ানক হতে পারে ভেবে দেখিনি। ভয় আর আমোদে সবাই যেন ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন ভার্সাই পৌঁছনো গেলো। গাড়িতে সন্ত্রস্ত হয়ে ছিলাম, এবার সঙ্গিনী সেই মাদাম নোয়ালে। আর একপ্রস্থ বক্তৃতা, আমার আচরণে বিরক্ত উনি। আমার জানা উচিত ফ্রান্সের রাজসভা অস্ট্রিয়ার রাজসভা থেকে একদম আলাদা। ফ্রান্সের রাজা সম্পর্কে আমার ঠাকুর্দা। প্রকাশ না করলেও আমার শিষ্টাচারের অভাবে উনিও বিরক্ত।

আমাদের জন্য তোরণ খুলে গেলো। ভার্সাই শহরে প্রবেশ করলাম আমরা। দু পাশে সুইস আর ফরাসী রক্ষীগণ দাঁড়িয়ে। আমার সম্বর্ধনার জন্যেই। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে রাজপুত্র আর হোমরাচোমরাদের

সমাবেশ আগেই ঘটেছে। লাল আর নীল রঙে সজ্জিত ঘোড়াগুলো দেখে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠছিলাম। কুকুরের মতো ঘোড়াও আমার খুব প্রিয়।

সামনেই বিরাট রাজপ্রাসাদ। অসংখ্য জানলার শার্সিতে সূর্যা-লোকের বিচ্ছুরণ, যেন হাজারো হীরার ঝলকানি। আস্তে আস্তে সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম আমি। একতলায় সাময়িকভাবে একটা সুন্দর কক্ষে আমাকে তোলা হলো। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন আমার বিয়ের পোশাক নিয়ে একদল ভারিক্কি ধরনের মহিলা। পোশাক দেখেই আমি তো আনন্দে আত্মহারা। এমন সুন্দর পোশাক এর আগে দেখিনি।

ঘরে পৌঁছতেই রাজা এসে আমার ভার্সাই আগমনকে স্বাগত জানালেন। তাঁর আচরণ কেমন নিখুঁত। তাঁর সঙ্গে দুটি ছোট ছোট মেয়ে—আমার ননদ। ক্লথিলডে আর এলিসাবেথ। ক্লথিলডে বড়, এগার বছরের, বেশ মোটাসোটা তবে ভারি মিশুকে। এলিসাবেথকে দেখে খুব খুশি হলাম। ওকে জড়িয়ে চুমু খেলাম। ওঁরা চলে গেলে ওই মহিলারা ঘিরে ধরলেন আমাকে আর বিয়ের জন্যে তৈরি করতে লাগলেন।

দুপুর একটার সময় যুবরাজ এলেন আমাকে গীর্জায় নিয়ে যাবার জন্যে। দিনটা ছিলো বেশ গরম, রাজকুমারের পোশাকের জেল্লা অপূর্ব। কিন্তু তবু তাঁকে ভারি কঠোর বলে মনে হচ্ছিলো আমার। আমার হাত ধরে রাজার আলোচনা কক্ষ অবধি যাবার সময়টুকুতে আমার দিকে চোখ ফেরালেন না তিনি। মিছিলের বাকি সবাই ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। মিছিলের নেতৃত্ব নিলেন উৎসবের জন্যে মনোনীত প্রধান হোতা। ওঁর ঠিক পেছনেই রাজকুমার ও আমি। ওর সঙ্গে চুপিচুপি একটু কথা বলারও উপায় ছিলো না। আমার ঠিক পেছনেই মাদাম নোয়ালে। তাঁর পেছনে চাকরবাকর পরিবেষ্টিত আত্মীয় রাজকুমারগণ, তারপর আমার দেওররা এবং স্বয়ং রাজা। তাঁর পেছনে অন্যান্য রাজ-কুমারীগণ ও পিসিরা।

গীর্জার সামনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুইস রক্ষীরা ভেরী ও তূরীধ্বনি সহযোগে রাজার আগমন ঘোষণা করলো। অত্যন্ত মনোরমভাবে সাজানো সেই গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে যুবরাজ আর আমি লাল ভেলভেটের সামনে নতজানু হয়ে বসলাম আর গীর্জার প্রধান বিশপ মঁসিয়ে রোশ-আইসেঁা বিয়ে সম্পন্ন করার জন্যে এগিয়ে এলেন।

কিন্তু আমার বরের বিরক্তি যেন বেড়েই যাচ্ছিলো। আঙুলে আংটি পরাবার সময় ওর হাত কাঁপছিলো, বিশপের আশীর্বাদপূত সোনার পাতটি ওর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছিলো।

বিয়ে তো শেষ হলো। আর্চবিশপ আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। প্রার্থনা শুরু হলো। বিয়ের সনদনামা রাজার হাতে তুলে দেওয়া হলো ওঁর সাক্ষরের জন্যে। রাজকুমারের সইয়ের পর আমার পালা। ভয়ানক হাত কাঁপছিলো আমার, কোন রকমে লিখতে গেলাম—মারি আঁতো-য়ানেৎ জোসেফা জাঁ। একগাদা কালি ছিটকে পড়লো কাগজের ওপর। ব্লটিং পেপার দিয়ে তুলতে গেলাম। সবাই এমন হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইলো যেন এটা একটা অশুভ ব্যাপার।

মাদাম নোয়ালে আমাকে আমার জন্যে নির্দিষ্ট বাসভবনে নিয়ে গেলেন। এখন কর্তব্য হলো পরিবারের লোকজনকে অভ্যর্থনা জানানো এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ। অনুগতদের সংখ্যা বলতে গেলে অসংখ্য। আমার তো হাসিই পেয়ে যাচ্ছিলো যখন পরিচারিকা থেকে ডাক্তার পর্যন্ত একে একে সবাই এসে আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো। জানতাম না যে আমার ছেলেমানুষী হাবভাব ওদের পছন্দ হচ্ছে না। ফরাসী ভাষা তো ভাল জানি নে। অজ্ঞাতসারেই অনেককে আঘাত করে যাচ্ছি এটা যখন বুঝতে পেরেছিলাম তখন ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। ফরাসী শিষ্টাচার প্রথা সমাজের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব মানুষকে এমন জালে আটকেছে যে তার বিন্দুমাত্র অভাবে ওরা অপমানিত বোধ করে। মাদাম নোয়ালে এটাই আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কর্মসূচীর পরের অঙ্গ হলো রাজা আমাকে কি কি উপহার দিয়েছেন সে সব খুলে দেখানো। এতে তো আমার আগ্রহের অন্ত ছিলো না। এর মধ্যে ছিলো নীল এনামেলের তৈরি একটি প্রসাধন সেট, ছুঁচের কাজের জন্যে একপ্রস্থ সরঞ্জাম, একটি বাক্স এবং একখানা পাখা—সবগুলোই হীরের ব্যবহারে দ্যুতিময়। এই পাথরটিকে কি যে ভালবাসি আমি, যা সময়ে সময়ে চমকে দেয় লাল, সবুজ, নীল আলোর বিচ্ছুরণে। ছুঁচের বাক্সটি হাতে নিয়েই বলে উঠলাম, 'আমার প্রথম কাজ হবে রাজার জন্যে কিছু একটা তৈরি করে দেওয়া।'

মাদাম নোয়ালে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ওটা করার আগে মহারাজের সম্মতি নেওয়া দরকার। হেসে ফেললাম শুনে। আমি তো রাজাকে অবাক করে দিতে চাই। আমার হাবভাবে বৃদ্ধা মানুষটি হতাশায় যেন নেতিয়ে পড়লেন। ওঁর নাম ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছি —মাদাম এটিকেট।

হঠাৎ শুনতে পেলাম মেঘের গর্জন। নিশ্চয়ই বৃষ্টি নামছে। পারী থেকে ভার্সাই পর্যন্ত আসার সময় যে অসংখ্য মানুষের সারি দেখেছিলাম, তাদের কথা মনে পড়লো। ওরা এখন সমবেত হয়েছে বাজি পোড়ানো উৎসব দেখার জন্যে। বৃষ্টিতে তো সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

ঝড় থামার পর দেখা গেলো আমার অনুমানই সত্যি। বৃষ্টিতে বাজি পোড়ানো সম্ভব নয় বলে সকলে হতাশ হয়ে ফিরে গেলো।

ওদিকে রাজা একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সবাই উপস্থিত হলাম সেখানে। সমস্ত গ্যালারিটাকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, মোমবাতির আলোয় তা দিনের মতোই ঝলমলে। রাজার সঙ্গে আমার স্বামী ও আমি একটা টেবিলে বসলাম। তিনজনে মিলে তাস খেলতে লাগলাম। আমার স্বামীর মুখ গম্ভীর, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে খেলতে হচ্ছে ওকে। লোকজন আমাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে খেলা দেখতে লাগলো। ওদের সঙ্গে কথা বলবো কিনা ভাবছিলাম। রাজার দিকে তাকিয়ে দেখি উনি এমন মগ্ন হয়ে রয়েছেন যেন ওখানে আমরা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বই নেই। অগত্যা আমাকেও সেই ভান

করতে হলো।

সম্বর্ধনার পর নতুন অপেরা হাউসে রাতের খানা সারতে গেলাম। এটি সম্পূর্ণ নতুন। আমার ফ্রান্সে পদার্পণ উপলক্ষ্যে রাজা এটি তৈরি করেছেন। খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসা হলো। রাজার এক পাশে আমি, অন্য পাশে আমার স্বামী। আমার অন্য পাশে বসলো আমার ছোট দেওর আরতোঁ—হাবভাব এমন যেন আমার সম্মানে যা কিছু করতে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে ও। ভারি ভালো লাগলো, ওকে দেখে অবধি যেন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার জমবে ভালো। আরতোঁর অন্য পাশে বড় পিসি আদেলেদ, সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর ওঁর, আরতোঁকে ডিঙিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। বললেন ওঁর ঘরে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করা যাবে। শুনে আরতোঁই চোখ টিপে বারণ করলো আমায়। টেবিলের একেবারে শেষদিকে বসেছেন প্রিন্সেস লঁব্যাল—পদমর্যাদায় উপস্থিত একুশজনের মধ্যে নিম্নতম বলেই। আমার দিকে তাকিয়ে এমন অন্তরঙ্গভাবে হাসলেন যে মনে হলো রাজা, আরতোঁ আর উনি সহায় থাকলে এখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত।

এমন উত্তেজিত বোধ করছিলাম যে খেতেই পারছিলাম না। কিন্তু দেখলাম আমার স্বামীর ক্ষুধা বেশ প্রচণ্ড। যা পাতের কাছে আসছে গবাগব খেয়ে চলেছেন, যেন সারাদিন প্রচণ্ড খাটুনি গেছে ওঁর। ওঁর খাওয়ার ধরনে রাজা কৌতুকে ঝলমল করে উঠলেন। 'খুবই মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছো দেখছি! কিন্তু আজ রাতের মতো এমন বিশিষ্ট রাতে এমন পেট বোঝাই করে ফেলা উচিত বলে মনে হচ্ছে না বেরি।'

'ভূরিভোজনের পর ঘুমটি আমার বরাবরই জাঁকিয়ে আসে।'

আমার মতো আর সবাই শুনলো আমার স্বামীর উত্তর।

আরতোঁ প্লেটের দিকে মুখ নামিয়ে হাসি আটকাতে চাইলো, অন্য অনেকেই হঠাৎ খাবারের দিকে বড় বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলেন। রাজা বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে স্বামীকে ডিঙিয়ে প্রভঁসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

কর্মসূচির পরের অংশটুকু আমাকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুললো। রাত

এলো। টেবিলের ওপাশে স্বামীর দিকে চোখ ঘোরাতেই উনি বিব্রত-ভাবে অন্যপাশে চোখ ফেরালেন। বুঝলাম আমার মতোই ওঁর ভেতরে চাপা অস্বস্তি দানা বাঁধছে। জানি, এ রাতে আমার কাছ থেকে সবাই কি আশা করছে। যা করতে হবে তাতে আনন্দ পাবো কিনা জানি নে, হয়তো খুব অরুচিকরও মনে হতে পারে। হয়তো বা আমার সবচেয়ে ভালো লাগার ইচ্ছেটা পূরণ হবে। একটা সন্তান হবে আমার, আমি মা হয়ে উঠবো—যা আমার অনেকদিনের বাসনা।

প্রাসাদে ফিরে এসে শুরু হলো বর ও কনেকে বিছানায় নিয়ে যাবার অনুষ্ঠান। ডাচেস দ্য চার্ত্র, উপস্থিত বিবাহিতাদের মধ্যে মর্যাদায় যিনি সর্বোচ্চা, আমার হাতে রাতের পোশাক তুলে দিলেন। আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে আসা হলো। ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন আমার স্বামী। ওঁর রাতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং রাজামশায়। পাশা-পাশি বসলাম আমরা। একবারও আমার দিকে মুখ ফেরালেন না আমার স্বামী। বুঝতে পারলাম না কি ভাবছেন উনি, অতটা খাবার পর ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওঁর দু চোখ।

পরদা তুলে দেওয়া হলো যাতে সবাই দেখতে পায় আমাদের। রীম্‌সের আর্চবিশপ মন্ত্র আউড়ে বিছানাটাকে পবিত্র করে দিলেন, পূতবারি ছিটোলেন ওতে। জড়ের মতো বসে রইলাম আমরা, যেন ভয়ে আড়ষ্ট দুটি ছেলেমেয়ে।

অবশেষে আমার দিকে একবার চোখ নাচিয়ে বিদায় নিলেন রাজা। মাথা নত করে অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঝটিতি পর্দা নামিয়ে দিলো চাকরবাকরেরা। ঘরে রইলাম শুধু দুজন—আমি আর আমার স্বামী।

শুয়ে পড়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। খুবই একা মনে হচ্ছিলো নিজেকে—অপরিচিত একজনের সঙ্গে একই বিছানায় বাঁধা। উনি স্পর্শ করলেন না আমাকে, কথা বলারও চেষ্টা করলেন না। শুধু বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছি—আমার, না ওঁর ?

সব কিছুরই পরিণতি এই অপেক্ষা, নিষ্ফল অভিসার রাত্রি। কিছু

ঘটলো না—কিচ্ছু না। জাগরণে বিভাবরী কাটতে লাগলো। আশা হচ্ছিলো এবার বুঝি শুরু হবে। কিন্তু শুয়েই রইলাম। আমার মতো সেও। নিঃশব্দে, আমাকে স্পর্শ না করে, কোন কথা না বলে।

অনেকক্ষণ পরে ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ও। অবাক হলাম, খানিকটা যেন হতাশও।

এখন জানি ওর সে রাতের যন্ত্রণা আমার থেকে একটুও কম ছিলো না। পরদিন ডায়েরীতে একটি মাত্র শব্দ লিখে রেখেছিলো ও। শব্দটা হলো, 'কিচ্ছু না।'

॥ দুই ॥

আজ মনে পড়ছে ফ্রান্সের রানী ছাড়া আমার আরও একটা সত্তা ছিলো। কতবার যে স্বপ্নে অথবা জাগরণে সেই সত্তায় ফিরে যেতে চেয়েছি! যখন নির্মল হাসির অপব্যাখ্যা হয়নি, যখন আমার চাপল্যের জন্যে কখনও বাৎসল্যের, কখনও বা চাপা অনুযোগের ধমক ছাড়া আর কোন শাস্তি বরাদ্দ হয়নি। দীর্ঘকাল আগে হারিয়ে যাওয়া বাবা, মা, আমার ভাই-বোনেরা আমাকে যেন এখন ঘিরে ধরছে। আমার সেই পবিত্র শৈশবে, সেই সব পাওয়ার স্বপ্নের দেশে ফিরে যাচ্ছি আমি।...

সপ্তমবর্ষীয় যুদ্ধের আরম্ভের সময় আমার জন্ম। আমার চিন্তা থেকে যুদ্ধের চিন্তাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন মা। সন্তান প্রসবেও তাঁর কোন অতিরিক্ত মাথাব্যথা ছিলো না। আমি তাঁর পঞ্চদশ সন্তান, এর মধ্যে বেঁচে ছিলো চারটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে, বাকি তিনজনের মৃত্যু হয়েছিলো ছেলেবেলায় অথবা জন্মের মুহূর্তে। আমার জন্মের মুহূর্তটি নাকি শুভ ছিলো না। পর্তুগালের রাজা ও রানীর আমার এই পৃথিবীতে আগমনকে উৎসবমণ্ডিত করে তোলার কথা ছিলো কিন্তু সেই মুহূর্তটিতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লিসবন শহর তছনছ হয়ে গিয়েছিলো। তবু বলতে গেলে আমার শৈশব কেটেছে খুব আনন্দের মধ্যে, স্কুনব্রুন

প্রাসাদের বাগানে আমি ও আমার দিদি ক্যারোলিন খেলার মধ্যে এক একটি দীর্ঘ রৌদ্রদীপ্ত দিন অতিবাহিত করেছি। আমাদের মা অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী, আমরা হলাম আর্চডাচেস। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী আমাদের মতো মেয়েদের বিয়ে হবে তাড়াতাড়ি—এটাই স্থির ছিলো। ছেলেদের বেলায় অবশ্যই নিয়মের বাঁধন আলাদা। আমার ভাই ফার্দিনান্দ—যে আমার থেকে বড় কিন্তু ক্যারোলিনের চেয়ে ছোট এবং আমার থেকে এক বছরের ছোট ম্যাক্স—ওদের কোন সমস্যা ছিলো না। ওরা সুন্দরী বউদের ঘরে তুলে আনবে। কিন্তু স্কুনব্রুনে গরম অথবা ভিয়েনার হফবুর্গে শীত কাটানোর সময় এসব কথা কখনও মনে আসেনি আমাদের। আমাদের সময় কাটতো নানা ধরনের কুকুরের বাচ্চা নিয়ে।

লেখাপড়া অবশ্যই করতে হতো কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ছিলেন আমাদের হাতের মুঠোয়। ভালবাসতেন আমাদের, যেমন খুশি তাঁকে চালানো যেতো। হাতের লেখা লিখতে গিয়ে দেখতাম সোজা একটি লাইনও লিখতে পারছি নে। উনি এসে আমার অন্যমনস্কতা দেখে বলতেন লেখাপড়া আমার হবে না। আর আমার জন্যেই ওঁর চাকরিটি যাবে। ওঁর গলা জড়িয়ে বলতাম—ওঁকে খুবই ভালবাসি আমি। নরম হতেন, কোলের কাছে বসিয়ে পেনসিলের সরু শীষ দিয়ে ছবি এঁকে দিতেন; পরে তার ওপর কালি বুলোতাম আমি। লেখার খাতাও পেনসিল দিয়ে ভর্তি করতেন উনি, আমি তার ওপর কালি বুলোতাম। সবাই আমাকে ডাকতো মারিয়া আঁতোনিয়া বলে। পরে যখন ঠিক করছিলো যে ফরাসী দেশের রাজার সঙ্গে বিয়ে হবে আমার—নাম বদলে রাখা হলো মারী আঁতোয়ানেৎ। ছেলেবেলায় মা-ই ছিলেন আমাদের সব। ওঁর সঙ্গে দেখা হতো কম কিন্তু ওঁর ছায়া নিরন্তর ভেসে বেড়াতো মনের আকাশে, ওঁর নামে ভয়ে কেঁপে উঠতাম আমরা।

এখনও মনে আছে হফবুর্গের নিদারুণ শীতের দিনে ঘরের সব জানলা খুলে রাখতে হতো। মা বলতেন বিশুদ্ধ বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বাস, ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতাম। তাঁর কথা না মেনে রক্ষা ছিলো না কারও। সবাই জানতো চতুর্থ চার্লসের মেয়ে হিসেবে সব

ক্ষমতার অধিশ্বরী হলেন আমার মা। নামে সম্রাট হলেও আমার বাবার স্থান হলো ওঁর পরে।

বাবাকে ভীষণ ভালো লাগতো আমার। খুবই আমুদে আর অসতর্ক মানুষ তিনি। আমিও তাঁর ধাত পেয়েছি। সেইজন্যে মারও আমি প্রিয়পাত্রী। আদুরে বলতে মার কাছে কেউ ছিলো না। ভাইবোন আমার এত বেশি যে সবাইকে ভালো করে চিনতামও না। বাইরের অতিথিদের মা বলতেন, 'আমার পরিবার ছোট নয়।' মনে হতো বাবাও মাকে সমীহ করে চলতেন। রাজ্যের কাজে ওঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো খুবই কম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতেন খুব। তবে তিনি যেন খানিকটা বিষণ্ণ মনেই দিন কাটাতেন। একবার বলেছিলেন, 'সম্রাজ্ঞী আর ছেলেমেয়েরাই তো রাজপরিবার। আমি তো বাইরের একজন লোক মাত্র।'

আজ জেলে বসে সেই অতীতের দিনগুলোকে যেন আমার নির্মম অসহায়তা আর পরম একাকীত্ব দিয়ে আশ্চর্য উজ্জ্বলভাবে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আমার ভালমানুষ মা—অনুক্ষণ তাঁর ছেলেমেয়ে আর স্বদেশ নিয়ে ব্যস্ত। স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসেন তিনি কিন্তু ক্ষমতার একটু কণাও তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। তারপর বাবা। এমন মহিলার আওতায় পড়ে কোন মানুষ কি স্বস্তিতে জীবন কাটাতে পারেন, আর আমি? জানতাম, মাথাটা আমার নিরেট। যৌবনের চাপল্যের অজুহাত আমার ছিলোই কিন্তু আসলে ভেবেচিন্তে কিছু করার ধাত আমার নয়। সব সময় যেন উপচে পড়ছি, খুশিতে ডগমগ, পাথর কোঁদানো স্বাস্থ্য—ঘরের বাইরেই আমার যত পরিক্রমণ, সব সময়ই খেলা। পাঁচটা মিনিটও চুপ করে বসতে পারি নে। মনঃসংযোগ তো একেবারেই দুরূহ। কুকুর নিয়ে খেলছি, চুপিচুপি ক্যারোলিনকে গোপন তথ্য জানাচ্ছি অথচ চারদিকে অনুক্ষণ কত যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাতে আমার যেন বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য ছিলো না।

বড়দা জোসেফের একুশ বছরে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো। বড়দা রাজি ছিলো না। বলেছিলো, 'বিয়ে করার চেয়ে যুদ্ধ করা বরং সহজ।' শুনে অবাক হয়ে ছিলাম। বিয়েকে এমন ভয়ের কি আছে? তবে

আমার যা স্বভাব—এ কান দিয়ে শুনে, ও কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। কিন্তু ওই নাটকের অর্থ আজ আমার কাছে পরিষ্কার। বড়দার বউ ইসাবেলা খুবই সুন্দরী, শান্ত ; গায়ের রঙ কিন্তু আমাদের মতো ধপধপে নয়। মা ভালবাসতেন ইসাবেলাকে। ইসাবেলা খুবই বুদ্ধিমতী, আমাদের মতো ওর মাথা নিরেট নয়। শুধু বিষণ্ণ। হয়তো বা চপল ছিলাম আমি, বই পড়তে অনীহা ছিলো কিন্তু কেমন করে জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানতাম। আমার চেয়ে বিজ্ঞ হয়েও ইসাবেলা কিন্তু এটা জানতো না। আমাদের বোন মারিয়া ক্রিস্তিনার সঙ্গে কথা বলার সময় ওকে শুধু হাসতে দেখেছি। মারিয়া বড়দার চেয়ে এক বছরের ছোট। একমাত্র মারিয়ার সঙ্গেই বাগানে বেড়াতো ইসাবেলা, ওকে কেমন খুশি খুশি মনে হতো।

ওর প্রথম সন্তান হবার সময় উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ছেলেটা হলো চিররুগ্ন। পৃথিবীর আলো বাতাস বেশিদিন সইলো না ওর। আরও একটা সন্তান হয়ে মারা গেলো। জোসেফের দুঃখের অবধি ছিলো না। ইসাবেলাও দিনরাত কেবলই মৃত্যুর কথা বলতো। জানাতো, বাঁচতে ওর এতটুকুও আগ্রহ নেই।

একদিন সত্যিই মারা গেলো ইসাবেলা। ভিয়েনায় এসে দু বছরও বাঁচলো না। জোসেফ ভয়ানক ভেঙে পড়লো। অনেকদিন এ ভাবেই কেটে গেলো ওর। কিন্তু পরিবারের সবার বড় বলে ঠিক হলো যে ওর আবার বিয়ে করা উচিত। মা যখন ওর জন্যে মেয়ে পছন্দ করলেন খুবই ক্ষেপে গেলো জোসেফ। নতুন বউ ভিয়েনায় পৌঁছলে জোসেফ ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও যেন ভুলে গেলো। নতুন বউয়ের চরিত্র কিন্তু ইসাবেলার মতো নয়। বেঁটে, মোটা, অমসৃণ দাঁতের সারি, মুখে লালচে দাগের অস্তিত্ব। ওর নাম জোসেফা। ওরও কষ্টের সীমা ছিলো না। বড়দা, ওর আর স্ত্রীর ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় একটা প্রাচীর খাড়া করেছিলো যাতে বেরোবার সময় স্ত্রীর মুখোমুখি না হতে হয়। কি দুর্ভাগ্য !

আমার বয়স যখন দশ বছর, এমন একটা কষ্টকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন

হতে হলো, আমার মতো কল্পনাবিহীন চপল বালিকাকেও যা বারে বারে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিলো।

দাদা লিউফোণ্ডের বিয়ের ঠিক হয়েছিলো। আমার আর ক্যারোলিনের এতে অবশ্যই মাথা ঘামানোর কিছু ছিলো না। যাদের অত ভাই বোন, কারও কারও বিয়ে তো হবেই। কিন্তু এবার বিয়েটা হচ্ছিলো ভিয়েনার বদলে ইন্সব্রুকে। স্থির হলো যে বাবা যাবেন ওখানে, রাজকার্যে ব্যস্ত বলে মার যাওয়া সম্ভবপর হবে না।

স্কুলে বসে একটা ছবি আঁকছিলাম। বাবার একজন চাকর এসে জানালো যে বাবা এখনই আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চান। অবাক হলাম এই ভেবে যে মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই ওঁকে বিদায় জানিয়েছি, অন্যদের সঙ্গে যাত্রা করতেও দেখেছি। শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। এখনই যাও।'

সুতরাং ছুটলাম। দেখি বাবা ঘোড়ার পিঠে, চোখ ঘুরিয়ে রাজপ্রাসাদ দেখছেন। আমাকে দেখেই ওঁর চোখ দুটি যেন চকচক করে উঠলো, খুবই যেন খুশি হয়ে উঠলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন না, আমাকেই তুলে ধরা হলো। বুকের সঙ্গে আমাকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম। কি যেন বলতে চাইছিলেন তিনি, আমাকে ছাড়তে চাইছিলেন না। এক সময় তাঁর মুঠি সামান্য শিথিল হলো। আমি ওঁর গলা জড়িয়ে ডাকলাম, 'বাবা, আদরের বাবা।' চোখে জল এলো ওঁর। ডান হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাঁ হাত আমার চুলের ওপর রাখলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাকরকে ইশারা করলেন আমাকে নামিয়ে নিতে। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েটিকে চুমু খেতে কি যে সাধ হচ্ছিলো!'

বাস, চলে গেলেন তিনি। স্কুলে ফিরলাম অন্যমনস্কভাবে। আমার যা স্বভাব, একটু পরেই সব ভুলে গেলাম।

বাবার সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা। ইন্সব্রুকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুরা অনুরোধ করেছিলো শুয়ে থাকতে। না শুনে চলে গেলেন লিউপোল্ডের সঙ্গে অপেরায়। ওখানেই স্ট্রোক হলো তাঁর,

লিউপোল্ডের কোলেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

পরে আলোচিত হয়েছিলো যে মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছে, আমার ভবিষ্যতের ভাবনা ওকে হঠাৎ যেন আলোড়িত করে তুলেছিলো। তাই অমন অসঙ্গতভাবে ডেকেছিলেন আমায়।

কয়েক সপ্তাহ মনমরা হয়ে কাটালাম কিন্তু তারপর যেন মনে হতে লাগলো ওঁকে আমি চিনতামও না। মা কিন্তু ভেঙে পড়লেন। নিজেকে বন্দী করলেন তিনি ঘরের মধ্যে। শোকের তীব্রতা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো যে ডাক্তার এসে ওঁর শিরা কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দিতে বাধ্য হলেন। চুল কেটে ফেললেন তিনি, বিধবার পোশাক পরলেন। পরের যে কটা বছর ওঁকে দেখার সুযোগ হয়েছিলো, অন্য কোন ধরনের পোশাক ওঁকে পরতে দেখিনি।

বাবার মৃত্যুর পর মা যেন আমার সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে বিশেষ একজন ছিলাম আমি। টের পেলাম ওঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ে, ওঁর চোখ যেন ঘুরে ঘুরে আমার ওপরই বেশি এসে পড়তে লাগলো। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু দেখলাম আমার মুখের হাসি দেখলেই কেমন নরম হয়ে যান উনি।

বাবার মৃত্যুর পর কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম ফরাসীদেশে আমার বিয়ে হবে। কৌনিজ, আমার মা আর ফ্রান্সে মার রাজদূতের মধ্যে চিঠিপত্র অনবরত চলতে লাগলো। কৌনিজ অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ তিনি। মা তাঁকে বিশ্বাস করতেন, তাঁর ওপর নির্ভরও করতেন খুব। মার প্রধান উপদেষ্টা হবার আগে কৌনিজ ছিলেন ভার্সাইতে রাজদূত। সেখানে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো মাদাম দ্য পঁপাদ্যুর সঙ্গে। তিনিই প্রথম ফ্রান্সের রাজার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে হাপস্‌বুর্গ ও বুর্বো—এ দুটি বিখ্যাত পরিবারের মধ্যে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, দুপক্ষেরই তা কল্যাণকর হবে।

ক্যারোলিন আবিষ্কার করলো যে ও অথবা আমি—দুজনের এক-

জনের বিয়ে হবে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে। দুজনেই খুব হাসলাম। শুনেছি ফ্রান্সের রাজা বৃদ্ধ, ষাট বছরেরও বেশি বয়স। মার থেকেও বেশি বয়সী কারও সঙ্গে বিয়েতে বসার কল্পনা হাস্যকর ঠেকছিলো আমাদের কাছে। কিন্তু ফ্রান্সের যুবরাজের হঠাৎ মৃত্যু হবার পর, তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলে যখন নতুন যুবরাজ বলে ঘোষিত হলো, সমস্ত ব্যাপারটার রঙ একেবারে বদলে গেলো।

এদিকে জোসেফের দ্বিতীয়া স্ত্রীও মারা গেলেন বসন্তরোগের আক্রমণে। আমার দিদি মারিয়া জোসেকার বসন্ত হলো এবং সেও মারা গেলো। তার বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছিলো নেপল্‌সের রাজার সঙ্গে। মা স্থির করলেন নেপল্‌সের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব একান্তই প্রয়োজন বলে ক্যারোলিনের সঙ্গেই নেপল্‌সের রাজার বিয়ে দেওয়া হবে।

বাবার মৃত্যু দুঃখ দিয়েছিলো আমাকে, কিন্তু এটাই বোধহয় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ক্যারোলিন আমার একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী, ওকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই বুকের ভেতর কাঁপতে লাগলো আমার। বেচারি ক্যারোলিন দুঃখে আর বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলো।

আমার বয়স তখন বারো, ক্যারোলিনের পনেরো। ওর যখন নেপল্‌সে যাওয়াই স্থির হলো, মা আমাকে নিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের জন্যে উপযুক্তা করে তুলতে। তিনি ঘোষণা করলেন আমার নাম আর আঁতোনিয়া নয়, এখন থেকে মারী আঁতোয়ানেৎ। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো মার ব্যক্তিগত প্রাসাদে, বিখ্যাত লোকদের প্রশ্নের জবাব দিতেও হচ্ছিলো আমাকে। সঠিক জবাব কি হতে পারে তাও আগেভাগে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো আমাকে। যথারীতি আবার সেসব ভুলেও যাচ্ছিলাম।

সুখের দিনগুলোর অবসান ঘটলো। চোখ রাখা হলো আমার ওপর, আলোচনা চলতে লাগলো আমার সম্পর্কে—মা এবং তাঁর মন্ত্রীরা যেন বোঝাতে চাইলেন আমি যা ছিলাম এখন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর একজন। অর্থাৎ তাঁরা আমাকে তৈরি করতে চান ফরাসীরা যেভাবে

আমাকে চায়—আমি তাই।

যখন আমি আরও ছোট, বিখ্যাত গায়ক মোজার্ট এসেছিলেন রাজসভায়। তখন তিনি কিশোর মাত্র। মা তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ওঁর প্রাসাদে এসে সবাইকে গান শোনাতে। কিন্তু বেচারা এমন সমাবেশ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান এবং সবাই হেসে ওঠে। আমি ছুটে গিয়ে ওঁকে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। পরে আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি এবং আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও করেছিলেন উনি। ব্যাপারটা আমুদে বলে মনে হয়েছিলো বলে আমিও সম্মতি দিয়েছিলাম। এখন আমার নানা গুণপনার আলোচনায় সে গল্পও পল্লবিত হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো।

মা জানালেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। তিনি যদি জানতে চান কোন্ জাতিকে আমি পছন্দ করি, আমার উত্তর হবে 'ফরাসী জাতি'। অনেক তালিম দেওয়া হলো আমাকে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম সে সব মনে রাখার জন্যে। ফরাসী ভাষা শেখাও আরম্ভ করতে হলো আমাকে।

এদিকে ক্যারোলিন প্রায় সব সময়ই ফোঁপাতে লাগলো। বিয়েকে ওর বড় ভয়। আগেকার আমুদে ক্যারোলিন এখন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। স্কুলে এসে মা ওকে খুবই বকতে লাগলেন। 'তুমি এখন আর ছোট্টটি নেই। শুনেছি তোমার মেজাজও আজকাল খুব তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।' আমার দিকে একবার তাকালেন তিনি। 'আঁতোয়ানেতের কাছ থেকে তোমাকে আলাদা করে নেওয়া হবে। খালি বাজে বকর বকর করতে থাকো তোমরা। তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। বড় বলে তোমাকেই দায়ী করা হবে ক্যারোলিন।'

এক সময় ক্যারোলিনকে চলে যেতেই হলো। বিষণ্ণ মুখে, নিঃশব্দে। সঙ্গে গেলেন জোসেফ, তিনিও ওর দুঃখে মনমরা। জোসেফের মধ্যে তবু খানিকটা মানবিক অবদান ছিলো।

আর এক বোন, মারিয়া অ্যামেলিয়াও খানিকটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুললো। সে আমার থেকে ন বছরের বড়। ক্যারোলিন এবং আমার

জানা ছিলো যে রাজসভার একজন তরুণ প্রিন্স জুইব্রুকেনকে ভালবাসে ও এবং আশা করেছিলো ওকেই বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তো সে সব ঘটার নয়!

শুনতে পেলাম ক্যারোলিনের জীবন নেপল্‌সে একটুও সুখের হয়নি। ওর স্বামী কদাকার। কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কই আমার! স্কুলে এসে মা আমার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে খোঁজ নিচ্ছেন। আমার হাতের লেখা বিশ্রী আর অপরিচ্ছন্ন। ফরাসী ভাষা একটুও শিখতে পারিনি, শুদ্ধভাবে জার্মান লিখতে পারি নে, ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে পারি মাত্র। মা রাগলেন না, শুধু যেন দুঃখিত হলেন। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুধু জানালেন ভবিষ্যৎ আমার জন্যে কি গৌরব সঞ্চিত করে রেখেছে। ভিয়েনায় ভন কৌনিজ আর ফ্রান্সে দু স্থ চোয়াস্যু যা করার চেষ্টা করছেন তা যদি বাস্তবের চেহারা নেয়, তার চেয়ে মনোরম আর কিছু হতে পারে না। জানালেন যে চোয়াস্যু হলেন ফ্রান্সের রাজার উপদেষ্টা আর অস্ট্রিয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন আমার অবিমৃষ্যকারিতায় যদি সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে যায়, আমাদের সম্পর্কে কি ভাববেন তিনি। এমন চোখে আমার দিকে তাকালেন যে চোখ মাটির দিকে নেমে গেলো আমার। মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে দেখি মা জোর করে মুখ গম্ভীর করে আছেন। ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি বোকা বলে হয়তো মঁসিয়ে চোয়াস্যু কিছু মনে করবেন না।' মা বললেন গৌরবে আর দীপ্তিতে ফরাসী রাজসভার তুলনা নেই। আমার খুবই সৌভাগ্য যে এমন গৌরব আমার ওপর বর্তাতে যাচ্ছে। 'তোমাকে ফরাসী ভাষা শিখতে হবে আঁতোয়ানেৎ। শুনেছি রাজার কাণ ভাষা সম্পর্কে খুব তীক্ষ্ণ। ভুল উচ্চারণ আর আজেবাজে শব্দ বলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে আহত করবে না। বুঝতে পেরেছো?' 'হ্যাঁ, মা।' 'সুতরাং খুবই খাটতে হবে তোমাকে।' 'হ্যাঁ, মা।' 'আঁতোয়ানেৎ, কি বলছি তুমি কি শুনছো?' 'নিশ্চয়ই, মা।' এমন গলায় বললাম যেন এর চেয়ে দরকারী ব্যাপার আমার জীবনে আর কিছু নেই। মার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। 'ভিয়েনায় একটা ফরাসী নাট্যকোম্পানী আছে। আমি ওদের দুজন

অভিনেতাকে আনাচ্ছি এখানে। ওঁরা তোমাকে ফরাসী উচ্চারণ শেখাবেন ফরাসী রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারও।' 'অভিনেতা!' 'ওঁরা তোমার সঙ্গে নাট্যাভিনয় করতে আসছেন না।' মারা গলা কঠিন। 'ওঁরা তোমাকে ফরাসী শেখাতে আসছেন, খাটতে হবে তোমাকে। মঁসিয়ে অফ্রেসোঁ শেখাবেন ফরাসী উচ্চারণ আর মঁসিয়ে সাঁভিল শেখাবেন ফরাসী সঙ্গীত।' 'হাঁ, মা।' অন্যমনস্কগলায় জবাব দিলাম। আমার মন তখন ভেসে বেড়াচ্ছে অতীতের কোন অভিনয়-রজনীতে। 'আর মঁসিয়ে নোভের আসবেন তোমাকে নাচ শেখাতে।' 'তাই নাকি!' 'ওঁর নাম শোনোনি, কিন্তু উনি হলেন ইউরোপের সবচেয়ে নামকরা নৃত্য শিক্ষক।' 'আমার খুবই পছন্দ হবে ওঁকে।' 'অতটা উল্লসিত হয়ে উঠো না। কথা বলার আগে ভেবে দেখো। নাচের মাস্টারকে কেউ ভালবেসে ফেলে না।'

তারপরের সময়টা যেন আনন্দের পাখির মতো। ভুলে গেলাম নেপল্‌সে ক্যারোলিনের ভাগ্যহীন দিনযাপন, মনে রইলো না অ্যামেলিয়াকে জোর করে পারমা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা, যেখানে ওর বিয়ে হবে ইসাবেলার ভাইয়ের সঙ্গে। অ্যামেলিয়ার বয়স তেইশ, আর ওর ভাবী স্বামী মাত্র চোদ্দ বছরের। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিছু শেখা আমার কপালে নেই। অভিনেতা-শিক্ষকরা একটুও জোর খাটালেন না আমার ওপর, আমার ফরাসী শুনে খালি বলতে লাগলেন, 'সুন্দর, ভারি সুন্দর মাদাম আঁতোয়ানেৎ। ঠিক ফরাসী হচ্ছে না, কিন্তু তবু সুন্দর।' তারপর সবার মিলিত হাসির বাণ ডাকতো, শেখানোটা আমোদে পর্যবসিত হতো। যা ভালো লাগছিলো—তা হলো নাচের ক্লাস। মঁসিয়ে নোভের সত্যিই ভারি মজলিশি মেজাজের লোক। নাচটা যেন আমার প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায়।

কিন্তু এসব আনন্দের মুহূর্ত কাটতে বেশি দেরি হলো না। অস্ট্রিয়ার ফরাসী রাষ্ট্রদূত আমার আচরণের সবটুকু ভার্সাইতে জানাতে লাগলেন। অভিনেতারা আমাকে ফরাসী শেখাচ্ছেন, এমন আজব খবরটুকুও জানাতে ছাড়লেন না। ভাবা যায়! প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। মঁসিয়ে

চোয়াস্যুর ওপর ভার পড়লো একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের। বন্ধুরা বিদায় নিলেন। মা জানালেন অর্লিয়াঁর বিশপ অ্যাবে ভেরমঁকে আমার ফরাসী শিক্ষক হিসেবে এখানে পাঠাচ্ছেন। খবরটা একটুও খুশি করলো না আমাকে। কোথায় অভিনেতা, হাসিখুশিতে উচ্ছল, আর কোথায় এক গোমড়ামুখো পাদরি। কিন্তু ওঁকে দেখেই বুঝতে কষ্ট হলো না যে পুরনো শিক্ষয়িত্রীর মতো এঁকে বশে আনা একটুও কঠিন হবে না আমার পক্ষে। লোকচরিত্র বোঝার কেমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো আমার। এতে অন্যদের কাছ থেকে আমি যা চাই, তা আদায় করে নিতে পারতাম। আশ্রয় নিতাম ছেলেমানুষী চাপল্যের যাকে অন্যরা ধরে নিতো সৎস্বভাব বলে। চেহারাটাও এই ধাতের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিলো। ছোটখাটো, পরীর মতো দেখতে আমি। ভার্সাইতে যে বিবরণী দিয়েছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাতে আমাকে 'মুখ-রোচক খাবার' বলে বর্ণনা করা হয়েছিলো। সবটুকু হয়তো সত্যি নয়। তবু অন্যদের কাছ থেকে আপন সুবিধাটুকু আদায়ের গূঢ় প্রণালী কি করে যেন মাথায় এসে যেতো আমার। অ্যাবে ভেরমঁকে দেখেও তাই মনে হয়েছিলো। তিনি সুপণ্ডিত বলেই আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। ইতালীয় এবং ফরাসী ভাষা কোন রকমে বলতে পারি, সঙ্গে খানিকটা জার্মান মিশিয়ে নিজের বক্তব্য বোঝাতেও পারি। হাতের লেখা সত্যিই বাজে আমার। ইতিহাসের সামান্যই জানি, ফরাসী সাহিত্য একটুও জানি নে। মঁসিয়ে চোয়াস্যু বলেছিলেন ওটা কিন্তু জানা অত্যাবশ্যক। মোটামুটি গাইতে পারি, গান আমার ভালোই লাগে। নাচতে অবশ্যই শিখেছি। সম্রাজ্ঞীর মেয়ে তো বটেই। কার সঙ্গে কতটুকু কথা বলতে হবে, কাকে দেখে শুধু ঘাড় নেড়ে সরে পড়তে হবে, এ শিক্ষা তো জন্মের মুহূর্ত থেকেই পাচ্ছি। বাচ্চাদের খুবই ভালো লাগে আমার। ক্যারোলিন বলেছিলো বিয়ে হলেই বাচ্চা হবে আর বাচ্চা হওয়াটা খুবই ঝকমারি।

অ্যাবে ভেরমঁ একটুও সুদর্শন নন। প্রায় মধ্যবয়স্ক তিনি তখন। পেশায় তিনি ছিলেন লাইব্রেরিয়ান। বুঝতে পারছিলাম আমার দর দিন

দিন বেড়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের যুবরানী হবার জন্যে প্রস্তুতিপর্ব চলছে, অল্পদিন পরেই রানী হবো। কোন মেয়ের পক্ষে এটা পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান। অ্যাবে তো আমার অজ্ঞতা দেখে অবাক, কিন্তু আমাকে যেন-তেন-প্রকারেণ খুশি করার চেষ্টায় তাঁর কোন কার্পণ্য ছিলো না। তাই তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেওয়া খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠলো। রোজ এক ঘণ্টা পড়াতে লাগলেন তিনি। পরে অবশ্য মাদাম কঁপাঁ বলেছিলেন অ্যাবে সুবিচার করেননি আমার ওপর। অমন সরলীকরণ না করে তাঁর উচিত ছিলো আমাকে গভীরভাবে ফরাসী সাহিত্য পড়ানো, ফরাসী রাজপরিবারে প্রচলিত রীতিনীতি, শিষ্টাচার সম্পর্কে আরও বেশি অবহিত করে তোলা। সারাদিন আমাকে পড়তে বাধ্য করা উচিত ছিলো যাতে ফরাসী ইতিহাস আমার জানা হতো, ফরাসী জনমানস সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা আমার মধ্যে জন্ম নিতো। যে অসন্তোষ ফ্রান্সে ধূমায়িত হচ্ছিলো আমার ওখানে পদার্পণের অনেক আগে থেকেই, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গড়তে সাহায্য না করে মঁসিয়ে ভেরমঁ আমার চরম ক্ষতি করেছেন।

কিন্তু আরও আছে। আমার চেহারা নিয়েও আলোচনার অন্ত ছিলো না। অবাক হতাম আমি নিজেই। চেহারা তো সুন্দরই আমার! মনোরম গায়ের রঙ, মসৃণ, চকচকে। মাথায় চুলের প্রাচুর্য, কেউ বলতো সোনালী, কেউ পিঙ্গল, আবার কেউ বা লাল আখ্যা দিয়েছিলো তার। পরে ফরাসীরা বলতো 'পিঙ্গল মিশ্রিত ছাইরঙ।' আমার দীর্ঘ কপাল খুবই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলো। মা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রদূত স্টারহেমবুর্গের কথায়—'দীর্ঘ কপালের জন্যেই বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে, কারণ এ দেশে উঁচু কপালকে কেউই আধুনিক রুচির মর্যাদা দেয় না।'

আয়নার সামনে বসে বিরাট কপাল নিয়ে বিব্রত বোধ করতাম। কি করে ঢাকি একে! দ্রুত ফ্রান্স থেকে এলেন মঁসিয়ে লারসেন্নু, চুল দেখে বিস্মিত হলেন, কপাল দেখে ভুরু কুঁচকে গেলো তাঁর। তখনই কাজে নেমে পড়লেন। চুল বাঁধার নানা প্রণালীর উদ্ভব করলেন, সর্বশেষে

সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমার চুল যদি মাথার ওপরে একটা উঁচু চূড়ার মতো করে বাঁধা হয়, তার উচ্চতার অনুপাতে কপাল ছোট বলেই মনে হবে। এমন শক্ত করে টেনে চুল বাঁধা হলো যে ব্যথা পাচ্ছিলাম। বলা হলো এভাবেই চুলের প্রসাধন করতে হবে আমায়।

এবার দাঁতের পালা। ওগুলো অসমান। ফ্রান্স থেকে এলেন দন্ত-চিকিৎসক। দাঁত দেখে আঁতকেই উঠলেন তিনি। সব সময় ভেতর দিকে ঠেলতে লাগলেন ওগুলোকে কিন্তু তেমন ইতরবিশেষ ঘটলো না। আমার নিচের ঠোঁটও নাকি অসুন্দর। হাসিতে অবশ্য তা ঢাকা পড়ে কিন্তু অমসৃণ দাঁতের সারি আত্মপ্রকাশ করে বসে।

অবিরাম অন্তর্বাস পরতে হলো আমায়, উঁচু গোড়ালির জুতো পরতে হলো যা মাঠে আমার খেলাধূলো, দৌড়ঝাঁপ বন্ধ করে দিলো। কুকুর নিয়ে দৌড়নো তো নয়ই।

চতুর্দশ জন্মদিন এগিয়ে আসতেই মা স্থির করলেন যে এমন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন যাতে সভাপতিত্ব করতে হবে আমাকে। রাজসভার সকলেই ওতে যোগ দেবেন। আসলে আসরের মধ্যমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছি কিনা এটা তারই পরীক্ষা।

এতে অবশ্য ভয় পাবার কিছু ছিলো না। ভয় পাচ্ছিলাম পড়া নিয়ে। সুতরাং বিনা আপত্তিতে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালাম। নোভের যেভাবে শিখিয়েছিলেন সেভাবেই নাচলাম। সফল হয়েছিলাম।

সময় কাটছিলো। আর দু মাসের মধ্যেই ফ্রান্সের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে আমায়। মার মনে উৎকণ্ঠার অবধি ছিলো না। তাঁর মতে আমার বিন্দুমাত্রও প্রস্তুতি নেই। তাঁর প্রাসাদে আবার ডাকা হলো আমায়। তাঁর শোবার ঘরেই শুতে হবে আমায় যাতে তাঁর অবসর সময়ে আমার ওপর নজর দিতে পারেন। এই ব্যবস্থা ভাবিয়ে তুললো আমাকে। মনে পড়ছে, সে সব রাত্রিদিন কি অসহ্য অস্বস্তিতে কেটেছিলো আমার। সেই রাষ্ট্রীয় শোবার ঘর যেন একটা হিমঘর। হাট করে খোলা সব জানলা, ঘরের মধ্যেই তুষার জমছে। ছুঁচ ফোটানো তীক্ষ্ণ হাওয়ার মাতামাতি। যা কিছু আরাম ছিলো তা শুধু বিছানাতেই। না ঘুমুলেও

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতাম। মা এসে ঠাণ্ডা আঙুলে আমার মুখের ওপর থেকে চাদর সরাতেন, চোখের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ হটিয়ে দিতেন, আর গভীর আদরে চুমু খেতেন। আমার জন্যে কি যে দুশ্চিন্তা তাঁর। বয়স কম আমার, বোকা, কিছু শিখতে অক্ষম আর তাই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নই।

ঘুমের ভান তো সব সময় করা চলে না। তাই মাঝে মাঝে দীর্ঘ কথা-বার্তা, বলতে গেলে স্বগতোক্তি হতো। মা একাই বকে যেতেন।

'ফ্রান্সের রাজা স্থির করেছেন মঁসিয়ে এবং মাদাম নোয়ালে ওখানে তোমার অভিভাবক নিযুক্ত হবেন। কোন কিছু সম্পর্কে দ্বিধায় পড়লে ওঁদের জিজ্ঞেস করবে। উপদেশ নিতে সংকোচ করবে না।'

'তাই হবে, মা।'

'ওঁদের মতামত না জেনে কিচ্ছু করবে না...'

আমার চিন্তা তখন অন্য কোনখানে। অভিভাবক? কেমন হবেন ওঁরা। মনের মধ্যে অসংলগ্ন ছবি গড়তে লাগলাম। মুখে হাসি ফুটলো আমার। আর তাতে আধা-বিরক্ত, আধা-আদুরে গলায় মা বললেন, 'কি যে ঘটবে তোর বরাতে, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি নে মা।'

'প্রত্যেক মাসের প্রথমের দিকে,' একটু থেমে মা আবার বললেন, 'পারীতে একজন দূত পাঠাবো আমি। তোমার চিঠিপত্রও তৈরি করে রাখবে, যাতে ওর হাত দিয়েই আমার কাছে পাঠাতে পারো। আমার চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলবে। তাতে তোমাকে সব কিছু খোলাখুলিভাবে জানাবার সুবিধে হবে আমার।'

সম্মতি জানালাম। এমনি কত উপদেশ, কত সতর্কবাণী। এখান-কার কথা না বলা, নিজের পরিবার সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে কথা বলা, গুজবে কান না দেওয়া, এটা করো ওটা করো না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় বাঁধা। ভেরমঁ আসবেন পাঠ দিতে, চুলের প্রসাধনের জন্যে লোক আসবে, গানের শিক্ষক নোভের রয়েছেন। নাচটাই একমাত্র ভালো লাগে আমার। মা একদিন বললেন, 'নাচটা নাকি ভালই শিখছো? মঁসিয়ে নোভের বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, মা।'

'অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কেও তোমার যদি অনুরূপ বিবেচনা থাকতো। মনে রেখো, কেবলমাত্র আমোদ করার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব ঘটেনি। ভগবান আমোদের ব্যবস্থা করেছেন ছুটি হিসেবে।'

যে দু মাস মার সঙ্গে একই কক্ষে ছিলাম, মার উৎকণ্ঠা চরমে পৌছে-ছিলো। একটা ভয়ঙ্কর অস্থিরতায় ভুগছিলেন। বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেলে কি হবে? মঁসিয়ে কৌনিজের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনায় বসছেন তিনি, মারকুই দ্য দুরকোঁও প্রায়ই মিলিত হচ্ছেন ওদের সঙ্গে।

সেই সময়টা আমার ছুটি। সেই স্যাঁতসেঁতে শোবার ঘরে আমাকে বদ্ধ থাকতে হবে না। আমাকে হস্তান্তরিত করার অনুষ্ঠানটির চেহারা কেমন হবে, সে নিয়ে আলোচনা চলতো দীর্ঘ সময় ধরে। কোথায় হবে সেটা, ফ্রান্স না অস্ট্রিয়ার মাটিতে? মা মাঝে মাঝে এসব আলোচনার কিছু কিছু জানাতেন আমায়। বলতেন, 'তোমারও জেনে রাখা ভালো।'

দু-পক্ষেরই মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত এর সঙ্গে। কতজন চাকরবাকর আমার অনুগমন করবে, কতজন আমার সহচর হবে ফ্রান্স পর্যন্ত। এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো যে মনে হচ্ছিলো বিয়েটাই হচ্ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মতৈক্যে পৌঁছানো গেলো।

মারকুই দ্য দুরকোঁ ফ্রান্সে ফিরে গেলেন তাঁর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিতে। অস্ট্রিয়ার ফরাসী রাজদূতের ভবনটিও সম্প্রসারিত করা হলো যাতে পনেরশো অতিথির স্থান সংকুলান হয়। একজনকেও ছেড়ে আসা শিষ্টাচার বহির্ভূত হবে। শিষ্টাচার। কথাটা যেন বারবার কানে আস-ছিলো। আরও শোনা গেলো বিবাহোৎসব পালনের জন্যে রাজা লুই ভার্সাইতে একটা অপেরা হাউস তৈরি করাচ্ছেন।

মা স্থির করলেন যে এমন জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ আমাকে দেবেন যা ফরাসীদের দেওয়া পোশাকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। শুনে আমার তো খুশির অন্ত রইলো না। আমার এ ধরনের চাপল্যে মা খুশি হলেন কিনা জানি না তবে ক্যারোলিনের মতো আমি যে আত্মহত্যার

মনোভাব দেখাচ্ছি না, মা তাতেই সন্তুষ্ট।

মারকুই দ্য দুরকোঁ ভিয়েনায় ফিরতেই উৎসবের দামামা বেজে উঠলো। এপ্রিলের সতেরো তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের ওপর আমার বংশানুক্রমিক দাবি ছাড়ার শপথ নিলাম। আমার চোখে এসব অনুষ্ঠান একান্তভাবেই অর্থহীন। পরদিন মারকুই দ্য দুরকোঁ ফ্রান্সের রাজার পক্ষ থেকে অস্ট্রিয়ার রাজসভার সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত করলেন। উনিশ তারিখে আমার বিয়ে হলো পরিবর্ত পদ্ধতিতে। ফ্রান্সের যুবরাজের পরিবর্ত হিসেবে বর সাজলো আমার ভাই ফার্দিনান্দ। গীর্জার বেদীর সামনে নতজানু হলাম আমি আর ফার্দিনান্দ। বারবার উচ্চারণ করতে হলো, 'স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করছি,' যাতে আসল মুহূর্তে ভুলে না যাই।

সেই মুহূর্তেই হঠাৎ মনে হলো এ কদিন ধরে যা যা ঘটে গেলো তার সবটুকুই বাস্তব। আমাকে যেতেই হবে অপরিচিত কোন পরিবেশে, অচেনা কোন জীবনে। রূঢ় দীপের ক্ষমাহীন আলোকছটায় আমার এতদিনের শৈশব-কৈশোরের সঞ্চিত চাপল্য, শুদ্ধতা, খেলা-খেলা মনোভাব বাষ্পের মতো বাতাসে উড়ে যাবে। মনে হলো, চিৎকার করে বলে উঠি, 'না, না। আমি রানী হতে চাই নে।' কিন্তু পরের মুহূর্তেই গীর্জার বেদীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, 'আমি আঁতোয়ানেৎ, আমি ফ্রান্সের রাণী হতে যাচ্ছি।'

॥ তিন ॥

আমার প্রাথমিক ধারণাগুলো যে সব ভুল, সে সম্পর্কে কবে বুঝতে শিখেছিলাম আজ আর মনে করতে পারছি নে। আমার মতো চপলা তরুণী, জীবন সম্পর্কে যার কোন ধারনাই গড়ে ওঠেনি, প্রায় না বুঝেই, শুধু বাইরের চেহারা দেখেই, উপসংহারে পৌঁছে যেতাম। আর তা করতে

গিয়েই ধাক্কা খেতে হয়েছে বার বার।

ভেবেছিলাম, স্বামী আর আমি মিলে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা বনে যাবো। হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়াবো ভার্সাইয়ের মনোরম উদ্যানে। শুধু সুখী নয়, বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার কোলে আসবে সুন্দর সবল একটি শিশু। আমি মুগ্ধ হবো, বিস্মিত হবো আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবো। কিন্তু বাস্তবে কি হলো, এমন স্বামী কপালে জুটলো যিনি আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বুদ্ধিসুদ্ধি সবই গুলিয়ে গেলো আমার। সবার নজর আমারই ওপর। রাজার মনোভাবে যেন খানিকটা আবেগহীনতা, পিসিদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, দেওরদের মধ্যে চাপা আমোদ। আমার হিতৈষীরা অর্থাৎ মার্সি, স্টারহেমবুর্গ আর অ্যাবে ভেরম উৎকণ্ঠায় অস্থির। কোথায় যেন ত্রুটি ঘটে গেছে। রাজকুমারের পছন্দ হয়নি আমায়। আর তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে আমিই দায়ী।

প্রথম প্রথম এসব আমার মাথায় আসেনি। শুধু মনে হয়েছে আমি যা ভেবেছিলাম বিয়ে আসলে সে সবের সমাহার নয়। বিয়ের পরের দিনও উৎসবের রেশ একটুও কমেনি, ভাববার অবকাশ ওঁরা আমাকে একটুও দেননি। সন্ধ্যায় নতুন অপেরা হাউসে নাট্যাভিনয় হলো। নাটকটি হলো 'পারমিউস।' ভালো লাগলো না। বিরক্তিতে হাই তুলতে লাগলাম। আমার আচরণ মোটেই শিষ্টাচার সম্মত হলো না।

স্বামীর সঙ্গে শয়নকক্ষে গেলাম। ঠিক আগের মতোই এ রাতটাও কাটলো। ব্যতিক্রম শুধু আমার ক্ষেত্রে। আগের রাত জাগরণের ক্লান্তি আর নাটক দেখার বিরক্তি আমাকে ঘুমের কোলে সঁপে দিলো। ঘুম ভাঙ্গতে দেখি বিছানায় আমি একা। জানতে পারলাম ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই স্বামী উঠে শিকারে চলে গেছেন। সবাই এটা জানে। ওরা খুবই অবাক হয়েছে নতুন বৌকে ফেলে ওঁর শিকারে যাবার প্রবণতা দেখে।

শিকার থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। সহজ সরল গলায়। 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?' 'হ্যাঁ।' আমার দিকে তাকিয়ে

একটুখানি হেসে বিদায় নিলেন তিনি।

ম'সিয়ে ভেরম' আমার কাছেই ছিলেন তখন। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আমি আর কি করি। ফ্রান্সে আসার পর আমাকে যে দুটো কুকুর দেওয়া হয়েছিলো তার একটার সঙ্গে খেলতে লাগলাম। 'ব্যাপারটা অসহ্য মনে হচ্ছে আমার,' ভেরম' আপনমনে গজরাতে লাগলেন। আমারও মনে হচ্ছিলো কোথাও কোন গোলমাল হয়ে গেছে। আমার এমন সৌন্দর্য আর নমনীয়তা সত্বেও যুবরাজ আমায় ভালবাসতে পারেননি।

ম'সিয়ে মার্সি এসে একগাদা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে লাগলেন। মাকে ছেড়ে আসার পরের মুহূর্ত থেকেই ভদ্রলোক যেন আমাকে আগলে রয়েছেন। মা বলেছেন যে কোন ব্যাপারেই ওঁকে যেন বিশ্বাস করি, ওঁর উপদেশ মতো কাজ করি। ভদ্রলোক খুবই বয়স্ক, কঠোর, ছোটখাটো, একটু বেঁকে চলেন কিন্তু বুদ্ধির অভাব নেই। তিনি আদতে বেলজিয়ামের লোক, লীজ এর অধিবাসী, কিন্তু মার একান্ত অনুগত।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন। ওঁর আসল উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। জানতে চান শোবার ঘরের কাহিনী যেখানে স্বামীর সঙ্গেই শুধু সময় কেটেছে আমার।

জানালাম যে স্বামী যেন আমার প্রতি উদাসীন। আমাকে এখন পর্যন্ত স্পর্শ করেননি তিনি। শুতে এসেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে চান তিনি। আজ সকালে আমার জাগার অনেক আগেই উঠে পড়ে শিকারে চলে গিয়েছিলেন।

'ভাবছো, কোন বরের পক্ষে ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক্তারি পড়েছি আমি। মনে হচ্ছে যুবরাজ সাবালকত্ব পাবেন একটু দেরিতে। মাথায় হঠাৎ বেড়ে ওঠাতে ওঁর আভ্যন্তরীণ পেশীগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

হয়তো তাই হবে। স্বামীর শিক্ষককে একটু পছন্দ হয়নি আমার। ওঁর এই মিনমিনে স্বভাব আর ঠাণ্ডা মনোভাবের জন্যে ভদ্রলোকের

ওপর দোষ চাপাতে যাচ্ছিলাম, মার্সি থামিয়ে দিলেন আমায়। 'তোমার মাকে সবটুকু জানাতে হবে আমায়। বলবো, যুবরাজের ব্যাপারে এখনই কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না।'

মার্সি জানালেন যে রাজার কাছে আমার আচরণ যেন আরও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ওঁর কাছে অত স্বাধীন আর সহজ হয়ে ওঠা কি ঠিক হচ্ছে? জানালাম, রাজা সত্যিই পছন্দ করেন আমাকে। তাঁর মধ্যে উত্তাপের অভাব নেই। 'রাজা তোমার মার কাছে লিখেছেনঃ যুবরানী প্রাণবন্যায় উচ্ছল যদিও ছেলেমানুষীতে খুবই চঞ্চলা। সে এখনও ছোট। বড় হয়ে উঠলে নিশ্চয়ই এসব কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

অস্বস্তিতে ভরে গেলো আমার। আমার কানে কানে এতসব মিষ্টি কথার আসর সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত এই লিখলেন মাকে। মার্সি আমার অস্বস্তিতে হাসলেন। ভাবখানা এই, নিজের বোকামি আমার নিজের চোখেই ধরা পড়া ভালো। এতে আমার শিক্ষা হবে।

এই অবস্থায় আমাকে ফেলে চলে গেলেন তিনি। সুতরাং স্বামীর ভালবাসা নেই আমার জন্যে, রাজারও নেই। একজন তাঁর মনোভাব গোপন রেখেছেন, আর একজন রাখেননি।

পিসিরা আমার প্রতি সদয়। আমার সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ওঁরা। মাদাম আদেলেদ নিমন্ত্রণ জানালে সানন্দে গ্রহণ করলাম।

ওঁর ঘরে যেতেই আমায় দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি। 'বেরির স্ত্রী,' বলে হাসির ফোয়ারা ছোটালেন। 'রোসো, ভিকতোয়ারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সোফিকেও। চারজনে মিলে জমাট আসর বসাবো, কেমন?'

ওঁর ঘরে তখন আর একজন তরুণী বসেছিলেন, হাতে খোলা একটা বই। খুবই ছিমছাম মেয়েটি, দেখেই ভালো লাগলো আমার। ওঁর দিকে তাকিয়ে আমাকে হাসতে দেখে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন।

'এর নাম জঁা লুই আনরিয়েৎ জেনে, আমাদের বই পড়িয়ে

শোনায়।' মাদাম আদেলেদ বললেন। 'ভালো পড়ে মেয়েটা, আমাদের ওকে খুব পছন্দ'।

ওকে বসতে বললাম। বলেই মনে হলো ভুল হয়ে গেলো আমার। হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলা অথবা বসার অনুমতি দেওয়া, দুটোই এদেশের শিষ্টাচার বহির্ভূত। এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি যে মুশকিল!

মাদাম ভিকতোয়ার এলেন। বললেন সোফিও আসছেন। আমি অভিবাদন জানালাম। ভিকতোয়ার কঠোর চোখে তরুণী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। তরুণীটিও টুক করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সোফি প্রবেশ করলেন।

'বেরির স্ত্রী এসেছে,' আদেলেদ জানালেন। সোফি যেন বাধ্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন। উঠে গিয়ে ওঁকে চুমু খেলাম। ওঁর মুখে কোন অভিব্যক্তি ফুটলো না। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আদেলেদ দীর্ঘ হাসি হাসলেন। বললেন 'যুবরানী এখানে আছেন জেনেও তোমাদের বসতে বলছি।' শুনে আমি হাসলাম। আদেলেদও হাসলেন। দেখাদেখি ভিকতোয়ার হাসলেন। সর্বশেষে আদেলেদ সোফিকে ইশারা করলে তিনিও হাসলেন। কি অবাক করা কাণ্ড! তবু একটু আগে মার্সি রাজা সম্পর্কে যা বলে গেছেন, মনে পড়াতে ভীত হয়ে উঠলাম আমি।

'তুমি তাহলে বেরির স্ত্রী।' আদেলেদ বললেন, 'বেরি ছেলেটা কেমন খাপছাড়া। অন্য ছেলেদের সঙ্গে ওর একটুও মেলে না।' বলতে বলতে মুখটা প্রায় আমার কানের কাছে নিয়ে এলেন।

ওঁর কথায় বোনেরা পর পর সায় দিলেন। 'ছেলেটা কিন্তু বেশ খেতে পারে।' ভিকতোয়ার যোগ করলেন। 'বেচারা বেরি!' আদেলেদ আবার বললেন, 'ওকে কখনও হাসতে অথবা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে দেখিনি।' 'আরতোঁর মতো?' ভিকতোয়ার যোগ করলেন। 'ওই ছেলেটা?' আদেলেদের গলা খাদে নেমে এলো, 'এখন থেকেই তার একজন রক্ষিতা আছে। এই বয়সে! ভেবে দেখো!'

'ওঁর বয়স নেহাৎ কম।' আমাকে বলতে হলো।

'বেরি কিন্তু মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না।' আদেলেদ বললেন। 'কিন্তু খাওয়ার দিকে নজর দেয় বেশ।' ভিকতোয়ার বলেন। আদেলেদ চোখ তুলে বোনকে দেখলেন। ভিকতোয়ার যেন দমে গেলেন।

'ছেলেবেলায় এখানে এলে আমি বলতাম, এসো বেরি, এখানে কেউ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না। জোরে জোরে কথা বলো, হল্লা করো, তোমাকে মুক্তির সনদ দিচ্ছি, বেরি।' আদেলেদ বললেন।

'কি করলেন উনি?'

আদেলেদ মাথা নাড়লেন। 'অন্য ছেলেদের মতো মোটেই নয় সে। কিন্তু এখম সে স্বামী। আচ্ছা, যুবরানী, সে কি সত্যিই স্বামী?'

অদ্ভুত গলায় হাসলেন তিনি, অন্যরাও যোগ দিলেন। গর্বিত ভাবে জবাব দিলাম। 'হ্যাঁ, তিনি আমার স্বামী।'

'আশা করি, স্বামী হিসেবে বেশ ভালো।' আদেলেদের মন্তব্য।

'হ্যাঁ, বেশ ভালো স্বামী তিনি।' আমার একই সুরে উত্তর।

'মুয়েতের প্রাসাদে ভোজে আমন্ত্রিতা সেই মহিলা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' আদেলেদ প্রসঙ্গ বদলালেন।

'ও, নীলচোখের সেই সুন্দরী মহিলা...'

'এবং তোতলামি।'

'খুব আকর্ষণীয়া মনে হয়েছিলো।'

আদেলেদ সেনাপতিসুলভ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'জানো, মেয়েটা রাজাকে নরকের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।'

থ হয়ে গেলাম। 'কি ভাবে? আমি তো শুনেছি ওঁর কাজ হলো রাজাকে আনন্দ দেওয়া।'

আদেলেদ সশব্দে হেসে উঠলেন। পর পর তাতে যোগ দিলেন ভিকতোয়ার ও সোফি। 'ওই মেয়েটা একটা বেশ্যা। কথাটার মানে কি তুমি জানো?'

'আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'ওই মেয়েটা হলো রাজার রক্ষিতা। বোঝা গেলো কিছু?'

ইশারায় জানালাম বুঝতে পেরেছি। প্রসঙ্গটা আমার কাছে খুব অরুচিকর ঠেকছিলো।

'রাজার অন্যায় এমন একটা মেয়েকে ভোজসভায় নিয়ে আসা।' গলার স্বর নামিয়ে বলেন, 'বিশেষ করে এমন পবিত্র একটা মুহূর্তে। এটা তোমাকে অপমান।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম সে রাত্রে মার্সি এবং অন্যান্যরা কেন এতটা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ওঁরা জানতেন যে ওই মেয়েটিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যা আমাকে মোটেই সম্মান দেখানো নয়। রাগে আর অভিমানে আমার মুখ কালো হয়ে উঠলো।

'তোমার অস্থির হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই।' আদেলেদ বললেন। 'আমাদের তোমার হিতৈষিনী বলে মেনে নিতে পারো।' বোনেদের সম্মতি পাবার পর বললেন, 'যখনই ইচ্ছে হবে এখানে চলে এসো। আমার ঘরের একটা চাবি তোমার কাছে থাকবে। সবসময় তোমার সাহায্যে এগিয়ে যাবো আমরা।'

আদেলেদের তৈরি কফি খেয়ে, আরও অনেক বকর বকর করে, ওদের কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, এই রাজপরিবার সম্পর্কে আমার ধারণা তখন অনেকখানি বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিয়ের পর কয়েক সপ্তাহ গড়িয়ে গেলো কিন্তু এত দিনের মধ্যেও আমার স্বামী আমার সঙ্গে গুনে গুনে মাত্র কয়েকটি কথা বিনিময় করেছেন। রাজার সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। ভুলে গেছি মার্সি অথবা পিসিদের মন্তব্য। মাঝে মাঝে এত বেশি নাচগান আর খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান হয়েছে যে আমার ভয় কেটে গেছে। আমার দেওর আরতোঁ সদাসর্বদা আমার সঙ্গী হচ্ছে। পিসিদের ওখানেও বার কয়েক গেছি। আগের মতো অস্বস্তি বোধ করিনি। বোধ হয় কোন কিছু তলিয়ে দেখা আমার স্বভাব নয় বলেই। সব সময়ই হাসিখুশি থেকে বরং এই ভাবা ভালো যে, সবাই পছন্দ করে আমাকে আর ক্রমশই সাফল্য লাভ করছি আমি।

মাদাম আদেলেদ বাজি পোড়ানো দেখাতে নিয়ে গেছেন

আমাকে। ছদ্মবেশে পারীও গেছি। সরকারীভাবে জাঁকজমকের সঙ্গে রাজধানী প্রবেশের অনুষ্ঠান এখনও হয়নি। ভেবেছি স্বামীর সঙ্গে সব উৎসবে যদি যেতে পারতাম, যদি আরতোঁর মতো হঠাৎ তিনি হাসি খুশিতে মেতে উঠতেন। কিন্তু তা যেন হবার নয়। তিনি যাচ্ছেন শিকারে অথবা তালা তৈরির কারখানায়। রাজা আছেন বেলভুঁতে মাদাম দু বারির সঙ্গে। সুতরাং আদেলেদের সঙ্গে বাজি পোড়ানো দেখতে যেতে কোন অসুবিধে ছিলো না।

খুবই বিরাট উৎসব এটা। আর সবটাই করা হচ্ছে আমার আগমন উপলক্ষে। আস্তে আস্তে শহরের দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ ছুটো বাজি সারা আকাশকে অপরূপ আলোকসজ্জায় রাঙিয়ে দিলো। এমন অদ্ভুত সুন্দর আলোর বিচ্ছুরণ আগে দেখিনি।

হঠাৎ শহরের প্রবেশমুখে গাড়িটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো। অনেক চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ কানে আসতে লাগলো। চালক আমাদের গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ভার্সাই অভিমুখে চালিয়ে দিলো। 'কি হলো হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করলাম।

আদেলেদ জবাব দিলেন না। ভয় পেয়ে গেছেন, ভার্সাই পর্যন্ত ফিরে আসার পথে একটা কথাও বললেন না।

পরদিন জানতে পারলাম কি ঘটেছে। কটা বাজি হঠাৎ ফেটে গিয়ে আগুন ধরে যায়। দমকল যখন ঘটনা স্থলের দিকে যাচ্ছিলো, অন্যান্য অনেক গাড়ি ও লোকজন সেদিক থেকে ফিরে আসার জন্যেই রাস্তাঘাট আটকে গিয়েছিলো। কোন কিছুই নড়তে পারছিলো না। রু রয়েল, রু দ্য লা বঁ-মেরো এবং রু সাঁ-ফ্লোরেনতিন প্রভৃতি রাস্তায় চল্লিশ হাজারেরও বেশি লোক আটকে পড়েছিলো। যারা পরে গিয়েছিলো, অন্যরা তাদের মাড়িয়ে দিলো, অনেক গাড়ি উলটে পড়লো, বহু লোক ভিড়ের চাপে প্রাণ হারালো।

সবার মুখেই সেই দুর্ঘটনার কথা। যুবরাজ শোবার ঘরে এলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার খবর শুনে খুবই মুষড়ে পড়েছেন তিনি। মনে হচ্ছিলো বেদনায় তাঁর মুখের রেখা বদলে গেছে। তিনি জানালেন

কালকের দুর্ঘটনায় মোট একশো বত্রিশ জন মারা গেছে।

শুনে চোখে জল এসে গেলো আমার। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, অন্যান্য দিনের মতো চোখ ফিরিয়ে নিলেন না।

'আমারই দোষে এমন হলো।' বলতে চাইলাম। 'আমি এদেশে না এলে তো এসব ঘটার কারণই হতো না।'

'ওদের সাহায্যের জন্যে যা করতে পারি, তাই করতে হবে আমায়।' আমার দিকে তাকিয়েই বললেন।

'নিশ্চয়ই। তাই করো।'

টেবিলে বসে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে লাগলেম। ওঁর কাঁধের পাশ দিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। 'দুর্ঘটনার খবর কানে এসেছে আমার। এটা ঘটেছে আমার উপলক্ষে। খুবই অনুতপ্ত বোধ করছি। রাজা প্রতিমাসে আমায় যা হাতখরচ দেন তাই পাঠাতে চাই আমি দুর্গতদের সাহায্য কল্পে। এ ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই।' চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অন্তত এইটুকু তো করতে পারি আমি।'

'আমার যা আছে আমিও তা পাঠাতে চাই।' আমি বললাম।

'বেশ তো।' সম্মতি দিলেন তিনি। তখনই বুঝতে পারলাম আমাকে তিনি ভালবাসেন না, এমন নয়। আমার প্রতি আচরণের অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।

'মা,

মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর দয়ায় আমি একান্তই অভিভূত। এমন একদিনও ঘটেনি যখন আপনার অর্থাৎ আমার মার চিঠি আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। যদিও এখানে সুখেই দিন কাটছে আমার, তবু ফেলে আসা পরিবেশে, মারকাছে ফিরে যাবার জন্যে, স্বল্প সময়ের জন্যেও আমার আকুলতার অন্ত নেই।

ভার্সাইতে আমার সারাটা দিন কেমন কাটছে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করাটা মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর উদার মনের পরিচয় বহন করছে।

সকাল নটা অথবা দশটায় উঠে, প্রসাধন সেরে প্রার্থনা আওড়াই। তারপর প্রাতরাশ সেরে পিসিদের কাছে যাই। ওখানে রাজার সঙ্গেও প্রায়ই দেখা হয়। সাড়ে দশটা পর্যন্ত এভাবে কাটে। এগারটায় চুল বাঁধার জন্যে যেতে হয়। তারপর অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, পদস্থ ব্যক্তিদের যে কেউই আসতে পারেন। ভদ্রলোকেরা চলে গেলে মহিলাদের সামনেই আমি আমার পোশাক বদলে নিই। বারোটায় ধর্মোপাসনা। রাজা ভার্সাইতে থাকলে তাঁর সঙ্গে যুবরাজ আর পিসিদের সঙ্গে নিয়ে উপাসনায় যাই। উনি না থাকলে যুবরাজের সঙ্গে যাই। তারপর দুপুরের খাওয়া। প্রায়ই দেড়টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এর পর যাই স্বামীর কাছে। তিনি ব্যস্ত থাকলে নিজের ঘরে ফিরে এসে পড়তে, লিখতে, অথবা সেলাই করতে লেগে যাই। রাজার জন্যে একটা জামা তৈরির কাজে হাত দিয়েছি। আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যে সেটা শেষ করা সম্ভব হবে। তিনটেয় সাধারণত পিসিদের ওখানে যাই। রাজাও সে সময় এসে যান ওখানে। চারটেয় অ্যাবে আসেন, পাঁচটায় বাজনার অথবা গানের শিক্ষক, ছটা পর্যন্ত থাকেন। পিসিদের কাছে আমার সঙ্গে আমার স্বামীও প্রায়ই যান। সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত তাস খেলি। আবহাওয়া যদি ভালো থাকে, বেরিয়ে পড়ি আমি। তখন তাস খেলা হয় পিসিদের ওখানে। নটায় রাতের খানা। রাজার অনুপস্থিতিতে পিসিরা এসে যোগ দেন আমাদের সঙ্গে। রাজা থাকলে খাওয়ার পর পিসিদের কাছে যাই, রাজা ওখানে আসেন প্রায় পৌনে এগারোটায়। রাজা আসা পর্যন্ত সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দিই। এভাবেই দিন কাটছে আমার।

আশা করি মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পেরেছি। কিছু বাদ পড়লে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ সম্রাজ্ঞীর চিঠিগুলো তাঁরই নির্দেশ মতো পুড়িয়ে ফেলেছি। ইতি,

সম্রাজ্ঞীর একান্ত অনুগত কন্যা,

মারী আঁতোয়ানেৎ

চোয়াসির রাজপ্রাসাদ থেকে লিখেছিলাম চিঠিখানা। এতে আমার তখনকার জীবনের একঘেয়েমি ধরা পড়েছে। ভেবেছিলাম আমার ফ্রান্সের জীবন হবে উত্তেজনায় ভরা, রোজই কোন নতুন ঘটনার রঙে উজ্জ্বল। কিন্তু প্রাক বিবাহিত জীবনের চেয়েও এটা যেন বেশি একঘেয়ে।

প্রথম কয়েকমাস মার জন্যে বড় বেশি মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্যই তাঁর চিঠি পেলেই সেগুলোর বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। বুঝতে পারতাম না মার্সি কি ভাবে আমাকে প্রতি মুহূর্ত নজরে রাখছেন। রাজনীতিক হিসেবে তিনি অবশ্যই ধুরন্ধর, তবু একটি তরুণী মেয়ে কখন কি চাপল্য দেখালো, কোন্ চাকরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হেসে ফেললো, কখন কি পরলো, তা কি ভাবে তাঁর চোখে পড়ছে ভেবে উঠতে পারতাম না। ওখানেই আমার বোকামি। স্কুনব্রুনের যে বাচ্চা মেয়েটা কুকুর নিয়ে খেলতো, তার থেকে ফ্রান্সের যুবরানীর তফাৎ কর্তব্যের মধ্যেই নয়। উপলব্ধির অভাব তো ছিলোই, নিরীক্ষণেরও। জানতাম না যে ফ্রান্সের যুবরানী, একদিন যিনি রানী হবেন, মেয়ে অথবা নারী হিসেবে তাঁর দাম নেই, তিনি হলেন একটি প্রতীক। তাঁর কার্যাবলীর ওপর শান্তি অথবা যুদ্ধ নির্ভর করে। তাঁর একটু ভুলে সিংহাসন কেঁপে উঠতে পারে। আমার সামান্যতম ভুলভ্রান্তির খবরও মা কেমন করে পান, তাঁর কাছে তা জানতে চাইলে তিনি জানাতেন, 'একটা ছোট্ট পাখি আমায় জানিয়েছে।' কখনই বলতেন না, পাখিটি হলো মার্সি। অবশ্যই বোঝা উচিত ছিলো আমার। অসহ্য ঠেকলেও মার্সি ছিলেন আমার প্রকৃতই বন্ধু।

তখনকার দিনে আমার একমাত্র সমস্যা স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। জানতাম এটা নিয়েই আশেপাশের সবার মাথাব্যথা—কেউ ভাবছেন, কেউ কেউ গোপনে হাসাহাসি করছেন। প্রোভাঁস খুশি লুইয়ের অক্ষমতায়, আরতোঁ যে চোখে আমার দিকে তাকায়, তাতে যেন হালকা আমোদের সঙ্গে অনেকখানি ছলচাতুরী মেশানো। মার্সি অনবরত ইশারা করছেন আরতোঁ থেকে যেন সাবধান থাকি। তার ওপর পিসিরা হাজারো

উপায়ে জানতে উৎসুক স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের গভীরতা কতখানি হলো।

মা যখন লিখলেন, 'যেহেতু তোমরা দুজনেই একেবারে কচি', এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে আমার তেমন অসুবিধে হলো না। সাময়িকভাবে একে ভুলে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

রাজসভায় আরও একজনকে হিতৈষী হিসেবে গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা ছিলো না। ইনি দ্যু ড্য চোয়াস্যু। তিনিই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, চাইতেন আমি যেন সুখী হই। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন একটা সময়ে আমার ফ্রান্সে আসা যখন তাঁর ক্ষমতা পড়তির দিকে। মাদাম ড্য পঁপাদুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ওঁকে রাজার চোখে নিন্দনীয় করে তুলেছিলো। মাদাম বারির ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা ছিলো, তাই ওঁর পতন ঘটলো।

আমার চোখে মাদাম দ্যু বারি খুবই আকর্ষণীয়া হলেও ওঁকে ঘৃণা করতাম। কারণ সেই ব্যক্তিগত নৈশভোজে রাজা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং মার্সির মতে ওটা আমার পক্ষে অপমান সূচক। মাকে ওঁর সম্পর্কে জানাতে মা আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে নাক গলাতে যেও না। অন্যের ব্যাপারেও মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই তোমার।' আমার মোটা মাথায় ঢোকেনি যে ওকথা মাদাম বারি সম্পর্কে লেখা।

আমার বিয়ের সময়ে দ্যু বারির প্রভাব অনেকখানি। ওঁর দলের নাম ব্যারিয়েনস্। মন্ত্রীদের মধ্যে ওই দলে রয়েছেন দ্যু ড্য আয়গুলোঁ, দ্যু ড্য ভগুয়েঁা এবং দ্যু ড্য রিচলুঁ। এঁরা তিনজনই দ্যু ড্য চোয়াস্যুর পরম শত্রু। ওঁরা প্রচার করেছিলেন সাত বছরের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ও অপযশের জন্যে চোয়াস্যুই দায়ী। এই প্রচার এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো যে রাজা ওঁকে নির্বাসিত করলেন। রাতারাতি যেন উপে গেলেন মঁসিয়ে চোয়াস্যু। খুবই আঘাত পেলাম আমি। ভীতও হলাম এই ভেবে যে এমন আঘাত অন্যের ক্ষেত্রেও হঠাৎ নেমে আসতে পারে।

আমার স্বামী যে আমাদের বিয়েকে সম্পূর্ণতা দান করতে অক্ষম একথা শুধু ফ্রান্স নয়, ইউরোপের সব রাজধানীরই আলোচিত বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সবাই বলাবলি করছে আমার স্বামী পুরুষত্বহীন। আমার মতো সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও যদি তাকে কামোত্তেজিত করতে না পেরে থাকে, তাহলে আশা করার মতো সত্যিই কিছু নেই।

আমাদের তুজনের পক্ষেই ব্যাপারটি চরম অস্বস্তিকর। বুঝেও না বোঝার ভান করছি আমি, কুকুর নিয়ে খেলছি, নেচে বেড়াচ্ছি, এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন আমাদের বিয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে এমন কোন ধারণাই আমার নেই। স্বামীর প্রক্রিয়া হলো ঔদাসীন্য—যা সত্যিই তাঁর মধ্যে নেই। বিরক্ত হবার ভান করছেন উনি, তালা নির্মাতাদের অথবা বাস্তুকারদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। সময় পেলেই শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন, আর মনের আনন্দে ভোজন করছেন। এ সব ছাড়া ওঁর জীবনে যেন আর কিছু করনীয় নেই। কিন্তু আমি তো জানি, আমার মতো ওঁরও অস্বস্তির সীমা নেই। হয়তো আরও বেশি, কারণ ওঁর মানসিক গভীরতা বেশি, দোষটাও সম্পূর্ণ ওঁরই। গত কয়েক মাসের মধ্যে নানাভাবে আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে ওঁর পরিতাপের শেষ নেই। আমাকে খুশি করার জন্যে তিনি সত্যিই ভারি উৎসুক। আমার সঙ্গে তাঁর রুচিবোধের প্রার্থক্য যতটাই হোক, আমার কোন কাজে তিনি পারতপক্ষে কোন বাধা দেবার চেষ্টা করেননি।

তবু পরস্পরের প্রতি আমরা যেন প্রতিনিয়তই বেশি আকর্ষণ বোধ করছি। কিন্তু এই কুৎসিত পরিস্থিতিকে ঠেকাবো কি করে? আমাদের শোবার ঘরের কাহিনী যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় গানের কলির মতো লোকের মুখে মুখে ভাসছে—'সে কি পারলো, না পারলো না?' 'সে কি করেছে না করেনি?' স্বামীর অক্ষমতা যদি কোন জটিল মানসিকতা প্রসূত হয়, এসব কুৎসিত কানাঘুষো ওঁকে আরও দমিত করে ফেলছে।

মা লিখেছেন 'সব কিছু' যেন তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানাই।

যুবরাজ কি করলেন অথবা কি বললেন কিছুই যেন বাদ না দিই। তাঁর চিঠি পড়ার পরই যেন পুড়িয়ে ফেলি। কারণ আমার চারপাশে শত্রুর গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোন কিছু নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তা আমার ধাতে সয় না। আমি চাই আমোদপ্রমোদে মগ্ন থাকতে। ঘোড়ায় চড়া আমার প্রিয় সখগুলোর একটি। অথচ মা বারণ করেছেন ঘোড়ায় চড়তে। বেশি ঘোড়ায় চড়লে মেয়েরা নাকি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হারায়। এমনিতেই বুঝি মা হবার কোন সম্ভাবনা আছে আমার! তিনি ও মার্সি ঠিক করলেন রাজাকে বলে আমার ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ করবেন।

মনে মনে খুবই আহত হলাম। এই পরিবেশে কিই বা করার আছে আমার। রাজার কাছে ছুটে গেলাম। খুবই অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললাম ঘোড়ায় চড়া বন্ধ হওয়াতে খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার।

বিব্রত বোধ করলেন তিনি। আমার অন্তত বোঝা উচিত ছিলো যে এ জাতীয় ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তাঁর পক্ষে ভয়ানক বিরক্তিকর হতে পারে। কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গিতে কোন কিছু প্রকাশ পেলো না। আমায় কাছে ডেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন যে আমার মার অনুরোধেই এটা করতে হয়েছে। আমার মার কথা কি মানতে রাজি নই আমি?

জানালাম নিশ্চয়ই মানতে চাই কিন্তু ঘোড়ায় চড়তে না পারা যে অসহ্য ঠেকছে আমার।

'ঘোড়ায় চড়া বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু গাধায় চড়া তো তোমার বারণ নেই। তারই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কাজেই গাধায় চড়তে লাগলাম, যা আমার একটুও ভালো লাগলো না। আবার গাধার পিঠ থেকেই একদিন পড়ে গেলাম। একটুও লাগেনি আমার কিন্তু পরিচারকরা হতচকিত হয়ে গেলো। ওদের সাহায্য ছাড়াই উঠে পড়লাম। কিন্তু এই পতনের কথাটা যথাসময়ে ঠিকই মার কানে গেলো। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গাধায় চড়াতেও মা মনে মনে দুঃখিত হলেন। লিখলেন, 'শুনলাম তুমি আজকাল গাধার ওপর

চড়ছো। তোমায় বারণ করেছিলাম। তোমার গায়ের রঙ আর দেহের গঠন নষ্ট হবার চেয়েও বেশি অপকার হবে এতে।' চিঠিটা পাবার পর প্রতিজ্ঞা করলাম আর ঘোড়া অথবা গাধা চড়া নয়। কিন্তু সেটা ভুলতেও দেরি হলো না। কয়েকদিন পরেই আবার গাধায় চড়া সুরু করে দিলাম।

পিসিদের সঙ্গে তখন আমার ভাবের অন্ত নেই। আদেলেদের মেজাজ যেন সব সময়ই চড়ে রয়েছে। কোন অজুহাত পেলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছেন। প্রধান লক্ষ্য হলেন মাদাম তু বারি। যখন শুনলেন রাজার আদেশে আমার ঘোড়ায় চড়া বন্ধ হয়েছে, ওটা নিয়েই আসরে নেমে পড়লেন। 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার! ঘোড়ায় চড়া বারণ! আমার মতে প্রত্যেকেরই ঘোড়ায় চড়া উচিত। ফ্রান্সের যুবরানীর জন্যে একটা গাধার ব্যবস্থা! খুব-খুবই অপমানজনক।'

ভিকতোয়ার সায় দিলেন, কয়েক সেকেণ্ড পরে সোফিও। 'নিশ্চয়ই আমাদের কোন গোপন শত্রুর কাজ এটা।' আদেলেদ বলে উঠলেন।

প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম আমার মার অনুরোধেই এটা ঘটেছে। তিনি তো আমার শত্রু নন। কিন্তু আদেলেদ তখন ঝগড়ার বিষয় পেয়ে গেছেন। আমাকে অপমান, আমাকে উপহাস অসহ্য। তক্ষুনি একটা পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলো তিন বোনের প্রচেষ্টায়। স্থির করা হলো যথানিয়মে গাধায় চড়ে আমি মাঠে বেড়াতে যাবো। একটু পরেই কোন পরিচারিকা একটা ঘোড়া নিয়ে ওখানে যাবে। আমি গাধা থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে বসবো এবং এক চক্কর মেরে ওখানে এসে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে আবার গাধায় চড়ে প্রাসাদে ফিরে আসবো।

'এতেই বাজিমাৎ।' আদেলেদ সহর্ষে বললেন। 'সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে।'

'মা কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট হবেন।' আমি দ্বিধাজড়িত গলায় বললাম।

'তিনি জানবেন কি করে?'

'তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে চাইনে আমি।'

'তিনি অনেক দূরে অষ্ট্রিয়ায় রয়েছেন। তিনি তো আর জানেন না

তোমাকে নিয়ে এখানে রঙ্গ তামাসা চলছে গাধায় চড়িয়ে।'

ওদের পরিকল্পনামতো কাজ করতে সম্মত হতেই হলো আমাকে। ভীতচকিত ভাবে অথচ অনেকটা নির্দোষ আমোদের জন্যেই ঘোড়ায় চড়লাম। চাকরদের মধ্যে একজন মার্সিকে ঘটনাটা জানালো আর কিছুক্ষণ পরে আমার প্রাসাদে মার্সির উপস্থিতি এবং তাঁর কঠোর দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিলো যে আমার চাতুরী তিনি ধরে ফেলেছেন।

'ঘোড়ায় চড়ার খবর জেনে ফেলেছেন?' ধরা ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ'।

'যাঁরা আমায় দেখেছেন, আমাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে খুশি হয়েছেন তাঁরা।'

'আমি তাঁদের দলে নই।' মার্সির গলা গম্ভীর। 'আমার দুঃখ শুধু এই যে, তোমার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু ঘটতে পারতো যাতে সম্রাজ্ঞীর অসন্তোষ কুড়োতে তুমি।'

ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'সম্রাজ্ঞীর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে উঠবো, একথা ভাবতেও পারিনি। আপনি তো জানেন ঘোড়ায় চড়া যুবরাজেরও প্রিয় ব্যায়াম। অন্তত ওঁকে খুশি করার জন্যেও তো আমার কিছু করা উচিত।'

এ কথার জবাব দিলেন না মার্সি। শুধু বললেন তিনি এখন চলে যাচ্ছেন, আমিই যেন এ সম্পর্কে ভেবে দেখি।

কথাটা মার কানে যাবার পর মা জানালেন যে ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে খুবই বেদনাকর। ফ্রান্সের রাজা ও যুবরাজ যদি আমায় ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে মার দায়িত্বের সবটুকুই এর পর তাঁদের ওপরই বর্তাবে। এই ব্যাপারে পিসিদের ভূমিকাও তাঁর অজানা ছিলো না। লিখলেন, 'সব ব্যাপারে নিজেকে পক্ষপাতশূন্য অবস্থায় রেখো। কি ঘটছে তাতে চট করে নিজেকে প্রবিষ্ট করে দিও না। গোপন কিছু শুনতে যেও না অথবা কোন আগ্রহ দেখিয়ো না। পিসিদের কাছে কোন ব্যাপারে বিশ্বাস ন্যস্ত করতে যেয়ো না। এ কথা তোমাকে

বলবার কিছু নিজস্ব কারণ রয়েছে আমার।'

আমার বিয়ের একবছর পরে আমার দেওর প্রোভাঁসের বিয়ে হলো। ওর স্ত্রী মারি যোসেফি ভার্সাই এলো মে মাসে। প্রথম দর্শনেই ওকে ভালো লাগলো না আমার। কুৎসিত দেখতে শুধু নয়, ওর শরীরের কোথাও কোন কমনীয়তা নেই। ওকে নিয়ে প্রোভাঁস একটুও খুশি হতে পারলো না। সবাই আমার সঙ্গে তুলনা করে ওকে বিচার করছে দেখে আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলো ও। কিন্তু বুদ্ধিমতী ও, প্রকাশ্যে দেখাতে লাগলো আমার সঙ্গে তার খুবই সখ্যতা জন্মেছে।

আমার ওতে গা নেই। আমি তখন সখ্যতা পাতিয়েছি রাজকুমারী দ্য লঁব্যালের সঙ্গে, অ্যাবে ভেরমঁর আপত্তি সত্ত্বেও। অ্যাবে মনে করেন লঁব্যাল ভারি বোকা। আরও একজন আমার বন্ধুত্ব পেয়েছেন যদিও তাতে ভেরমঁর সমান আপত্তি। তিনি হলেন জঁা লুই আনরিয়েৎ জেনে, পিসিদের সেই পড়ুয়া মহিলাটি। তাঁর সঙ্গে আমার চরিত্রের একটুও মিল নেই। তিনি গম্ভীর, আমি চপল। তিনি কথা বলেন কম, আমি বেশি। তবুও আমায় পছন্দ করেন তিনি। রাজাকে বলেছিলাম, 'পিসিদের যিনি পড়িয়ে শোনান, আমার জন্যেও আমি তাঁকে নিযুক্ত করতে চাই।' রাজার সম্মতি মিলতে দেরি হয়নি। মাদামোয়াজেল জেনেকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছি। পড়ার চেয়ে গল্প করতে বেশি ভালবাসি বলে ওঁর মুখ থেকে রাজসভার অনেক কাহিনী শুনেছি। ওতে আমার ধ্যানধারণার অনেক উন্নতি হয়েছে।

জেনের বাবা বিদেশ দপ্তরে কাজ করেন। দ্যু ভ্য চোয়াস্যুর নজরে পড়েছিলেন বলে রাজসভায় জেনের প্রবেশও সহজ হয়ে উঠেছিলো। লেখাপড়ার প্রতি খুবই ঔৎসুক্য ছিলো বলে তাঁর জ্ঞানের বহর অনেককেই বিস্মিত করেছিলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিষ্কার গলায় কোন কিছু পড়ে যেতে পারতেন বলেই পিসিদের পড়িয়ে শোনাবার কাজটি পেয়েছিলেন।

এভাবেই ভার্সাইয়ের দিনগুলো কাটতে লাগলো আমার। রাজকুমারী লঁব্যালের সঙ্গে সখ্যতা গভীরতর হতে লাগলো দিন দিন।

মার চিঠিও নিয়মিত আসতে লাগলো। অ্যাবে চাইতেন আমার মানসিক উন্নতি, মার্সি চাইতেন আমার আচরণের উন্নতি। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব, আরতোঁর সঙ্গে রঙ্গ তামাসা, এর মধ্যে আবার স্বামীর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক দিন দিন মধুরতর হয়ে উঠছিলো। কিন্তু আমরা রয়েছি, বলতে গেলে, জনতার চোখের সামনে, প্রত্যেক পদক্ষেপে অন্যদের দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ। আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটা তাই সহজসাধ্য ছিলো না।

এমনকি খাওয়া দাওয়াও চলতো সবার সামনে, যে রীতি আমার দু চোখের বিষ। অথচ অন্যরা যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পারী থেকে ওরা আসতো আমাদের খাওয়া প্রত্যক্ষ করতে। যেন চকচকে খাঁচায় বন্দী কোন বন্য প্রাণী আমরা।

রাজা কিন্তু খাবার টেবিলে বসে এমন ভাব করতেন যেন ওর আশেপাশে আর কেউ উপস্থিত নেই। কাঁটাচামচের এক টোকাতেই ডিমের ওপরের অংশটা ভেঙে ফেলার কায়দা দেখাতেন তিনি। বোধ হয় সেটা দেখার জন্যেই দলে দলে লোক এসে খাবার টেবিলের চারদিকে ভিড় জমাতো। রাজা পারীতে যেতেন না, পারীর লোকেরাই ভার্সাই আসতো তাঁকে দেখতে অথবা তাঁর ডিম ভাঙার কায়দা দেখতে। রাজা চোখ তুলে তাকালেও কাউকে যেন দেখতে পেতেন না।

বড়পিসি আদেলেদ ভাবতেন স্বামীর সঙ্গে আমার আচরণের ব্যাপারে আমি যেন তাঁর পরামর্শ নিই। অথচ কারও পরামর্শের দরকার ছিলো না আমার। জানি, স্বামী আমায় অপচ্ছন্দ করেন না। তিনি বরং আমার প্রতি প্রসন্ন। আমার মুখশ্রী, দেহসৌষ্ঠব, কমনীয়তা সব কিছুর জন্যেই প্রশংসার ঢেউ উঠছে। আরতোঁ যে আমার সঙ্গী হয়ে উঠেছে এতেও তিনি সন্তুষ্ট। অসুবিধা দেখা দেয় আমাকে আদর করতে গেলে অথবা আমার গুণকীর্তন করতে গেলে। তিনি যখন শিকারীর পোশাকে অথবা কারখানার মিস্ত্রির পোশাকে থাকেন, সুপুরুষ মনে হয় তাঁকে ; লম্বা, সরলসোজা, নিজের সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু রাজকীয় পোশাক পরলেই কেমন বোকাবোকা আর নড়বড়ে মনে হয় তাঁকে। তাঁর আগ্রহ

সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করেছি। ঘোড়ায় চড়তে ভালো লাগলেও জীবজন্তুর যন্ত্রণা সইতে পারিনে আমি, শিকারে তাই আমার কোন আগ্রহ নেই। তাঁর কারখানায় অবশ্যই গেছি। লেদ মেসিনে তিনি কি করছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাকে। যদিও কিছুই বুঝতে পারিনি।

অসুস্থ হলে অথবা পেট খারাপ হলে অন্য ঘরে শুতে যেতেন তিনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াই তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছিলো বলে এটা প্রায়ই ঘটতো। আর অস্বস্তির অন্ত থাকতো না আমাদের। সবাই নজর রাখতো, হতচকিত হতো, নানা মন্তব্য করতো, আপন আপন যুক্তি খাড়া করে। অনেক সময়ই সমস্ত ব্যাপারটার ভুল ব্যাখ্যা প্রচারিত হতো। ওঁর মতো সচেতন অথচ স্পর্শকাতর একজন যুবকের পক্ষে ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়তো।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনুরাগ বাড়ছিলো। এখন আর আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন না। কোন কোন দিন আমার হাতটা টেনে নিয়ে ওতে চুমু খান, এমন কি আমার ঠোঁটেও গভীর চুমু দেন। জিজ্ঞেস করেছি আমাকে পেয়ে কি তিনি নিরাশ হয়েছেন? জবাবে জানিয়েছেন আমাকে পেয়ে তিনি খুবই সুখী।

একদিন বললেন, 'ভেবো না, বিয়ের কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। একদিন তার প্রমাণ আমি দেবো—আর সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়।'

শুনে রোমাঞ্চিত হলাম। সব ঠিক ঠিক পথে চলছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা, এটা তো ঠিক যে আমাদের দুজনের বয়সই নেহাত অল্প।

একদিন নিজেদের ঘরে আমরা শুধু দুজন, আমি তৈরি হচ্ছি পিসিদের কাছে যাবার জন্যে, তিনি চুপিচুপি বললেন, 'আজরাতে আমাদের বিছানায় আবার ফিরে আসবো আমি।'

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার হাত দুখানি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে প্রকৃত প্রেমিকের মতো চুমু খেলেন আমায়। বললাম, 'লুই, সত্যিই কি ভালবাসো আমায়?'

'বিশ্বাস হয় না তোমার? খুবই ভালবাসি তোমায়। তারও চেয়ে

বেশি শ্রদ্ধা করি তোমায়।'

কোন প্রেমিকের আবেগভরা উক্তি নয় এটা কিন্তু ওঁর মতো মানুষের কাছ থেকে হয়তো এর চেয়ে গভীর কিছু আশা করা যায় না। সেই অধীর রোমাঞ্চের পুলকে আত্মহারা হয়ে পিসিদের কাছে ছুটলাম। এমন বোকা আমি যে আমাকে দেখেই ওঁরা বুঝে ফেললেন কিছু একটা ঘটেছে।

'বেরির কাছ থেকেই আসছো তুমি।' আদেলেদ বললেন। 'কিছু ঘটেছে কি?'

'আজ রাতেই হবে আমাদের বাসরশয্যা।'

আদেলেদ জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। ভিকতোয়ার ও সোফি চকিত বিস্ময়ে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে।

'আমাকে বললেন তিনি।' আমার গলায় বিজয়ীর উল্লাস।

'আরেকটা খবর দিতে বেশি সময় নেবে না বলে মনে হচ্ছে আমার।' আদেলেদ তীক্ষ্ণগলায় বললেন।

'তাই যেন হয়। আহা, তাই যেন হয়।'

আমার বোকামির আদি অন্ত ছিলো না। দিন ফুরোবার আগেই রাজসভার সবার মুখে মুখে ধ্বনিত হতে লাগলো একটি কথা। 'যুবরাজ যুবরানীকে অংকশায়িনী করছেন। আজই সে রাত।' সেই বিশ্বনিন্দুক সভাসদ রিচলুঁ বাজি ধরতে চাইলেন এর সাফল্য সম্পর্কে, 'তিনি পারবেন, না, পারবেন না?' চারদিকে অবিরাম ফিসফাস চলতে লাগলো। সবচেয়ে মারাত্মক হলো পিসি আদেলেদ যখন লুইকে 'পরামর্শ' দেবার জন্যে নিজের কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

সেই রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্ত স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র কেটে গেলো আমার। তিনি দর্শন দিলেন না। বিস্মিত হবার কিছু ছিলো না। আমার অর্বাচীন উক্তি সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব ছিলো অসাধারণ, এমনকি রাজাও বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার মা বারবার রাজাকে অনুরোধ করছিলেন আসল কারণটা কি, সে সম্পর্কে তিনি যেন অনুসন্ধান করে দেখেন।

যুবরাজের সম্পর্কে সত্য উদ্‌ঘাটিত করে, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা যেন রাজা নিজেই করেন। রাজা অনন্যোপায় হয়ে লুইকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। লুই রাজি হলেন রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক মঁসিয়ে লেসোঁকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করাতে। ডাক্তার জানালেন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লুইয়ের শারীরিক কোন অক্ষমতা নেই ; যা দরকার তা হলো সামান্য অস্ত্রোপচার। যুবরাজ যদি এতে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

সবাই এ বিষয়ে বলাবলি করতে লাগলো কিন্তু লুই হ্যাঁ না কোন মন্তব্য করলেন না। একই বিছানায় রাত কাটতে লাগলো আমাদের, প্রেমিকের মতো অভিনয়ও চালিয়ে যেতে লাগলেন আমার স্বামী। কিন্তু প্রেমের চরম পরিণতিতে পৌঁছতে আন্তরিক ইচ্ছে সত্ত্বেও ব্যর্থ হলাম আমরা। পরিশেষে দুজনেই উপলব্ধি করলাম এ ধরনের প্রচেষ্টা শুধু ক্লান্তিকর নয়, হাস্যাস্পদও। অস্ত্রোপচারের কথা আর উঠলো না। রাজা কোন মন্তব্য করলেন না, লুইয়ের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়া হলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ওতে তিনি রাজি নন। প্রাণপণে বোঝাতে চাইলেন যে ওতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু আমি তো জানি প্রয়োজন সত্যিই ছিলো।

তখন বুঝতে পারিনি এতে কেন তিনি রাজি নন। তিনি তো কাপুরুষ নন। আসলে পরিবেশ একটুও আমাদের অনুকূলে ছিলো না। যদি সাধারণ দম্পতি হতাম আমরা, ব্যাপারটা করেই চুকেবুকে যেতো। কিন্তু আমরা যে ফ্রান্সের যুবরাজ আর তাঁর রানী। তাঁর নপুংসকতা নিয়ে কথা উঠেছে রাজসভায়, সৈন্যদলে। আমাদের একান্ত বশংবদ পরিচারকরা অবিরাম প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এটাও যখন জানা গেলো যে স্পেনের রাষ্ট্রদূত একজন চাকরকে ঘুষ দিয়ে বিছানার চাদর পরীক্ষার কাজে লাগিয়ে তার ফলাফল জানতে চান, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। একই বিছানা দুজনের বিশ্রামস্থান হলেও উনি আগেভাগে শুতে চলে যান। আমি যখন শুতে যাই উনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন, আর সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙে, তার অনেক আগেই তিনি শয্যাত্যাগ

করে চলে গেছেন।

এভাবেই দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। মার চিঠিগুলো ক্রমশঃই তাঁর ক্রুদ্ধ মনোভাব বহন করে আনতে লাগলো। এভাবেই বিয়ের দ্বিতীয় বছরও অতিক্রান্ত হয়ে গেলো।

আরও একটা জটিল আবর্তে এমন জড়িয়ে গেলাম যে আমাদের বিছানার ব্যাপারটা গৌণ হয়ে গেলো। আমার সঙ্গে মাদাম দু বারির সম্পর্কের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করেছিলো পিসিদের মুখে তাঁর প্রকৃত পরিচয় অবগত হবার পর থেকেই। অবশ্যই আমার উচিত ছিলো পিসিদের ছেড়ে দিয়ে ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়ানো। আসলে এই পরিবারের বধূ হয়ে আমার আসার ব্যাপারে ওঁরা গোড়া থেকেই বাধা দিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ওঁদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিলো। তাই, আসলে ওঁরা আমার বন্ধু ছিলেন না। কিন্তু এই মহিলার পরিচয়ের মধ্যে যতই ফাঁক থাকুক, তাঁর হৃদয়ে মমতার অভাব ছিলো না। চোয়াস্যুর সঙ্গে ওঁর যতই মনান্তর থাকুক, আমার প্রতি কোন বিরাগ ছিলো না। সামান্যতম সৌহার্দ্য দেখালেও তিনি তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিতেন আমায়। কিন্তু আমি তো বোকার হদ্দ। পিসিদের কথায় নাচছি, ওঁকে প্রাণপণে অবহেলা দেখাচ্ছি। অভিনয়ের স্বাভাবিক নিপুণতা তো আমার ছিলোই। তাই দিয়ে ওঁর কথাবার্তা, হাবভাব নকল করে অন্যদের দেখাচ্ছি। ওঁরা হেসে গড়িয়ে পড়ছেন আর সে সব খবর যথারীতি মাদাম দু বারির কানে উঠছে।

বুঝতেই পারিনি যে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি আমার থেকে অনেক বেশি ছিলো। নইলে পারীর কোন রাস্তার মেয়ের পক্ষে রাজসভার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছনো সম্ভব ছিলো না। রাজার অনুরাগের অন্ত ছিলো না ওঁর প্রতি। মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বসতেন রাজার চেয়ারের হাতলের ওপর। ওঁর প্রতি রাজার নজর কাড়তে চাইলে, তাঁর হাতের কাগজ ছিনিয়ে নিতেন। এতে রাজাও খুব কৌতুক বোধ করতেন। কেউ বিরূপ মন্তব্য করলে রাজা বলতেন, 'মেয়েটি সুন্দরী, আমাকে খুশি রাখে। এটাই কি আপনার সন্তুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়?' সবাই তাই

জানতেন রাজার অনুগ্রহ পেতে হলে মাদাম দু বারিকে খুশি রাখতে হবে। কিন্তু আমি রাজার স্নেহধন্যা। সাধারণ মানদণ্ড তো আমার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাই ভেবে নিয়ে ঠিক করেছিলাম সামান্যা কোন বারবধূর মনোরঞ্জন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হোক না তিনি রাজার রক্ষিতা। তাই এমন ভাব দেখাতে লাগলাম যেন ওঁকে চিনিই না আমি। বারবার এমন ঘটেছে যে, আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থেকেছেন, কিন্তু আমি যদি ওঁকে আমন্ত্রণ না জানাই, আমার সঙ্গে আলাপ তো শিষ্টাচার সম্মত হতে পারে না। আর বারবার ওঁকে উপেক্ষা করেছি আমি।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে না চাইলেও আমাকে পাত্তা দেওয়া তাঁর চরিত্র নয়। তিনি আমার উপনাম দিয়েছিলেন, 'অস্ট্রিয়ার ছোট্ট গাজর।' অন্যদের মুখে তা ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুনে রাগে ফুঁসতে লাগলাম আমি। ওঁর আরও নিন্দে করতে গেলাম, আরও উপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের ব্যাপারটা রাজসভার একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। মাদাম দু বারিরও সহ্যের বাইরে চলে গেলো এটা। রাজাকে একদিন তিনি অনুরোধ করলেন যে আমাকে যেন আদেশ করা হয় ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। রাজা এসব পছন্দ করতেন না বলেই অপ্রসন্ন হলেন। আমার মাথায় এলো না যে এ সবের জন্যে তিনি আমার প্রতিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রথমে মাদাম নোয়ালেকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সরাসরি কিছু না বলে ওঁকে বরখাস্ত করলেন। মাদাম নোয়ালে তো ছুটে এলেন আমার কাছে। ওঁর বক্তব্যের মোদ্দা কথাটা হলো রাজসভার কোন সভ্যের প্রতি আমার আচরণ রাজাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সভ্যের পরিচয় জানতে চাইলে মাদাম নোয়ালে জানালেন যে মাদাম দু বারির সঙ্গে আমি যদি আলাপ করি, তাহলেই রাজা খুশি হবেন। ঠোঁট চেপে রইলাম। একজন বেশ্যার সঙ্গে আলাপ করতে হবে আমাকে!

আবার একই বোকামি। পিসিদের সব কথা বলে ফেললাম। ওঁরা তো নিজেদের ঘরে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিলেন। জানালেন যে ওঁরা

আমার পক্ষে রয়েছেন। দরকার হলে আমার স্বপক্ষে ওকালতি করবেন রাজার কাছে। সেই বেশ্যামাগীটার সঙ্গে কথা বলবে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ রানী! পরামর্শ দিলেন এমন ভাব দেখাতে যেন মাদাম নোয়ালের সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথাই হয়নি আমার।

অ্যাবে ভেরমঁ এসে ঘটনাটা শুনলেন। ছুটে গিয়ে মার্সিকে জানালেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি মার কাছে দূত পাঠালেন। বেচারী মা। আমার বুদ্ধিহীনতার চাবুক তাঁকে কতবারই না ক্ষতবিক্ষত করলো। নিশ্চিন্ত ছিলাম যে মা আমাকেই সমর্থন করবেন। মেয়েদের চরিত্রভ্রষ্টতা কখনই সহ্য করতে পারেতন না তিনি। কিন্তু তাঁকে এই ধরনের বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা যে আমার উচিত নয়, এই সাধারণ ধারণাটুকুও আমার মধ্যে তখন তৈরি হয়ে ওঠেনি। তাঁর পরিবর্তে চিঠি পেলাম কৌনিজের। তিনি পরোক্ষে জানালেন যে রাজা যাঁকে সাদরে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অশিষ্ট আচরণ রাজারই অসম্মান ডেকে আনা। আমার উচিত রাজাকে অসম্মান করা থেকে দূরে থাকা। মার্সি বললেন ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর এবং আর বিলম্ব না করে আমি যেন মাদাম দু বারির সঙ্গে কথা বলি।

মার্সির উপদেশ আমার কানে গেলো না। অবস্থা জটিলতর হতে লাগলো দিন দিন। রাজার পরোক্ষ আদেশ মান্য করা যে আমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য, এই সবল সত্যটুকু বুঝে ওঠার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমার ঘটে দেননি। মাদাম দু বারিকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। ভোজসভায় তাসের আসরে ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি হবার মুহূর্ত এলেই কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়তে লাগলাম।

রাজা মার্সিকে ডেকে পরোক্ষভাবে বললেন যে আমাকে যেন মাদাম দু বারির সঙ্গে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মার্সি এসে অনেক বুঝিয়ে, মার সঙ্কটের কথা বলে আমাকে রাজি করালেন। পিসিরা শুনে তো বেজায় খাপ্পা। কিন্তু এবার আমার জন্যে আর কোন পথ খোলা নেই। আশেপাশের সবাই জানলো আমি মাদাম দু বারির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।

বৈঠকখানায় মহিলারা যথারীতি আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন। রীতি হলো, যেতে যেতে প্রত্যেকের সঙ্গেই কোন না কোন বাক্যবিনিময় করবো আমি। মাদাম দু বারিও ছিলেন ওঁদের মধ্যে। তিনি আমাকে আদপেই এই অবস্থায় ফেলতে চাননি কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাকে তাঁর বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে। কিন্তু অপরিণত মানসিকতায় আমি তখন অতসব জানবো কি করে। আজ ওঁর সঙ্গে আলাপ করতেই হবে আমায়, ফ্রান্সের রাজা আর অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এটাই চান।

ওঁর কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় আমার বাহুর ওপর কারও হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি আদেলেদ। 'রাজা ভিকতোয়ারের ঘরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। চলো, আর দেরি করো না।' চুপি চুপি বললেন আমায়।

দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পিসিদের সঙ্গেই ফিরে এলাম। মাদাম দু বারির সামনে এসেও কথা না বলে অপমানের চূড়ান্ত করলাম ওঁর।

পিসিদের ঘরে এসে শুনলাম ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এটা পিসিদের আর একটা চাল। বুঝতে পারলাম আরও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি।

একটু পরেই এলেন মার্সি। বললেন, 'তোমার আচরণ রাজাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। ব্যাপারটাকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই তাঁর। তোমার মার কাছেও দূত যাচ্ছে এখনই।'

মার চিঠিও এলো। আমার প্রতি তাঁর মনোভাবে একটুখানিও সহৃদয়তা নেই। জানতে চেয়েছেন ফ্রান্সের রাজাকে অপমান করার মতো ধৃষ্টতা আমার হলো কি করে। তিনি যদি চান তাঁর কোন বিশেষ অনুগ্রহভাজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোক, তাতে অসম্মতির অর্থই হলো রাজার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো।

খুবই বিব্রত হলাম। বুঝতে পারলাম এই ব্যাপারে আমার পায়ের তলায় আর মাটি নেই।

নববর্ষের দিন মাদাম দু বারির সঙ্গে কথা বললাম। ওঁর মুখে যেন অনুগৃহীতার ভাব ফুটে উঠেছে। অনেকবারের আওড়ানো কথাটাই

বলে ফেললাম। 'ভার্সাইতে এখন ভালো সঙ্গিনীর অভাব নেই।'

এটুকুই যথেষ্ট। তাঁর সুন্দর চোখ দুটিতে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো, তাঁর নরম ঠোঁটের আগায় কোমল মাধুর্য বিস্তৃত হলো। আমি আরও এগিয়ে গেলাম।

রাজার সঙ্গে দেখা হলে তিনি জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। সারা রাজসভা ওই আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। মাদাম দু বারি তো খুবই খুশি। শুধু পিসিরাই খুশি নন। ওখানেও মার্সির কথাই ঠিক। দু বারির সামনা-সামনি হলে পিসিরা খুবই ভদ্র আর বিনীত হয়ে পড়েন, মুখবাজি যা, সব আড়ালে আবডালে।

আমার মনে সুখ ছিলো না। সকলের চাপে মাদাম দু বারির কাছে হার স্বীকার করতে হলো আমায়। মাকে জানালাম এই শুধু একবার, ওই মহিলার সঙ্গে আর কথা বলছি নে আমি।

মাদাম দু বারি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনোভাবে ওঁর প্রতি কোন সহানুভূতি ছিলো না। আমার ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে ওঁর সব প্রচেষ্টাকেই আমি একে একে বানচাল করে দিলাম। বেচারী আর করেন কি। তখনকার মতো তাই মেনে নিলেও আমার অনমনীয়তা তাঁকে বিঁধছিলো। সবার মতো তিনিও মেনে নিলেন যে সেদিন ভার্সাইতে ভালো লোকের কমতি ছিলো না।

॥ চার ॥

এই ঘটনা থেকে এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, সব ব্যাপারে পিসিদের ধামাধরা হয়ে উঠলে আমার দুর্গতির শেষ থাকবে না। তিল থেকে তাল তৈরি করা ওঁদের অভ্যাস, আমার সঙ্গে মাদাম দু বারির মনান্তরের মূলেও ছিলেন ওঁরা।

নিঃসন্দেহে শৈশব কাটিয়ে উঠেছি আমি। মাথায় বেড়েছি অনেক-

খানি, সেই ছোটখাটো ছিমছাম মেয়েটি আর নই। মাথার চুল সুন্দর হয়েছে, বাদামীর সঙ্গে যেন তাতে সামান্য লালের আভা, গাজর বলে অন্তত আর আমাকে উপনাম দেওয়া যাবে না। মাদাম ছু বারির ব্যাপারে শুধু রাজার ক্ষমাই পাইনি, এই রূপান্তর-করণে তিনি মনে মনে খুশিও। সুন্দরী না হলেও আমার মধ্যে আকর্ষণের অভাব ছিলো না। উঁচু কপাল আর অসমান দাঁতের সারি এখনও আছে, তা সত্ত্বেও আমার রূপের জৌলুস বেড়েছে। গায়ের রঙ তো নিখুঁত, গ্রীবার সুন্দর গড়ন ও ঈষৎ ঝোলানো কাঁধ দেহসৌষ্ঠবকে রমনীয় করে তুলেছে।

হীরে ও সুন্দর পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও অকারণ দম্ভ আমার মধ্যে ছিলো না। রাজা অথবা আরতোঁ যে প্রশংসা মাখানো দৃষ্টিতে আমাকে দেখতেন, তেমনি চোখের দৃষ্টি দেখেছি রাজসভার আরও অনেকের মধ্যেই। কিন্তু বুদ্ধির গোড়ায় একটুও হাওয়া লাগেনি আমার। আমি সেই ভাবনাচিন্তাহীন আরামের দিকে ছুটে চলা একটি মেয়ে। কোন কিছু আমার মাথায় ঢোকে না, কোন অভিজ্ঞতাই আমাকে কিছু শোনায় না।

অবশ্য যুবরাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন অনেক গভীর। আমাকে নিয়ে ওঁর গর্বের শেষ নেই। আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা কানে গেলে তাঁর মুখে ধীরে ধীরে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ওঁর প্রতি আমার টানও বাড়ছে। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা অস্বাভাবিক, বিছানায় সক্ষম স্বামীর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার জন্যে আমার প্রতি অবিচার করছেন, এমন ভাব ওঁর মুখে প্রায়ই ভেসে ওঠে। আমি ওঁকে জানাতে চাই যে এতে ওঁর কোন দোষ নেই। আমার প্রতি ওঁর সেই উদাসীনতার একটুও অবশিষ্ট নেই। আমাকে আদর করেন, ওঁর সঙ্গে আমাকে একাত্ম করে নেবার আগ্রহেরও অন্ত নেই। আমরা দুজনে একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে একদিন সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের মধ্যে ঘটবে।

অন্তরঙ্গতাও বাড়ছে আমাদের। বেশি খেলে অথবা মিষ্টি খাবারের প্রতি লোভ দেখালে আজকাল ওকে বকুনি দিতে থাকি। আমার

স্বামীর স্বভাবের মধ্যে অনেকখানি অস্বাভাবিকতা আছে। ও যেন রাজ-পরিবারের মধ্যে বেমানান। পোশাকের বাহুল্য নেই, আমোদ-আহ্লাদের উৎসাহ নেই, বিলাসের প্রতি ওর একান্ত অনীহা। সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে মেশে, পরিশ্রম করে ওদের মতো। রাজমিস্ত্রি, ছুতোর-মিস্ত্রি অথবা কারিগরের কাজে ওর অনেক উৎসাহ। মার্সি মাকে লিখেছেন—'যুবরানী কি আর করেন, যুবরাজের স্বভাব তো আর বদলানো যাবে না।'

আমার বিরক্তি ধরে যায় মাঝে মাঝে। আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে মঁসিয়ে মার্সি এত বেশি নাক গলায়। মার্সির উপদেশ, মার চিঠি। যাই করি ওঁরা যেন সন্তুষ্ট হতে চান না। এটা করো না, ওটা খেয়ো না ইত্যাদি ইত্যাদি। মনের ঔদার্য বাড়াও, ধর্মগ্রন্থ পড়ো—এতে তোমার ভালো হবে। আমি যা ভালবাসি—গান, ছবি আঁকা অথবা নাচ—ওরা প্রাণপণে সেগুলোর নিন্দে করবেন।

মাঝে মাঝে এমন রাগ হয় আমার। যেন কচি খুকিটি রয়ে গেছি। তিরিশ বছর বয়স হলেও মা অথবা মার্সির চোখে আমি যেন সাবালিকা হবো না।

কি আর করি। এ সব ভুলে থাকার জন্যেই হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। হাতের কাছে তো আরতোঁ আছেই। দুজনে মিলে মার্লিতে চলে যাই সূর্যোদয় দেখার জন্যে। সঙ্গে আরও কয়েকজন থাকে কিন্তু যুবরাজ যান না। ভারি সুন্দর দৃশ্য, দিগন্তরেখা পেরিয়ে একটু একটু করে সূর্য ওপরে উঠছে, ধীরে ধীরে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চারিদিক। কিন্তু মানুষের পাপচোখে এমন অপার্থিব দৃশ্যও কলুষিত হয়ে ধরা পড়ে। যুবরানীর প্রাতভ্রমণ! সে কি শুধু সূর্যোদয় দেখার জন্যে?

নিজের অজান্তেই নিজেকে নিন্দের শরিক করে তুলছি আমি। যখন ছোট ছিলাম, মনের আনন্দে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতাম, অন্য কথা ছিলো। এখন আমি পূর্ণ যুবতী, যার স্বামী নপুংসক, এমন ধারণা লোকের মনে দানা বেঁধে আছে। আমার তাই আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। মাদাম নোয়ালে তাই একদিন জানিয়ে গেলেন, এমন

অবিবেচনা প্রসূত প্রাতভ্রমণ যেন দ্বিতীয়বার করতে না ছুটি।

কোথাও মুক্তির হাতছানি নেই। পারীতে গেলে হয়তো ভালো লাগতো। পারীর জীবনে উত্তেজনার অভাব নেই। ভয়ানক ব্যস্ত শহর। অপেরা হাউসে নিয়মিত বলনাচের অনুষ্ঠান হচ্ছে। নাচতে ভীষণ ভালো লাগে আমার; মুখোস পরে, সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে, কেউ ধারণাও করতে পারবে না ওদের মধ্যে রয়েছে যুবরানী, শিষ্টাচারের শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে!

'তোমার পারী প্রবেশ সরকারীভাবে হওয়া উচিত।' মাদাম নোয়ালে বললেন।

'কখন হবে সেটা?'

'ওটা স্থির করবেন স্বয়ং রাজা।'

নিরাশ হলাম। এত কাছে এত বড়ো একটা শহর অথচ ওখানে যাবার অধিকার আমার নেই। গাড়িতে গেলে মোটে ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। কিন্তু কি অদ্ভুত, আমার যাওয়া নিষেধ!

ইচ্ছেটা পিসিদের জানালাম। আমার প্রতি ওঁদের স্নেহের মাত্রা অনেক কমে গেছে, যদিও আদেলেদ ভান করেন যেন এখনও আমার প্রতি স্নেহের অন্ত নেই তাঁর। কিন্তু ভিকতোয়ার এবং সোফি নিজেদের মনোভাব লুকোতে পারেন না। 'তোমার যা তা ভাবে পারী যাওয়া চলে না।' আদেলেদ বললেন। 'একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্বামী বললেন উপযুক্ত সময়ের জন্যে আমার অপেক্ষা করাই সঙ্গত। আরতোঁর মনেও সন্দেহ। তাই ধরে নিলাম যে, কারও ইচ্ছে নয় আমি পারী যাই।

'সময়টা পারী যাবার ঠিক উপযুক্ত নয়।' আরতোঁ বোঝাতে চাইলো। 'তুমি তো জানো ঠাকুর্দা কখনও ওখানে যান না। পারীকে ঘৃণা করেন তিনি কারণ পারীর লোকেরা আর ওঁকে পছন্দ করেন না। তুমি ওখানে গেলে যুবতী আর সুন্দরী বলে ওরা তোমার গুনগান করবে কিন্তু ঠাকুর্দাকে একটুও অভ্যর্থনা জানাবে না। যুবরানীর প্রশংসা আর রাজার অপমান—এটা তুমি নিশ্চয়ই চাও না।'

স্থির করলাম স্বয়ং রাজাকেই জিজ্ঞেস করবো। ঠিক জানি যে মোক্ষম সময়ে আবদার ধরলে উনি না বলতে পারবেন না। দু বারির সঙ্গে কথা বলা এবং পিসিদের কাছে যাতায়াত কমিয়ে দেওয়াতে রাজার স্নেহ বেশি করে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর। ওঁর কাছে গেলেই জড়িয়ে ধরেন আমায় আর আমার সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে প্রাতরাশের সময় আমার কাছে চলে আসেন। নিজের হাতে কফি বানাতে ভালবাসেন উনি। এক কাপের বেশিই তৈরি করেন। এর অর্থ পরিবারের একজন বলে আমাকে উনি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সুতরাং একটা সময় বেছে নিয়ে ওঁর কাছে কথাটা পাড়লাম। 'বাবা, গত তিনবছর ধরে আমি আপনার মেয়ে বনে গেছি। কিন্তু রাজধানী দেখার সৌভাগ্য এখনও হলো না আমার। পারী দেখতে আমার খুবই ইচ্ছে।' 'সময় হলেই ওখানে যাওয়া হবে তোমার।' একটু দ্বিধা জড়ানো গলায় জবাব দিলেন তিনি।

'কিন্তু কবে বাবা, কবে?' গলা জড়িয়ে ধরলাম ওঁর।

'খুব খুশি হয়েছো মনে হচ্ছে।'

'ভাগ্য ভালো যে জলজ্যান্ত শিষ্টাচার এখানে এখন উপস্থিত নেই।'

খুশি হলেন তিনি। মাদাম নোয়ালের এই উপনামে তিনিও কৌতুক বোধ করেন। 'কি সৌভাগ্য আমার।' আমার হাত টেনে নিয়ে গলার কাছে চেপে রাখলেন।

'আমি পারী দেখতে চাই। শিষ্টাচারের দাবী হলো এতে আপনার অনুমতি দরকার।'

'ও, শিষ্টাচার আর যুবরানী—দুজনেই আমার কাছে সমান প্রিয়। তবে যুবরানীর পাল্লাটা একটু বেশি ভারি মনে হচ্ছে।'

সুতরাং পারী চলো। স্বামীর কাছে গিয়ে খবরটা দিতে একটুও দেরি করলাম না। একটু যেন বিস্মিত হলেও আমার খেয়াল চরিতার্থ হতে যাচ্ছে দেখে খুশিও হলেন।

আরতোঁকে বললাম। 'পারী! ওখানে বলনাচে অংশ নেবার কত-

দিনের সাধ আমার। জানো, রাজার সম্মতি না পেলে ঠিক করেছিলাম, তুমি-আমি গোপনে একটা দল করে ছদ্মবেশে পারী চলে যাবো।'

চকচক করে উঠলো আরতোঁর দুচোখ। আমার প্রতি ওর সহানুভূতি খুব। বললো, 'আমাকে যেতে বলছো ?'

'আমি তো যাচ্ছিই। আড়ম্বরের সঙ্গে, শিষ্টাচারসম্মতভাবে।'

'চলো, শিষ্টাচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাই।'

'কেমন করে ?'

'ওকে পেছনে ফেলে। ঘোমটাওয়ালা আলখাল্লা পরে নেবো আমরা, মুখে লাগাবো মুখোস। সোজা গাড়ি হাঁকিয়ে পারী যাবো। অচেনাভাবে বলনাচে যোগ দেবো।'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। আনন্দের আতিশয্যে আমাকে চেপে ধরে ঘরের মধ্যেই নাচ শুরু করে দিলো ও। আমার একটুও আপত্তি নেই। ভারি মজা হবে। উৎসবের আগেই পারী যাওয়া ! আরও আগে এমন ভাবেনি কেন আরতোঁ ?

খুবই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আমার হাতে চুমু খেলো আরতোঁ। দেওরের পক্ষে বেশ বাড়াবাড়ি। ঠিক করলাম স্বামীকেও দলে টানতে হবে।

লুই বিব্রত বোধ করলেন। গোপনে যাবার দরকারটাই বা কি যখন দিনকয়েক পরে খোলাখুলিভাবেই যেতে পাচ্ছি। 'কারণ এতে অনেক বেশি মজা।' মজার ধারণাটা অনুভবের মধ্যে আনতে গিয়ে ভুরু কুঁচকালেন তিনি। আমার চরিত্র বোঝা মুশকিল ওঁর পক্ষে, যেমন ওঁর কামারের কাজ অথবা রাজমিস্ত্রির কাজের মজাটুকু আমার ধারণায় আসে না।

'আমি যেতে চাই। জানি, তুমি কোনদিন আমার আনন্দের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।'

রাজি হলেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ছিলো না আমাদের মধ্যে। আমাকে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিতেন উনি, বোধ হয় শোবার ঘরের লজ্জা আর বেদনা ঢাকার জন্যেই।

রাত্রি একটু গভীর হলে রওনা হলাম আমরা, আলখাল্লাতে শরীর ঢেকে, মুখোস দিয়ে মুখ ঢেকে। এমন রোমাঞ্চকর সন্ধ্যা আমার জীবনে আর আসেনি। পারীর পরিবেশের উত্তেজনায় শরীরমন আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলো আমার। তিনটে বছর নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু পারীর মুখ দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। আরতোঁ আর স্বামীর মাঝখানে বসেছিলাম আমি। একে একে সব চিনিয়ে দিতে লাগলো—দ্য ইনভ্যালিডস্, দ্য ব্যাস্টিল, হোটেল দ্য ভিল, তুসেরিঁ এবং নতার ড্যাম। রাস্তায় অগনিত লোক, পারীর চোখে যেন ঘুম নেই। সেতু, ঝকঝকে নদী সবই তো চোখে পড়লো কিন্তু আমার যা স্বভাব—সব কিছু ছাপিয়ে গেলো অপেরা হাউসে ঢুকে।

কি করে ভুলি সেই প্রচণ্ড উত্তেজনা—লোকের ভিড়, গান নাচ। আমার সুখ। নাচতে পারার আনন্দে সব কিছুই ভুলে গেলাম। নাচিয়ের সংখ্যা তেমন ছিলো না। অনেকেই আমাকে নাচের সঙ্গিনী করতে চাইলেন কিন্তু আমার স্বামীর একান্ত অনিচ্ছা ওতে। ছদ্মবেশের আড়ালেও সেদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। সুতরাং নাচতে হলো তাঁর সঙ্গে, আরতোঁর সঙ্গে আর আমাদের দলের দু একজনের সঙ্গে, আমার রক্ষনাবেক্ষণের জন্যে লুই যাদের দলভূক্ত করেছিলেন।

সৌভাগ্য আমাদের, অপ্রীতিকর কিছু ঘটলো না। ভার্সাইতে যখন ফিরে এলাম, রাত তখন শেষ হতে চলেছে।

সকালের প্রার্থনাসভায় আমাদের শান্ত আর নিষ্পাপ চোখমুখ দেখে কে বুঝবে যে, সারারাত অদ্ভুত উন্মাদনায় কেটেছে আমাদের।

পারী প্রবেশের নির্দিষ্ট দিনটি এগিয়ে এলো। রাতের রহস্যময়তায় যে শহর সেদিন আমায় অমন নিবিড় আতিথ্য জানিয়েছে, দিনের আলোয় আবার তার মুখোমুখি হবার আগ্রহ আমার একটুও কম নয়।

পারী! প্রথম যৌবনে এর আপ্যায়নে ধন্য মনে করেছিলাম নিজেকে। তারপর আমার প্রতি এর অনীহা পরিত্যাগ থেকে ঘৃণায়

রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। তবু এর বিরাট বিস্তীর্ণ আকার আর গভীরতা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে।

দিনটা ছিলো চমৎকার। ওপরের নীল আকাশ আর চারিদিকের ঝকমকে রোদ্দুর যেন আমায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলো। ভার্সাই থেকে পারী পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ জুড়ে অসংখ্য মানুষ আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আমাকে দেখামাত্রই ওদের হর্ষধ্বনি আকাশ বাতাসকে মুখর করে তুলছে। পাশে বসে থাকা আমার স্বামী একটু সরে গেলেন, যাতে সবাই আমাকে দেখতে পায়।

'ওরা আমাদের দেখে হর্ষধ্বনি করছে।' স্বামীর দিকে তাকালাম, 'তার মানে ওরা আমাদের পচ্ছন্দ করে।'

'না। ওরা তোমাকেই স্বাগতঃ জানাচ্ছে।'

ভারি আনন্দ পেলাম। প্রশংসার আজীবন দাসী আমি। সাড়া দিলাম ওদের আহবানে। হাসিমুখে, মাথা হেলিয়ে বসে রইলাম। ওরা বলতে লাগলো ছবির মতো সুন্দরী আমি। 'যুবরানী দীর্ঘজীবি হউন।'

ঈর্ষায় প্রোভাঁস আর মারি জোসেফির মুখ কালো দেখাছে। আমার হাসি আরও বিস্তৃত হলো। শহরের দিকে যতই এগোতে লাগলাম, উত্তেজনায় ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছি। অনেক চোখ গাড়ির দিকে তাকিয়ে, ছুঁড়ে দেওয়া অনেক ফুল, পতাকার উত্তোলন। সর্বত্রই রাজভক্ত প্রজারা আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগলো।

নগরের প্রবেশদ্বারে রাজ্যপাল মঁসিয়ে দ্য ব্রিসাক রূপোর থালার ওপর নগরের চাবি নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আমার হাতে তা তিনি তুলে দিলেন। তারপর দ্য ইনভ্যালিডস্, হোটেল দ্য ভিল এবং ব্যাস্টিল থেকে পরপর তোপধ্বনি উঠতে লাগলো। জনতার উল্লসিত চিৎকার কানে আসতে লাগলো। 'দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়, তাই না?' 'কত ছোট অথচ কী সুন্দর!' 'পরীর মতো রূপের বাহার।'

আদরের মানুষগুলো। ওরা আমার একান্ত আপনজন। আবেগের উচ্ছলতায় ওদের দিকে হাত তুলে নিজের হাতেই চুমু খেলাম। ওরাও

আনন্দের সঙ্গে সায় দিলো।

কি জমজমাট শোভাযাত্রা। রাজার নিজস্ব রক্ষীরা আমাদের চালিত করছে, পেছনে আমাদের পরিচারকদের নিয়ে আরও তিনটে শকট। আমার হাতে চাবি তুলে দেবার পর আমরা নতার ড্যাম-এর দিকে যাত্রা করলাম। ওখানে প্রার্থনা সভায় যোগ দিলাম। তারপর গেলাম লুই লে গ্রাঁ-এর কলেজে। প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সহকারী ওখানে আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।

ওঁদের সম্বর্ধনা শেষ হবার পর আরও এগিয়ে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা এটা। সত্যিই সুখী আমি। সবকিছু মনোমত ঘটে যাচ্ছে। এলাম তুলেরিঁতে। এখানে হবে দুপুরের খাওয়া। এতবড় বাগানটা মানুষের ভিড়ে যেন উপচে পড়ছে। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে ওরা চিৎকার করে-উঠলো।

'আপনাকে ওরা দেখবে, তবে থামবে।' ব্রিসাক বললেন।

'হ্যাঁ, আমিও পারীর জনগণকে নিরাশ করতে পারবো না।

সবাই ব্যালকনিতে গেলাম। আমাকে দেখা মাত্রই বাগানের লোকেরা হর্ষধ্বনি করতে লাগলো, আমার দীর্ঘজীবন কামনা করলো।

হাত নেড়ে ওদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম। এমন অপূর্ব, অবর্ণনীয় দৃশ্যের-সম্মুখীন হওয়া এই প্রথম আমার।

'মাদাম, আশা করি মাননীয় যুবরাজ রাগ করবেন না, ওখানে দুলক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছে যাদের প্রত্যেকে আপনার প্রেমে পড়ে গেছে।' ব্রিসাক মাথা নত করে একান্ত বিনয়ে মন্তব্য করলেন।

পারী আর আমার মধ্যে সেদিন হৃদয়ের বিনিময় ঘটে গেলো একান্ত অন্তরঙ্গতায়।

যেন স্বপ্নের ঘোরে ভার্সাই ফিরে এলাম। এখনও যেন কানে বেজে চলেছে সেই খুশি আর প্রশংসার তূর্যধ্বনি।

রাজা এসে জানতে চাইলেন ওখানে কেমন কাটলো আমার। বুঝতে পেরেছিলাম, সত্যি কথাটা বললে উনি ক্ষুণ্ণ হবেন কারণ এই অভ্যর্থনার নিগূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে। আমাকে আর আমার স্বামীকে

যারা অভ্যর্থনা জানিয়েছে, রাজাকে নিশ্চয়ই তা জানাবে না। ওঁর তিরোধানের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। একদিনের 'অতিপ্রিয়' লুই আজ ওদের কাছে 'ঘৃণ্য' লুই। এমন নির্মম মনোভাবকেও তিনি কেমন করে যে তুচ্ছ জ্ঞান করেন!

'শুনছি তুমি জয়ী হয়ে ফিরেছো।' আমার হাত টেনে নিয়ে চুমু দিয়ে বললেন উনি।

'মহামান্য রাজা কি খুশি হয়েছেন?'

'তোমাকে ভালবাসতে পারার মতো রুচির অভাব ওদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলে আমি ওদের প্রজা বলে অস্বীকার করতাম।'

কি করে যে বিশ্বাস করি এই ফরাসীদের! ঠাণ্ডা অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাকে মিষ্টি কথার আস্তরণে ঢেকে রাখতে কি অদ্ভুত নৈপুণ্য এদের।

পারী প্রবেশের কয়েকমাস পরে আরতোঁর বিয়ে হলো মারি জোসেফির বোনের সঙ্গে। ওদের বাবা, সার্ভিনিয়ার। রাজা চেয়েছিলেন, যেন ওঁর একটি মেয়ে ফ্রান্সের যুবরানী হয়। সেইজন্যেই দুই বোন আমাকে অপছন্দ করতো।

আরতোঁর বউ মারি থেরেসি ওর বোনের থেকেও কুৎসিত। এতে আরতোঁর অবশ্য তেমন ভাবান্তর দেখা গেলো না। বিয়েটা যেন ওর কাছে কোন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মারি থেরেসি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালবাসে, আরতোঁও তাতে উৎসাহ দিচ্ছিলো। বউয়ের থেকে অনেক বেশি সুন্দরী একজন রক্ষিতা ছিলো ওর। আবার পরিবারের সবার নজর আরতোঁর দিকে, বেচারী বউ কারও যেন নজরেই পড়ছে না। আমি ওকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়েও হালে পানি পেলাম না, আমার বন্ধুত্বের আহ্বানকে মারি থেরেসি পাশ কাটিয়ে গেলো। আহত হবার মতো মানসিকতা তখন আমার নেই, আমি খুব হেসে খেলে বেড়াচ্ছি তখন। বন্ধু হিসেবে পেয়েছি মাদাম দ্য লঁব্যালকে, তার সঙ্গেই অনেকখানি সময় কেটে যাচ্ছে।

তখন প্রচণ্ড শীতে বরফ পড়া সুরু হয়েছে। একদিন ভার্সাইয়ের খোঁয়াড়ে একটা শ্লেজগাড়ি চোখে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েনার স্মৃতি ভেসে উঠলো আমার মানসপটে। ছেলেবেলায় এই শ্লেজগাড়ি নিয়ে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। তখনই হুকুম দিলাম গাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ওতে ঘোড়া জুড়তে। মাদাম লঁব্যালকে সঙ্গে নিয়ে পারীর দিকেই রওনা হলাম। রাস্তায় কিন্তু আমাদেরটাই একমাত্র শ্লেজ, তাই লোকজন দেখতে লাগলো আমায়। ওদের কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, শীতে ধুকছে। পরণে গরম জামাকাপড় নেই, অথচ আমরা দামী ফারে সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে আছি। তুলনা করলেই কষ্ট পাবো ভেবে ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

চোখেমুখে কাঠিন্য ফুটিয়ে মার্সি দেখা করতে এলেন। জানালেন আমার এই নতুন অভিযান পারীর মানুষকে খুশি করতে পারেনি।

এদিকে আরতোঁর বিয়ে হবার পর পরিবারের মধ্যে একটা মানসিক টানা-পড়েন লেগেই ছিলো। দুই বোন মিলে আমার প্রতি ওদের অনীহা প্রকাশ করছিলো, দুই দেওরের উচ্চাকাঙ্খাও যেন দিন দিন বাড়ছিলো : এর প্রকাশ আমার স্বামীর প্রতি ওদের বিরূপ মনোভাবে। আমরা ছজন প্রায়ই একসঙ্গে থাকতাম। এটাই শিষ্টাচার। একদিন প্রোভাঁসের ঘরে জমায়েত হয়েছি আমরা। আমার স্বামী দাঁড়িয়েছেন চুল্লীর পাশটাতে। ওখানেই তাকের ওপর একটা দামী চীনেমাটির ফুলদানি ছিলো। প্রোভাঁসের আবার ওসব জিনিসের ওপর ভারি আকর্ষণ। এই বিশেষ ফুলদানিটার ওপর আমার স্বামীরও খানিকটা দুর্বলতা ছিলো। জিনিসটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি। প্রোভাঁসের মুখে কিন্তু হাসি ছিলো না। বারবার লুইকে সাবধান করে দিচ্ছিলো যেন ফুলদানিটা হাত থেকে ফেলে না দেয়।

কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই ঘটলো। স্বামীর হাত থেকে ফসকে গেলো ফুলদানিটা, মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো। প্রোভাঁসও বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো লুইয়ের ওপর, মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। প্রোভাঁস ওঁর গলা টিপে ধরলো। ওরা দুই বোন দূরে দাঁড়িয়ে থেকে

দৃশ্যটা দেখছিলো। আমি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারছিলাম না। ছুটে গিয়ে আমার স্বামীর কোট ধরে টানাটানি করছিলাম। 'ছাড়ো, ছাড়ো, করছো কি তোমরা?' ইতিমধ্যে আমার স্বামী এক ঝটকায় প্রোভাঁসের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। ওদের ধাক্কাধাক্কিতে আমার হাতে আঁচড় লেগে রক্ত বেরিয়ে এসেছিলো। আমার রক্ত দেখে লুই চিৎকার করে উঠলেন। 'ছাড়ো, আঁতোয়ানেৎ আহত!' প্রোভাঁসও তখন লজ্জিত হয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। 'তোমার বেশি লাগেনি তো?' লুইয়ের কণ্ঠে ব্যাকুলতা। 'না, তবে ব্যাপারটা কি খুব বিশ্রী হয়ে উঠলো না?' স্বামী ক্ষমা চাইলেন অন্যমনস্কতার জন্যে, প্রোভাঁসও তার ক্রোধের জন্যে। আমার জায়েরা কিন্তু মন্তব্য করলো ব্যাপারটা সামান্যই—সবার নজর কাড়বার জন্যেই ওর মধ্যে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি। হায়, এমন অদ্ভুত মানিসকতাপূর্ণ মেয়েদের ভালবাসি কি করে!

রাজা জানতেন যে আমি থিয়েটার ভালবাসি, তাই আদেশ দিয়েছিলেন প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে মিলনান্তক নাটকের অভিনয় হবে। এতে খুশি হলেও আমার কাম্য ছিলো থিয়েটারে অংশ নেবার। তাই সবাইকে জানালাম যে, আমরা নিজেরাই তো একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে পারি। 'কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে ওটা বাতিল করার হুকুম হবে।' প্রোভাঁস বললো। 'তাহলে জানাজানি হবে না।' আমি বললাম।

কয়েকটা একাঙ্ক নাটিকা বেছে নিলাম। মলিয়েরের একটা নাটিকা পছন্দ হলো। প্রোভাঁস খুব ভালো অভিনয় করতে পারে। আরতোঁও অভিনয় ভালবাসে। এমন কি আমার জায়েদেরও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক দেখা গেলো। কখনও কখনও রাজকুমারী ক্লথিলডে এবং এলিসাবেথকেও অভিনয় করতে দিতাম। সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম ওদের যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিশেষকরে ছোট্ট এলিসাবেথ কেমন করে যেন আমার মন কেড়ে নিচ্ছিলো।

এই গোপন ব্যাপারে আমার স্বামীরও একটা ভূমিকা ছিলো। সেটা অবশ্যই দর্শকের। তিনি বসে বসে অভিনয় দেখতেন, ঘুমিয়েও পড়তেন মাঝে মাঝে। অবশ্য লক্ষ্য করেছি আমার অভিনয়ের মুহূর্তে

তিনি জেগেই থাকতেন।

অভিনয়ের ব্যাপারে ধীরে ধীরে এতই মগ্ন হয়ে গেলাম যে, আমার সেক্রেটারি এবং লাইব্রেরিয়ান মঁসিয়ে কঁপাকে অনুরোধ জানালাম উনি যেন আমাদের জন্যে অভিনয়ের উপযুক্ত পোশাক মনোনীত করে দেন। এতে ওঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিলো। তাঁর ছেলেও পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এটা চলতে লাগলো এবং এর মাধ্যমেই আমাদের তুজনের অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেলো। এমনকি আমরা একসঙ্গেই খেতে লাগলাম।

নেহাত সময় কাটানোর জন্যেই এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। আবার শহরে গিয়ে বলনাচে অংশ নেবার ব্যবস্থাও করছিলাম। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে জোর করতাম কিন্তু জায়েরা ভালো নাচতে পারে না বলে যেতে চাইতো না। পারীবাসীরা আমাকে পছন্দ করে—এই ভেবে মনে মনে অহঙ্কারও খানিকটা ছিলো আমার। অথচ ওদের সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা প্রায় পাহাড় প্রমাণ। আর একটু বুদ্ধি যদি তখন আমার ঘটে থাকতো, বুঝতে পারতাম সেই ক্রান্তি কালের মধ্য দিয়ে পারীর জীবনযাত্রা বয়ে চলেছে, যা আগামী বারো বছরেরও কম সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে বাস্তবের সম্মুখীন হবে।

কিচ্ছু জানতাম না পারী সম্পর্কে। হাজারো মানুষের তুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কোন ছবিই আমার মানসিকতাকে স্পর্শ করেনি। চিনতাম শুধু অপেরা হাউসের জাঁকজমক, বলনাচের উদ্দামতায় রক্তের উচ্ছলতা। মাদাম কঁপা তাই তুঃখিত গলায় জানাতেন, মঁসিয়ে ভেরমঁ জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে আমাকে একান্ত অন্ধকারেই রেখে দিয়েছেন। কর্মক্লান্ত পারীকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে অনেক কিছুই শিখতে পারতাম আমি। যে দারিদ্র্য জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের মতো বিলাস-বাহুল্যে লালিত কিছু মানুষের কী বিরাট পার্থক্য। আমরা যখন রাজপ্রাসাদের ঝকঝকে কক্ষে বসে মুক্তি, সমতা, আর বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় মত্ত, পারী তখন আগামী দিনের এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্যে ভেতরে

ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছে।

ভার্সাই থেকে গাড়িতে পারী যাবার পথে বের হলেই আমার শিরাধমনীতে রক্ত উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠতো। কাদের দেখতে পাবো ওখানে! দামি গাড়ির ভিড়, বাহারী পোশাকের ঘোড় সওয়ার, যাদের আগেপিছে ঝলমলে পোশাকের পরিচারকদের দৌড়োদৌড়ি। আর শহরে প্রবেশ করতেই যেন আনন্দ আমার। রাতের আলো আঁধারিতে সেই উত্তেজনার যেন সীমা পরিসীমা থাকতো না।

নববর্ষের সূচনাতেই উৎসবের সময় এলো। এই সময়েই চলতে থাকে মুখোশনৃত্য, অভিনয়, বলনাচ আর ব্যালে। প্রত্যেকটি রাত এসবের মধ্যে মগ্ন থাকতে পারলেই যেন খুশি হতাম। নাচের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণের জন্যেই বুঝি সেবার এত বেশি বলনাচের আসর বসছিলো। প্রায়ই ছদ্মবেশে যেতাম আমরা। আলখাল্লা গোছের পোশাক পরতাম। নিজের পরিচয় গোপন রাখা শুধু নয়, এমন কোথাও যেতাম না যেখানে আমার স্বামী অথবা দেওররা সঙ্গে নেই। সেটা শুধু বারণ ছিলো না, এমন কি আমার মোটা বুদ্ধিতেও বুঝতাম যে ব্যাপারটা কত বিপজ্জনক।

৩০শে জানুয়ারীর সেই সন্ধ্যার কথা জীবনে বিস্মৃত হবার উপায় নেই আমার। সেদিন সঙ্গে ছিলেন দেওর-জায়েরা, রাজসভার কিছু বিশিষ্ট নরনারী। স্বামী সেদিন আসতে চাননি, আমিও জোর করিনি। কালো সিল্কের আলখাল্লা পরেছিলাম, বলরুমে প্রবেশের আগে কালো ভেলভেটের মুখোশও যথারীতি আটকে নিয়েছিলাম। নাচের সঙ্গী ছিলো আরতোঁ। ওর সঙ্গেই নাচতে চাইতাম কারণ নাচে ওর চমৎকার দক্ষতা ছিলো। লক্ষ্য করছিলাম অনেকের চোখ রয়েছে আমার ওপর যদিও তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিলো না। নিজের প্রথামতই নাচছিলাম সেই উজ্জ্বল আলোর নীচে, গানের তালে তালে, সিল্কের মৃদু খসখসানির মধ্যে, পোমেড ও পাউডারের মিষ্টি গন্ধবহুল পরিবেশে। দেখছিলাম আমাকে লক্ষ্য করছেন একজন তরুণ। মুখে তাঁর মুখোশ নেই, বিদেশী বলে চিনতে ভুল হয় না। অন্যদের থেকে এমন আলাদা

বলেই তাঁর দিকে আমার চোখ পড়েছিলো। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথায় সুন্দর চুল, ঘন কালো দুটি চোখ। গায়ের রঙ সুন্দর, একটু যেন ম্লানিমার ছোঁয়াচ ওতে। মুখে একই সঙ্গে অনেক ভাবের খেলা চলছে। কখনও তাঁর হাসি মেয়েদের মতো মনমাতানো আবার মুহূর্তের মধ্যেই তার ওপর নেমে আসছে চিন্তাশীল মানুষের গভীর ব্যক্তিত্ব।

হঠাৎ যেন মনে হলো ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওঁর গলার স্বর শুনতে চাই। কেন, জানিনে। এটা তো মুখোশনৃত্য। ওঁকে আমার পরিচয় জানিয়ে লাভ কি ? এখন তো উৎসবের সময়, শিষ্টাচারের প্রশ্ন ওঠে না, কথা বললে তো কোন প্রশ্ন উঠবে না কোন তরফ থেকে।

নাচের শেষে নিজেদের দলে এসে ভিড়লাম। দেখি একটু দূরেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। অন্যদের বললাম, 'একটুখানির জন্যে মজা করতে চাই।' অপরিচিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মুখে আমার প্রশান্ত হাসি, বললাম, 'এই নাচের আসর খুবই আনন্দকর।' বলতে গিয়ে হাত উঠিয়ে দেখতে গেলাম মুখোশটি ঠিক জায়গায় রয়েছে কিনা। ভুল করলাম। আমার সাজ-সজ্জায় দামী হীরের ছড়াছড়ি। 'আমারও খুব ভালো লাগছে।' উনি উত্তর দিলেন। 'আপনি তো ফরাসী নন!' 'আমি সুইডিশ মাদাম, নাকি—মাদমোয়াজেল বলবো।' হাসলাম। কার সঙ্গে কথা বলছেন জানতে পারলে ভদ্রলোক কি করবেন তা ভেবে।

প্রোভাঁস এগিয়ে আসতে লাগলো। ভদ্রলোকের চোখ দেখেই ওঁর অস্বস্তি বুঝতে পারলাম। প্রোভাঁসের হাবভাবে আভিজাত্যের কমতি নেই। মুখোশ পরে বলনাচে এলেও প্রোভাঁস এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না যে, সে যুবরাজের সহোদর। অপরিচিত ভদ্রলোক সম্পর্কে আরও কিছু জানার ছিলো আমার, কিন্তু প্রোভাঁসের উপস্থিতিতে সতর্ক হয়ে উঠলাম।

'অনুমতি দিলে বলতাম, মাদামের সৌন্দর্যের তুলনা নেই।' ভদ্রলোক বললেন।

'আপনার যদি তাই মনে হয়, বলুন না।' বললাম।

'তাহলে আবারও বলি, আপনি রূপবতী।'

'এখানে কি করেন আপনি?'

'পারীর সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে তুলছি।'

'এই অপেরা বলের আসরে?' হাসলাম। 'ভ্রমণ বিলাসে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন দেখছি।'

'সত্যিই তাই, মাদাম।'

'ফ্রান্সে আসার আগে কোথায় ছিলেন?'

'সুইজারল্যাণ্ডে, ইতালিতে।'

'আবার ফিরে যাবেন সুইডেনে। ভাবতে পারছি নে কোন্ দেশটি সবচেয়ে ভালো লাগছে আপনার। অস্ট্রিয়ায় যাবেন না? ভিয়েনা আপনার কেমন লাগবে কে জানে!' কেমন অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। পরমুহূর্তেই প্রশ্ন করে বসলাম। 'কি নাম আপনার?'

'আক্সেল দ্য ফের্সেন।'

'মসিয়েঁ···প্রিন্স···কঁৎ—কি বলবো?'

'কঁৎ।' ভদ্রলোক বললেন।

'কঁৎ আক্সেল দ্য ফের্সেন।' আমার কণ্ঠে পুনরুক্তি। হৃদ স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিলো।

'আমার মায়ের বংশ ফ্রান্স থেকে উদ্ভূত।'

'তাই আপনার চেহারায় ফরাসী ছাপ রয়েছে। আপনার গৌর বর্ণ বাবার কাছ থেকে পাওয়া, শ্যামের ছোপ মায়ের কাছ থেকে।'

'মাদামের দেখার চোখ আছে।' আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলেন তিনি। ভাবলাম ওঁর নাচের সঙ্গিনী হতে বলবেন। কিন্তু আমার সে সাহস নেই। প্রোভাঁস তো মুখিয়ে আছে কথাবার্তায় ইতি টানার জন্যে। আরতোঁর চোখও এদিকে।

'মাদাম তো অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করলেন। সাধ্যমতো জবাবও দিয়েছি। বিনিময়ে কিছু জানতে পারি কি?'

প্রোভাঁসের চোখে ভ্রুকুটি। না ভেবেচিন্তে কাজ করেছি আমি। হাত তুলে মুখোশটা একটু সরালাম।

'যুবরানী!'

অস্বস্তি চাপতে গিয়ে হাসলাম, চোখ রাখলাম আক্সেল ভ্য ফের্সেনের মুখের ওপর। দেখতে চাই যে, অপরিচিতা কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলায় নেমে যখন জানতে পারলেন ভদ্রমহিলা ফ্রান্সের রানী, তখন তাঁর মুখের অবস্থা কেমন হয়। দ্বিধা করলেন না তিনি। প্রশংসনীয় ধীরতা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করলেন—মাথা নীচু করে অভিবাদন করলেন। ওঁর চকচকে চুল জামার কলার স্পর্শ করলো। সূর্যালোকের মতো সুন্দর চুল। তাঁর চোখে আমার চুলও তাই সুন্দর হয়ে উঠবে।

লোকেরা আমার চারদিকে ঘন হয়ে আসছে। আমার দিকে অবিশ্বাস্যভাবে তাকাচ্ছে। অনেকেই হয়তো আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, কিন্তু মুখোশের আড়ালে চিনে উঠতে পারেননি। কিন্তু তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জনাকীর্ণ নাচের আসরে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করলাম।

প্রোভাঁস এগিয়ে এসে রাজকীয় মর্যাদায় হাত বাড়ালো। সেই হাতের মধ্যে নিজের হাত গলিয়ে দিলাম। আরতোঁ আর দলের অন্যেরা আমাদের যাবার জন্যে জনতাকে পথ ছাড়ার ইঙ্গিত করলো। সরাসরি গাড়িতে উঠে বসলাম।

মুখে কেউ কিছু না বললেও ওঁদের মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ওঁদের মতে আমার বিয়ে তো আসলে বিয়ে নয়, পুরুষ সঙ্গর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি। আমার যৌনজীবনের শুরুই হয়ে ওঠেনি আজ পর্যন্ত। যুবরানীর পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থা, যাঁর সন্তান হবেন ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনের অধিকারী। প্রোভাঁসের চোখ তাই সদাসতর্ক। আমার যদি কোন প্রেমিক জোটে, কি হবে? কি হবে তার ঔরসে আমার গর্ভের সন্তানকে আমার স্বামীর বলে যদি চালিয়ে দিই? একটা জারজ সন্তান ফ্রান্সের সিংহাসন কেড়ে নেবে। আরতোঁ অন্য কথা ভাবছে। প্রেমিক চাই আমার? তাহলে তো হাতের কাছে ওই আছে, যাকে আমি বরাবরই পছন্দ করি।

আর ওদের বউদের চোখে ক্রোধের কুঞ্চন। ওরা তো স্বামীদের চেনে

ভালো করেই।

আর আমি। অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রত্যেকটি কথা মনের পাল্লায় ওজন করছিলাম। কানে যেন বাজছে এখনও তাঁর কথার রেশ। কালো কোটের সঙ্গে স্পর্শরত তাঁর সেই সোনালী চুল। তাঁকে আর কখনও দেখতে পাবো কিনা জানিনে কিন্তু তাঁর ছবি মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকবে দীর্ঘদিন। তিনিও আমাকে ভুলবেন না জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

আপাতত এটাই যথেষ্ট আমার কাছে।

॥ পাঁচ ॥

আমার প্রতি আমার স্বামীর অনুরাগ যেমন দিন দিন বাড়ছিলো, আমিও তেমনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলাম। মাকে লিখেছিলাম, যদি তিন রাজপুত্রের মধ্যে কাউকে বাছাই করে নেবার সুযোগ আমার থাকতো, নিঃসন্দেহে লুইয়ের গলাতেই মালা পরাতাম আমি। ওঁর মধ্যে সদ্‌গুণের কমতি ছিলো না, যার অভাব আমার দেওরদের মধ্যে আমি আবিষ্কার করছিলাম। তিনি প্রোভাঁসের মতোই বুদ্ধিমান, অথচ তার কোন প্রকাশ ছিলো না। আরতোঁর মধ্যে গভীরতার কোন বাষ্পও ছিলো না। ওর চাপল্যকে ক্ষমা করা হয়তো বা সম্ভব ছিলো কিন্তু ওর দুষ্টুবুদ্ধি ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে হতো আমার।

মার্সি অবশ্যই দুই দেওর সম্পর্কে বারে বারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু আনন্দের হাটে বিচরণ করার নেশায় সে সবে কান দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

অথচ গভীরতা এবং অন্যের প্রতি মমত্ববোধের অভাব ছিলো না আমার মধ্যে। তবে সে সম্পর্কে অবহিত হতে সময় লাগতো আমার। তার ওপর রয়েছে এই অভিজাত সমাজের অদ্ভুত শিষ্টাচারবোধ। আমার কাজে তো মাঝে মাঝে মাদাম নোয়ালের অস্বস্তির সীমা

পরিসীমা থাকতো না।

একদিনের ঘটনা বলি। সবার সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলাম। আমার তো ঘোড়ায় চড়া বারণ, তাই ঢাকনা দেওয়া গাড়িতে যাচ্ছিলাম। ওরা একটা সিংওয়ালা হরিণকে তখন তাড়া করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন চাষী ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলো। সে হরিণটার মুখোমুখি পড়ে গেলো। পলায়মান হরিণটা এমন আচমকা গুঁতিয়ে দিলো ওকে যে, বেচারা ভীষণভাবে আহত হয়ে রাস্তার পাশেই পড়ে গোঙাতে লাগলো। শিকারীরা হরিণের পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে গেলো। আমি গাড়ি থামিয়ে ওখানে নেমে পড়লাম। দেখি ওর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পাশে ওর ছেলেমেয়েরা কান্না জুড়েছে।

চাকরদের সাহায্যে ওকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম। ওর ক্ষতস্থানে নিজেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। বললাম যে আমি ফিরে গিয়েই একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি কে জানতে পেরে ওর স্ত্রী তো আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার পর ওঁকে পুরো ঘটনাটি জানালাম। 'আমি সুখী যে তুমি আমার মতোই ভাবতে শিখেছো।' উনি গভীরগলায় বললেন। 'রাজা হলে আমি সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই নজর দেবো। আমার পূর্বপুরুষ হেনরি কোয়াত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই আমি।' 'তোমার পাশেই থাকছি আমি।' অন্তরঙ্গ গলায় বললাম। 'বলনাচ, নাট্যাভিনয়—এসবতো শুধুই অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি।' আমি চুপ। ভাবছিলাম সততার সঙ্গে আনন্দ স্ফূর্তি মেশালে ক্ষতি কি!

চোখের সামনে কাউকে যন্ত্রণা পেতে দেখলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। হোক না সে নীচু শ্রেণীর, চাকরবাকরদের কেউ। মাদাম নোয়ালে অবশ্যই বলতেন যে, চাকরবাকরদের সেবা করা রানীর-পক্ষে শিষ্টাচারসম্মত নয়। আমি গ্রাহ্য করিনি।

এসব ঘটনা অনেকখানি অতিরঞ্জিত হয়ে জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিলো। তাই জনসমক্ষে উপস্থিত হলেই ওরা আন্তরিকভাবেই আমার প্রতি সম্বর্ধনা জানাতো। আমি সুন্দরী আর তরুণী শুধু নই,

চরিত্রের চাপল্য সত্ত্বেও আমার সহানুভূতির মধ্যে কার্পণ্য নেই। আমার স্বামীও মহৎ মনের মানুষ। ভাবতাম দুজনে মিলে ফরাসীদেশের সুদিন ফিরিয়ে আনবো আমরা। ওদের শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে ওই বদমাশ রাজার মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর সুরু হবে নতুন যুগ।

স্বামী সম্পর্কে ওদের নামকরণ করা ছিলো—'আকাঙ্খার লুই।' ওতে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারিনি। মহান রাজা ও রানীর ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। তবু এসবের মধ্যেও উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি সম্পর্কে সচেতন ছিলাম আমরা। নিশ্চিত জানি, নিজের যৌন সক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনতে অস্ত্রোপচারের কথা ভাবছিলেন লুই। কিন্তু ওতে সাফল্য আসবে কি? যদি না আসে।...

আমাদের মধ্যে যা পরীক্ষানিরীক্ষা হতো তার কথা বলতেও লজ্জা করে। দায়িত্ববোধ পীড়িত করছিলো লুইকে, নিজের অক্ষমতা সম্পর্কেও সমানভাবে সচেতন ছিলেন। লক্ষ্য করেছি যে, নিজের কারখানায় এমন অমানুষিক পরিশ্রম করতেন যাতে বিছানায় এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারেন।

আমি তো ভালো থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু পরিবেশ শুধু যে আমাদের প্রতিকূলে তাই নয়, শত্রুর দ্বারাও পরিবেষ্টিত ছিলাম সব সময়। কেউ না কেউ আমার প্রতি বিরূপতা পোষণ করছে—এমন তথ্যে অবাক হবার কিছু ছিলো না। অসতর্ক কোন কথাবার্তা বললেই তা নিয়ে হৈচৈ বেঁধে গেছে। পিসিদের চোখে বিদ্বেষ। মাদাম দু বারির ব্যাপারে সেই যে আদেলেদ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এখনও রাগ পড়েনি তাঁর। ওদিকে দু বারির সঙ্গেও আমার কোন বোঝাপড়া নেই। আমার আচরণ ওঁকে শুধু ব্যথিত করে তোলেনি, আমাকে অবজ্ঞা করার মনোভাবেরও জন্ম দিয়েছে। অবশ্য তাঁর সময়ও ভালো যাচ্ছিলো না। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চারদিকে নানা গুজব ছড়াচ্ছিলো।

আমি অবশ্যই নাচগানের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। প্রায় সবকটা বলনাচের আসরে হাজিরা দিয়েছি। সেই আশ্চর্য মানুষটাকে খুঁজে বেড়িয়েছি ভিড়ের মধ্যে। প্রথম আলাপেই আমার মনকে আলোড়িত

করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু আর দেখা মেলেনি তাঁর।

ওদিকে ক্লথিলডে আর এলিসাবেথের গৃহ শিক্ষিকা কঁতেস দ্য মারসাঁ যিনি লুইয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আমার আরেক শত্রু দু দ্য ভগুয়োঁর বান্ধবী, আমার সঙ্গে শত্রুতা সুরু করেছেন। দরজায় আড়ি পেতে আমাদের কথাবার্তা শোনার মুহূর্তে ভগুয়োঁকে হাতে নাতে ধরে ফেলার পর থেকেই আমার প্রতি তাঁর বিদ্বেষের অন্ত নেই। টুকিটাকি ব্যাপারে এসব মানুষেরা আমার নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। সুযোগ পেলে আমিও যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতাম।

কিন্তু হাওয়ায় তখন বিবর্তনের গন্ধ ভাসছিলো।

মলিয়েরের নাটকের মহড়া দিচ্ছিলাম তখন। দেওর জায়েদের নিয়ে অভিনয়ের মাতামাতি করছি। আমার স্বামীও এতে উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন। দর্শকের ভূমিকায় বেশ মানিয়েছিলো ওঁকে। অবশ্যই আরও সতর্ক হতে হয়েছিলো আমাদের। জানি মাদাম দ্য মারসাঁ আমাদের বিরূপ সমালোচনায় রত, পিসিরা তাকিয়ে রয়েছেন কোথায় ভুলে পা দিয়ে ফেলছি আমি, মাদাম নোয়ালের ধূর্ত দুচোখ আমার অশিষ্টাচারের নমুনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে আমরা গোপনে অভিনয় চালাচ্ছি, এমন সোরগোল উঠবে যে, সমস্ত কিছুই রাতিল করার আদেশ হবে। গোপন বলেই এতে যেন অন্য একধরনের তীব্র নেশার আমেজ রয়েছে।

কিন্তু এমনই একটা ঘটনা ঘটে গেলো যাতে আমাদের গোপন অভিনয় বন্ধ করে দিতে হলো। থিয়েটার করার জন্যে যে ঘরটি বেছে নেওয়া হয়েছিলো, সেটা ছিলো অব্যবহৃত। শুধু সেঘর থেকে আমার ঘরে যাবার জন্যে একটা একান্ত ব্যবহার্য সিঁড়ি ছিলো। অভিনয়ের দিন সন্ধ্যায় যার যা পোশাক পরে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম। মঁসিয়ে কঁপাঁ পরেছিলেন এক বৃদ্ধের পোশাক। হঠাৎ আমার মনে পড়লো আমার ঘরে একপ্রস্থ পোশাক ফেলে এসেছি, যা পরের দৃশ্যে দরকার হবে। মঁসিয়ে কঁপাঁকে অনুরোধ জানালাম তিনি যেন নীচে গিয়ে সেই পোশাক নিয়ে আসেন। ভাবতেও পারিনি যে সেই মুহূর্তে আমার

ঘরে কেউ থাকতে পারে। কিন্তু একজন চাকর কি যেন করছিলো ওখানে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে, কে আসছে দেখার জন্যে এগিয়ে এসে লোকটার নজরে পড়লো আধো অন্ধকারে সেই বিদ্‌ঘুটে পোশাক পরা মঁসিয়ে কঁপাঁর দিকে। আর যায় কোথা! ভূত মনে করে লোকটা আর্তচিৎকার করে একেবারে বেঁহুস। সেই চিৎকারে আমরা সবাই নেমে এলাম। অনেক কষ্টে লোকটার মূর্ছা ভাঙানো গেলো। লোকটা আমাদের নাটক অভিনয়ের কথা কাউকে বলবে না প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও মঁসিয়ে কঁপাঁ বললেন যে, আমাদের উচিত অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া। আমার স্বামীও তাতে সায় দিলেন। সুতরাং অভিনয় পর্বের ইতি ঘটলো সেখানেই।

আনন্দের খোঁজে তাই আমাকে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে হলো। আমার প্রাক্তন গানের শিক্ষক গ্লুক তখন পারীতে এসেছেন। তিনি সঙ্গে এনেছেন জার্মান গীতিনাট্যের একটি ছোট দল। মা আমাকে লিখেছেন যে গ্লুক যাতে পারীতে সফল হন, আমি যেন তার চেষ্টা করি। ভারি খুশি হলাম আমি। কিন্তু পারী অ্যাক্যাড্যামি ওঁর নাটক 'ইফিজেনিয়া' অভিনয়ের অযোগ্য বলে রায় দিলেও মার্সির একান্ত চেষ্টায় ওঁরা মত পালটালেন এবং গ্লুকের জন্যে অভিনয় রজনী স্থিরীকৃত হলো। আমি তাঁকে প্রায় রাজকীয় মর্যাদা দিলাম। অভিনয় রজনীতে আমার স্বামী, প্রোভাঁস ও তার স্ত্রী আর অন্যান্য কয়েকজন ক্ষমতাশীল লোককে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। এদের মধ্যে রাজকুমারী লঁব্যালও ছিলেন। সুন্দরভাবে উতরে গেলো অভিনয়। অনুষ্ঠানের শেষে মার্সি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'সম্রাজ্ঞীর স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। রাজা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দেখেছো তো গত কয়েক সপ্তাহে তাঁর স্বাস্থ্য কেমন ভেঙে পড়েছে।' 'একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' আমি বলি। 'যদি এমন ঘটে যায়,' একান্ত গোপন ভঙ্গিতে মার্সি বলতে লাগলেন, 'যে শিগগির রাজকুমারের ডাক পড়ে রাজ্য চালানোর জন্যে, ওঁর একার পক্ষে সেটা করা দুঃসাধ্য। তুমি যদি ওঁকে পরিচালনা না করো, সে কাজ অন্যেরা নিজেদের হাতে তুলে নেবে। এ সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ অবহিত থাকা উচিত।'

'আমি! আমি তো সরকারী ব্যাপারের কিছু বুঝি না।'

'সত্যি কথাই। ওতে নাক গলাতে ভয় পাও। তুমি সামনে এগিয়ে আসতে চাও না।'

'আমাকে যে কি করতে হবে, তাই আমার জানা নেই।'

'পরামর্শ দেবার লোক রয়েছে। কি করতে হবে তাই জানা উচিত তোমার এবং নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে হবে তোমাকে।'

সারা দেশে রটে গেলো যে রাজার অন্তিমকাল উপস্থিত হতে চলেছে। জনগণের অন্তরে রাজার জন্যে কোন শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিলো না। আমি জানতাম, অবিশ্বাস ও যৌন অনাচার—যার মধ্যেই লিপ্ত থাকুন না কেন, নিজের অন্তরে অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। নরকে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো। ফরাসী রাজাদের মধ্যেও তাঁর মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কেউ করেন নি। তাই তিনি ভাবতেন মৃত্যুর আগে সব পাপের জন্যে স্বীকারোক্তি না করলে তাঁর নরকবাস অবধারিত। অস্বস্তি বোধ করছিলেন এজন্যেই। প্রায়শ্চিত্ত করতে চান কিন্তু এতটা জলদি নয়। এই বৃদ্ধ বয়সে মাদাম দু বারিই তাঁর একমাত্র ভরসা।

হাওয়ায় মৃত্যুর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর্দার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেই হাসিখুশি মানুষটা আর নেই। সারামুখে চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। তাস খেলার আসরে তো হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

বোঝার ওপরে আবার শাকের আঁটি। ভাগ্য যেন ওঁকে নিয়ে উপহাস করছে। অ্যাবেই দ্য লা ভিলেকে তিনি সম্প্রতি উঁচু পদে বহাল করেছিলেন। মঁসিয়ে ভিলে এসেছিলেন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। রাজার সামনে এসে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে না খুলতেই তাঁর স্ট্রোক হয়ে গেলো আর রাজার পায়ের কাছেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এই আঘাত সহ্য করা প্রায় অসম্ভব। নিজেকে আপন কক্ষে বদ্ধ করলেন তিনি, স্বীকারোক্তি করার জন্যে যাজককে ডেকে পাঠালেন। স্বভাবতই মাদাম দু বারি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

আদেলেদ এতেই যেন উৎফুল্ল হলেন। আমি এবং আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, রাজার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার কথা বলতে লাগলেন তিনি। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাবার এতটুকু বাসনাও যদি তাঁর থাকে তবে যেন এখনই ওই বেশ্যামাগীটাকে তাড়িয়ে দেন। আবার সেনাপতির ভূমিকা আদেলেদের, বোনেরা তাঁর অনুগত সৈনিকমাত্র।

ইস্টারের পর মাদাম তু বারি রাজাকে অনুরোধ জানালেন যে কয়েকসপ্তাহের জন্যে ওঁরা তুজনে যদি ট্রায়ানোঁতে কাটান, ওঁর হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। ওখানকার দৃশ্যাবলী বসন্তসমাগমে অপরূপ, ওখানে গেলেই জীবনের স্বাদ ফিরে পাবেন তিনি, মৃত্যুর ভ্রূকুটির কথা একটুও মনে পড়বে না।

রাজা সম্মত হলেন এবং মাদাম তু বারির সঙ্গে চলে গেলেন ট্রায়ানোঁতে। শিকারে বেরোলেন তিনি কিন্তু খুবই অসুস্থ বোধ করলেন। মাদাম তু বারি তাঁর চিকিৎসার ক্রটি করলেন না। সবাইকে জানালেন যে, রাজার যা দরকার, তা হলো অখণ্ড বিশ্রাম এবং ওঁর সঙ্গ।

রাজার চলে যাবার কয়েকদিন পরে নিজের ঘরে বসে হার্প বাজানো শিখছিলাম, যুবরাজ এলেন। ওঁর মুখে বিষণ্ণতা। চুপচাপ বসলেন তিনি। আমি শিক্ষক ও পরিচারকদের বিদায় নেবার ইঙ্গিত জানালাম।

'রাজা অসুস্থ।' তিনি বললেন।

'খুবই অসুস্থ?'

'ওরা তা বললো না।'

'উনি তো এখন ট্রায়ানোঁতে। এখনই গিয়ে দেখে আসছি। আমিই ওঁর সেবা করবো। উনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'না।' স্বামী আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসলেন। 'উনি ডেকে না পাঠালে ওখাতে যেতে পারি না আমরা। ওঁর আদেশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে আমাদের।'

'শিষ্টাচার!' আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। 'ঠাকুর্দা অসুস্থ অথচ শিষ্টাচার অমান্য করা চলবে না আমাদের!'

'লা মার্টিনিয়ার যাচ্ছেন ওখানে।' স্বামী বললেন আমাকে।

আমি জানি লা মার্টিনিয়ার হলেন রাজার ডাক্তারদের প্রধান।

'অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।' আমার স্বামী বললেন।

'তুমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো, লুই।'

'মনে হচ্ছে যেন গোটা আকাশটাই মাথায় ভেঙে পড়ছে আমার।' বললেন তিনি।

লা মার্টিনিয়ার রাজাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মাদাম দু বারির প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজাকে অবিলম্বে ভার্সাই নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। এর গুরুত্ব অনেকখানি। রাজার অসুখ সামান্য হলে এমন নির্দেশ কখনই দিতেন না তিনি। এটাই শিষ্টাচার সম্মত যে, ফ্রান্সের রাজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন ভার্সাইতে তাঁর সরকারী বাসভবনে।

ওঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। একটা জানালা দিয়ে ওঁর গাড়ি থেকে অবতরণ প্রত্যক্ষ করছিলাম। ভারি পোশাকে ওঁর সর্বাঙ্গ আবৃত, চোখমুখের চেহারা যেন বদলে গেছে ওঁর। কাঁপছিলেন উনি এবং মুখের ওপর যেন অস্বাস্থ্যকর রক্তিম আভা। মাদাম আদেলেদ দ্রুত গাড়ির কাছে গেলেন এবং রাজার পাশে পাশে চলার সময় করণীয় নির্দেশ দিতে লাগলেন। যতক্ষণ না ওঁর শোবার ঘর ফিটফাট হচ্ছে, আদেলেদের কক্ষেই নিয়ে যাওয়া হলো ওঁকে। রাজার হঠাৎ আগমন ঘর গোছানোর সময় দেয় নি।

নিজস্ব কক্ষে আসার পর আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠানো হলো। চোখের জল রুখতে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালাতে হলো আমায়। তাঁর দিকে যেন তাকানো যাচ্ছে না। ওঁর হস্তচুম্বন করার সময়ও ওঁর পক্ষ থেকে কোন সাড়া জাগলো না। ওঁর বিশ্বস্ততার অভাব সত্ত্বেও নিজের মতো করে ওঁকে ভালবেসেছিলাম, ওঁর বর্তমান অবস্থা অসহ্য ঠেকছিলো আমার কাছে।

আমাদের কাউকেই প্রয়োজন ছিলো না তাঁর। মাদাম দু বারি

যখন শয্যাপার্শ্বে এলেন, একটু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো ওঁকে। 'তুমি তো আমাকেই এখানে থাকতে বলছো, ফ্রান্স!' মাদাম দু বারি বললেন। রাজার মুখে হাসি ফুটলো, সম্মতি জানালেন তিনি। তাই ওঁকে মাদাম দু বারির কাছে রেখে আমরা বিদায় নিলাম।

স্বপ্নের মতো যেন কেটে গেলো দিনটা। কোন কিছুতেই মন দিতে পারলাম না। লুই সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন। জানালেন যে এখন আমাদের দুজনের একসঙ্গে থাকাই ভালো।

পাঁচজন সার্জন, দুজন ডাক্তার আর তিনজন ঔষধ বিক্রেতা রাজার পরিচর্যা করতে লাগলেন। রাজা অসুস্থ, এ সংবাদ সারা পারীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে অনুক্ষণ রয়েছেন লুই। কখন আমাদের ডাক পড়বে কে জানে! আমাকে ছাড়তে যেন ভয় পাচ্ছেন লুই। মনে মনে রাজার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি আমি। লুইও তাই করছেন।

রাজপ্রাসাদের বাইরে অনেক লোকের ভিড়। রাজার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চায় ওরা। আমার আর আমার স্বামীর প্রতি খানিকটা অন্যচোখে যেন তাকাচ্ছে ওরা। আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে খানিকটা সতর্কতা, খানিকটা শ্রদ্ধার সঙ্গে। রাজার ঘর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর আসছে। পরদিনও এই ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় কাটলো। মাদাম দু বারি তখনও সেবারতা, আমার বা আমার স্বামীর ডাক পড়েনি। পিসিরা স্থির করেছেন ওঁদের বাবার জীবনরক্ষা করবেন ওঁরা। একটা বারবনিতার ওপর ওঁর জীবন ছেড়ে দিতে পারেন না ওঁরা। ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও আদেলেদের নেতৃত্বে তিনবোন রোগীর ঘরে ঢুকলেন।

জানা গেল রাজা বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মাদাম দু বারির নিযুক্ত ডাক্তার বোর্দু মন্তব্য করলেন, 'পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ এবং রাজার যা শারীরিক অবস্থা, তাতে বসন্তরোগ খুবই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

পিসিদের অনুরোধ জানানো হলো, তাঁরা যেন রোগীর ঘর ছেড়ে চলে যান। আদেলেদের তখন রণচণ্ডী মূর্তি। 'কি বললেন! বাবার

শয্যাপাশ থেকে চলে যেতে হবে আমাদের? সাবধানে, একটু হিসেব করে কথা বলবেন ডাক্তার! বাবার সেবার প্রয়োজন, আমরা ছাড়া এসময়ে কে তা করবে?'

রয়ে গেলেন তাঁরা। মাদাম দু বারির মতো রাজার সেবা করতে লাগলেন। অবশ্য মাদাম দু বারি তখন ওখানে থাকলে তাঁরা ঘরের মধ্যে থাকতে চাইতেন না। সত্যি প্রশংসা করার মতো ত্রুটিহীন ওঁদের সেবা। এই রোগের সেবায় বিপদও অনেকখানি, আমাদের ওদিকে ঘেঁষতে দেওয়া হলো না।

দিনগুলো যেন শেষ হতে চাইছিলো না। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে ভাবতাম কি জানি আজ কি হবে! রাজা নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে ওঁর বসন্তরোগ হয়েছে। একটা আরশি আনার হুকুম করে, তাতে নিজের মুখ দেখলেন তিনি। 'এই বয়সে এমন রোগ সারে না।' তিনি বললেন, 'তাই আমার শেষকৃত্যগুলো সেরে ফেলতে চাই।' মাদাম দু বারি তখন তাঁর পাশে ছিলেন। রাজা জানালেন পরস্পরের মঙ্গলের জন্যেই ওঁকে সরে যেতে হবে। বেচারি দু বারি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে চলে যেতে হলো। তিনি আর তাঁর শত্রুদের মাঝখানে যে মানুষটা এতকাল পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন, সেই মানুষটার জীবনদীপ নিভে আসছে। উনি চলে যাবার পর রাজা অনুক্ষণ তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। মাদাম দু বারি ছাড়া তাঁর যেন একটি মুহূর্তও কাটছে না।

এতদিনে মনে হলো ওই মহিলার প্রতি আমি অকারণে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। ওঁর প্রতি সদয় হবার তো কোন বাধা ছিলো না। রাজা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন তাঁকে। নইলে যাজকরা যখন বারে বারে স্বীকারোক্তির জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন, রাজা কোন না কোন ভাবে তা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ওটা করলেই তো চিরবিদায় জানাতে হবে মাদাম দু বারিকে। সেটা না করলে তো পাপের হাত থেকে ওঁর মুক্তি সম্ভব নয়।

৭ই মে রাজার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাওয়াতে একজন যাজককে ডেকে পাঠালেন তিনি। পারী থেকে আসা হাজার হাজার

মানুষ তখন রাজপ্রাসাদের চারদিকে ভিড় করেছে। রাজার পরলোকে প্রস্থানের ব্যাপারটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায় ওরা। পুরো জায়গাটা জুড়ে যেন মেলা বসে গেছে। কারও মুখেই শোকের কোন ছায়া নেই। বরং ওরা আনন্দে মেতেছে এই ভেবে—রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো যুগের অবসান ও নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে।

স্বীকারোক্তিও যেন একটা উৎসব। ধর্মযাজকরাই বা ছাড়বেন কেন? যেমন তেমন পাপী তো নন রাজা। সারা জীবন ধরেই তিনি ধর্ম ও উপাসনাকে কোন পাত্তা দেননি। কার্ডিনাল দ্য লা রোশ আইমোঁর নির্দেশে পরিবারের সবাই মিছিল তৈরি করলাম। হাতে এক একটি মোমবাতি নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর দরজায় হাজির হলাম। আর্চবিশপ ঘোষণা করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, রাজার নির্দেশে আপনাদের জানাচ্ছি যে, তাঁর পাপের জন্যে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন তিনি। হৃত স্বাস্থ্য আবার যদি ফিরে পান তিনি, অনুতাপের মধ্যেই দিন কাটাবেন, ধর্মকে আঁকড়ে থাকবেন আর জনগণের মঙ্গলের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করবেন।'

শুনেই বুঝতে পারলাম রাজার জীবনের আশ্বাস আর বিন্দুমাত্রও নেই। তাঁর ঘরঘরে রুদ্ধ গলার স্বরে কষ্টকৃত উচ্চারণ শুনতে পেলাম, 'কথাগুলো নিজের মুখে উচ্চারণ করার শক্তি যদি আমার থাকতো!'

ওখানেই শেষ নয়। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার জের চললো আরও কয়েকদিন। সেই সুন্দর দেহের কি বীভৎস পরিণতি! গলে গলে পড়তে লাগলো মাংপেশী, দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠলো। সারা শরীর ফুলে গিয়ে কালো হয়ে গেলো। কিন্তু মৃত্যু হলো না ওঁর।

আদেলেদ এবং তাঁর বোনেরা এই অবস্থাতেও তাঁকে ছেড়ে এলেন না। সমস্ত নোংরা কাজগুলো নিজেরাই করতে লাগলেন। রাতদিন সেই রোগের মধ্যেই পড়ে রইলেন ওঁরা, নিজেদের ক্লান্ত, অবসন্ন করে তুললেন। আমার স্বামী ও আমাকে রোগীর কাছে যেতে দেওয়া হলো না। রাজার তিরোধানের আগে ভার্সাই ছেড়ে যাবারও হুকুম নেই আমাদের। ওঁর মৃত্যু ঘটলেই আমাদের চোয়াসি যেতে হবে। গাড়ি

পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে তার জন্যে।

একটা জানালায় মোমবাতি জ্বলছিলো। রাজার মৃত্যু হলেই ওটা নিবিয়ে দেওয়া হবে। স্বামী একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন আমাকে। ওখানে চুপচাপ বসেছিলাম। ওঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো।

হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড সোরগোল উঠলো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। আচমকা দরজা হাট করে খুলে গেলো। হুড়মুড় করে অনেক লোক ঘরে ঢুকে আমাদের ঘিরে ফেললো। মাদাম নোয়ালে সবার আগে আমার কাছে এসে পৌঁছলেন। নতজানু হয়ে আমার হাতে চুমু খেলেন তিনি। সম্বোধন করলেন, 'মহারানী' বলে।

বুঝতে পারলাম। দুচোখ জলে ভরে গেলো আমার। রাজা আর ইহলোকে নেই, আমার স্বামী আজ থেকে ফ্রান্সের রাজা আর আমি ফ্রান্সের রানী।

ওরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো যেন খুবই আনন্দের মুহূর্ত এটা। লুই আমার দিকে তাকালেন, আমি ওঁর দিকে। উনি আমার হাত ধরলেন এবং একসঙ্গে আমরা নতজানু হলাম। 'আমাদের বয়স নেহাৎ কম,' চাপাগলায় বললেন তিনি। দুজনেই যেন প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণ করছিলাম, 'হে ঈশ্বর আমাদের পথ দেখাও, রক্ষা করো। দেশ শাসনের পক্ষে আমরা নেহাতই তরুণ।'

রাজার মৃত্যুর পর ভার্সাইতে বন্দী হয়ে থাকার আর কোন অর্থ রইলো না। চোয়াসির দিকে তক্ষুনি রওনা হলাম আমরা।

পিসিদের জন্যে আলাদা একটা বাড়ির ব্যবস্থা হলো। ছোঁয়াচে রোগের বীজাণু যাতে কোনরকমে আমার স্বামীকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। ভার্সাই ছাড়ার মুহূর্তে কারও মুখে কোন কথা ছিলো না। একই গাড়িতে আমাদের সঙ্গে ছিলো প্রোভাঁস, আরতোঁ আর তাদের স্ত্রীরা। সবারই শোকজর্জর অবস্থা, সবারই চোখের পাতা ভিজে। লুইয়ের দুঃখই সবচেয়ে বেশি। সত্যিই তাঁর মাথায় যেন সারা আকাশটা ভেঙে পড়ছে।

অথচ কত মেকি ছিলো সেই শোক। আমরা প্রত্যেকেই নেহাত ছেলেমানুষ। উনিশ বছর বয়স রানী হবার পক্ষে নেহাতই কম—তার ওপর আমার মতো চপল হলে তো কথাই নেই। হয়তো সাফাই গাইছি নিজের হয়ে। কিন্তু কোন কিছুকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখার স্বভাব আমার নয়—বিশেষ করে শোকতাপ। মারি থেরেসি এমন সব মন্তব্য করতে লাগলো, যাতে হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠলো। আরতোঁর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি সে হেসেই চলেছে। আমাদেরও হাসি পেলো। সেই বিদঘুটে হাসির রেশ মৃত্যুর ছায়াটাকে যেন মনের চত্বর থেকে সরিয়ে দিলো।

চোয়াসির দিনগুলো কাজের চাপে কাটতে লাগলো, বিশেষ করে লুই ব্যস্ত রইলেন। ওঁর পদমর্যাদা যেমন বেড়েছে, চোখমুখের ভাবও হয়েছে সমীহ করার মতো, রাজা রাজা মনে হচ্ছে ওঁকে। যা ভালো মনে হচ্ছে ওঁর, তা করার জন্যে ওঁর আগ্রহের অন্ত নেই, নিজের বিরাট দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছেন উনি।

নিজের বুদ্ধির অভাবটা বড় বেশি করে বাজতে লাগলো আমার মনে। তাহলে তো ওঁর সাহায্যে আসতে পারতাম! দ্যু ছ্য চোয়াসুর কথা মনে পড়ে গেলো আমার। তাঁকে ডেকে পাঠালে কেমন হয়? উনি আমার এবং অস্ট্রিয়ার হিতাকাঙ্খী। মা নিশ্চয়ই চাইবেন রাজার ওপর প্রভাব খাটিয়ে ওঁকে পূর্বতন মর্যাদায় বহাল করা। কিন্তু স্বামীর পরিবর্তন প্রায় অবিশ্বাস্য। মঁসিয়ে চোয়াসুর নাম করাতে ওর চোখমুখ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলো। বললেন, 'লোকটাকে কখনই পছন্দ হয়নি আমার।' 'কিন্তু আমাদের বিয়ে তো উনিই ঘটিয়েছিলেন।' 'উনি না থাকলেও সেটা ঘটতো।' 'ভদ্রলোক কিন্তু খুবই চালাকচতুর।' 'বাবা ওঁকে পছন্দ করতেন না, শোনা যায়, বাবার মৃত্যুর জন্যে উনিই দায়ী।' 'তোমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন উনি? কিন্তু কি ভাবে?' 'উনিই বাবাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছেন।' 'অমন কথা বলো না। কক্ষনো মঁসিয়ে চোয়াসু তা করতে পারেন না।' 'অন্তত বাবার প্রতি উনি বিশ্বস্ত ছিলেন না। এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।' 'কিন্তু লুই, তোমাকে

যে আমি সাহায্য করতে চাই।' উনি হেসে ফেললেন। সেই হাসি মনে করিয়ে দিলো ওঁর আগের একটা মন্তব্য। 'ছেলেবেলায় মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই শিখিনি আমি, যা কিছু শিখেছি, কেবল পুরুষদের কাছ থেকেই। ইতিহাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্যই। যা নিঃসন্দেহে জানি তা হলো, রক্ষিতা এমন কি আইনানুগ স্ত্রীরাও রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কারণ হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রেই।' আমার প্রতি গভীর মমত্ববোধে এমন কথা বলেননি কোনদিন, কিন্তু এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে ছিলো ওঁর মনে।

অবশ্যই পিসিদের খানিকটা প্রভাব ছিলো ওঁর ওপর। আলাদা ভাবে থাকলেও ওঁরা মাঝে মাঝে আসেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। লুই অবশ্যই তখন একজন উপদেষ্টা নিয়োগের কথা ভাবছিলেন, যিনি রাজকার্যে ওকে ঠিক ঠিক মতো নির্দেশ দিতে পারবেন। নিজের পারদর্শিতার অভাব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই এই অন্বেষণ। স্থির করেছিলেন যে, জঁ্যা ব্যাপ্তিস্ত দ্য এ্যারোভিল ম্যাকলকে ডেকে পাঠাবেন। তিনি খুবই অভিজ্ঞ। রাজার রক্ষিতারা পেছনে না লাগলে তাঁর পতন ঘটতো না। তাঁর কাছেই চিঠি লিখছিলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। এমন সময় পিসিরা এলেন। আদেলেদের মুখে যেন মধু ঝরে পড়ছে। 'এখন তো আর বেরি ডাকা চলবে না, বলতে হবে—মহানুভব রাজা। ম্যাকলকে ডেকে পাঠাচ্ছো? ওঃ, না, না, না। যাঁকে তোমার দরকার, তিনি হলেন মরেপা?' স্বামী অবাক। 'তিনি তো খুবই বৃদ্ধ?' 'আর রাজা হলেন একদম তরুণ!' আদেলেদ মনোহারিণী হাসলেন। 'তোমার মধ্যে রয়েছে যৌবনের উদ্যম আর ক্ষমতা। মরেপার রয়েছে বয়সের অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির প্রাচুর্য। একেবারে সোনায় সোহাগা!' 'কিন্তু কোন পদেই নিজেকে স্থায়ী করতে পারেন নি তিনি।' 'সেটা তো ওঁর অক্ষমতা নয়, ভুল করেছেন আমাদের বাবা। রক্ষিতাদের কথায় ওঠাবসা করতেন তিনি। ওদের কেউ যদি একজন যোগ্য মানুষকে অপছন্দ করতো, বাস, তাঁর ভবিষ্যৎ খতম্।' তারপর মরেপার গুণগানে তিনি এমন মুখর হয়ে উঠলেন যে, আমার স্বামী ম্যাকলের বদলে মরেপাকেই চিঠি লিখলেন।

জয়যুক্ত হয়েই ফিরলেন পিসিরা। ভাবলেন ওঁদের এখন পোয়া-বারো। সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে। আমার অবর্তমানে রাজাকে সতর্ক করে দিলেন—আমার মতো বিবেচনাহীনা স্ত্রীর কথায় কান দিলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

কিন্তু ভালোমানুষীর অন্ত নেই লুইয়ের। সিংহাসনে আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গে তুলক্ষ ফ্রাঁ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। রাজসভার লাম্পট্য বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। মঁসিয়ে দ্য মরেপার কাছে জানতে চেয়েছিলেন কি ভাবে রাজসভার চরিত্র উন্নত করা যেতে পারে। 'একটি মাত্র পথই খোলা রয়েছে।' মরেপার উত্তর। 'আপনি যদি কোন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন সবার সামনে। ফ্রান্সের রীতি হলো, রাজা নেতৃত্ব দেবেন, জনগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।'

আমার দিকে তাকালেন লুই। অদ্ভুত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারামুখে। কোন রক্ষিতা পুষবেন না তিনি। আমাকে ভালবাসেন, স্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা ফিরে পেলে তাঁর সন্তানাদি হবে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? চারদিকে সমস্যার পাহাড় জমে আছে। কারও প্রতিই লুইয়ের কোন বিদ্বেষ নেই। মাদাম দু বারিকেও ক্ষমা করলেন তিনি। আমারও কোন রাগ ছিলো না ওই মহিলার প্রতি। রাজা ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে দেশের অর্থনীতি নিয়ে পড়লেন। বললেন রাজপরিবারের খরচ কমাতে হবে। আমিও তাতে সম্পূর্ণ রাজি। সরকার থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্যে যা বরাদ্দ ছিলো, তা নেবো না বলে ঘোষণা করলাম। সারাদেশে সে কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। রাজা আর আমার প্রশংসায় সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। হেনরি কোয়াত্রের মর্মরমূর্তির গায়ে একদিন কে যেন লিখে দিলেন, 'পুনরাগমন'। সে কথা শুনে রাজার দুচোখ আনন্দ আর দৃঢ়তায় চকচক করে উঠলো। জনগণ সত্যিই ভাবলো নতুন রাজার ভেতর দিয়ে ফরাসী দেশে আবার হেনরি কোয়াত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

পুরনো দিনের স্মৃতি আর আমাকে দুঃখ দেয় না। রাজার ভালবাসা

পেয়েছি, পেয়েছি জনগণের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা। আমার দুঃখ কিসের? জানি, মার দুচোখ অতন্দ্রভাবে আমার দেশের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছে। তবু তো আমার কর্তব্য হলো এ সম্পর্কে ওঁর কাছে লেখা। জানি, আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হলেও মার জ্ঞানের পরিধি নেই। রাজার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন তিনি। এখনও তো নেহাত ছেলেমানুষ আমরা! রাজ্য শাসন সম্পর্কে লুই কোন শিক্ষা পাননি। আর, কিছু শেখার মতো মেধা তো আমার নেই। জনগণের স্বপ্নের রাজ্য আমাদের মতো দুজন অর্বাচীন কি করে তৈরি করবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না তাঁর। আমার উচ্ছ্বাসভরা চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন: 'তোমার নতুন পদমর্যাদায় খুশি হবার মতো দেখতে পাচ্ছিনে কিছু। এর জন্যে দাম দিয়েছো অনেক, আরও বেশি দিতে হবে যদি না তুমি শান্ত আর সংযত জীবনবোধে অভ্যস্থ হও। তোমার প্রতি আজকের এই জনসমর্থন ভালোই, কিন্তু একে লালন করার শিক্ষা তোমায় পেতে হবে যাতে তোমার স্বামী—রাজা ও তোমার স্বদেশ, যেখানকার রাণী তুমি এখন, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তোমরা দুজন এতো তরুণ আর যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে তার ভার এমন দুর্বিসহ, সেজন্যেই আমার মনে এমন শঙ্কা।'

আমার জন্যেও উদ্বেগের অন্ত নেই তাঁর। আমার চাপল্য, আমার সামান্য ব্যাপারে নাক গলানো, নাচের প্রতি আমার আকর্ষণ, গুজবে কান দেওয়া, শিষ্টাচার পালনে আমার অনীহা এবং সর্বোপরি আমার আবেগ-প্রবণতা তাঁকে বেদনা দিচ্ছিলো। যুবরানীর পক্ষেই তো এসব অত্যন্ত নিন্দনীয় আর রানী হবার পক্ষে একান্ত ভাবেই অসহ্য। 'গভীর-ভাবে চিন্তা করতে শেখো, যাতে রাজা তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধা না পান।' মা লিখেছিলেন। 'অমিতব্যয়িতার অভ্যাস ছেড়ে দাও। রাজাকেও তা করতে বাধ্য করো না। এই মুহূর্তে জনগণ তোমায় ভালবাসে। এটার রক্ষণ একান্ত জরুরি। তোমার সৌভাগ্য আমার আশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। জনগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসন থেকে নিজেদের বিচ্যুত করো না। এতে তোমাদের আর ওদের সমান মঙ্গল।'

চোয়াসিতে আসার চারদিনের মধ্যেই খবর এলো যে মাদাম আদেলেদ জ্বর আর পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যে ওঁর অসুখ বসন্তরোগে রূপান্তরিত হলো। বাকি দুবোন, ভিকতোয়ার ও সোফি বাদ গেলেন না। খবরটা আমাদের আবাসেও ত্রাসের সৃষ্টি করলো। আগেই এ রোগে অল্প ভুগেছি বলে আমার আর হবে না ঠিকই কিন্তু রাজা? আমি ওঁকে টিকা নিতে জোরাজুরি করতে লাগলাম। সুতরাং লুই, প্রোভাঁস, আরতোঁ এবং আরতোঁর স্ত্রী সবাইকে টিকা দেওয়া হলো। ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি বিপদ লুকিয়ে ছিলো। টিকায় যদি বসন্ত রোধ হয়, সবাই প্রশংসা করবে আমার আর যদি তার বিপরীত কিছু ঘটে, সব দোষ এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। আমার সৌভাগ্য সে রকম কিছু ঘটলো না।

পিসিরা বসন্তরোগে ভুগছেন বলে স্থির হলো আমরা চোয়াসি ছেড়ে কিছুদিন লা মুয়েতে কাটাবো। পারীর কাছাকাছি বলে এতে আনন্দিত হলাম। ওখানে পৌঁছনো মাত্র হাজারো দর্শনার্থীর ভিড় হলো, ব্যালকনিতে গিয়ে হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করলাম। পিতামহের আমলে বোয়া দ্য বুলোঁর সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, লুই হুকুম দিলেন সব খুলে দিতে যাতে সাধারণ মানুষ বাগানে প্রবেশাধিকার পায়। ফলে আমাদের দর্শনের জন্যে ভোর থেকেই লোকের ভিড় হতে লাগলো।

জনগণের মধ্যে লুই ঘুরে বেড়াতেন অরক্ষিতভাবে, সাধারণ পোশাকে এবং পায়ে হেঁটে। একদিন উনি হেঁটে ফিরছিলেন, আমি ঘোড়ায় চড়ে প্রসাদ থেকে বেরোচ্ছিলাম, ওঁকে দেখেই ঘোড়াটা পরিচারকের হাতে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। লোকেরা সে দৃশ্য দেখলো। রাজা আমাকে আলিঙ্গন করে আমার দুগালে চুমু খেলেন। হাসির হল্লা উঠলো। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ মুছলেন। সবার মনেই আবেগের উচ্ছ্বাস। আমার হাত ধরলেন লুই, আমরা হেঁটে হেঁটে প্রাসাদে ফিরলাম। পেছনে জনতা। ফিরে এসে ব্যালকনিতে গিয়ে আবার ওদের দর্শন দিতে হলো। ওরা সমানে উল্লাস জানাতে লাগলো।

আমাদের যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখলো। 'রাজা ও রানী দীর্ঘজীবি হোন। আমাদের আকাঙ্খার রাজা লুই ও আমাদের সুন্দরী রানীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

জনগণের সমাদর আমার ইপ্সিত কর্মধারাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার সুযোগ দিলো। রাজসভার প্রচলিত শিষ্টাচারের দেওয়াল ভেঙে মুক্তির স্রোত বইয়ে দেবো—এই আমার ইচ্ছে। আমি তারুন্যকে অগ্রাধিকার দিতে মনস্থ করলাম। বৃদ্ধারা যাতে রাজসভায় প্রবেশাধিকার না পান, সেই ব্যবস্থায় নেমে পড়লাম। সহযোগীর অভাব হলো না। এমন সব দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করতে লাগলাম, যা আসলে আমার মূর্খতার পরিচায়ক। বৃদ্ধাদের সম্পর্কে নানা হাসিপরিহাসে আসর সরগরম হয়ে উঠলো। কোন বৃদ্ধা মহিলা আমার দর্শনার্থী হলে আমার যেন অসহ্য লাগতো। ওঁরা আসতেন কালো পোশাকে, পরলোকগত রাজার প্রতি শোক জানাতে। আর আমি ও আমার তরুণ বন্ধুরা তাতে মজা পেতাম।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ালো যে সারা রাজসভা আমার আচরণের আলোচনায় মুখর হয়েউঠলো, আমার তারুণ্য, আমার চাপল্য। বৃদ্ধারা জানালেন আমার সামনেওঁরা আর আসবেন না। শুনে হাসলাম। ফ্রান্সের রানী আমি, বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে আমার যেন মাথা ব্যথার অন্ত নেই! ওঁরা হলেন আভিজাত্যের ধারক বাহক, ওঁরা যদি রাজসভা বর্জন করেন ভারি বয়েই গেলো আমার!'

শোকসভায় ত্রিশোর্ধ্বেদের প্রাচীন বলায় চারিদিকে আমার সমালোচনা হতে লাগলো। ভুলে গেছিলাম রাজসভার সভ্যদের মধ্যে কতজনের বয়স ত্রিশের বেশি। আমার শত্রুরা আমার সম্পর্কে একটা গান তৈরি করেছিলেন যা হলো পরোক্ষে আমার প্রতি সাবধানবাণী,

'ফুটফুটে মহারানী, বয়স যার বিশ,
তোমার জন্যে তোলা রইলো জনগণের বিষ
ভেবেছো, পেরিয়ে এলে প্রাচীর আর প্রান্তর
চোখের ঠুলি ফেলো খুলে, নইলে দ্বীপান্তর।'

চাপল্য সত্ত্বেও, সবাই ভাবছিলো রাজার ওপর অন্তহীন প্রভাব থাকবে আমার। আমার প্রতি ওঁর দাক্ষিণ্যের সত্যিই সীমা ছিলো না, আমাকে খুশি রাখার প্রচেষ্টায় কোন ফাঁকি ছিলো না ওঁর। জানি, মা এবং মাসি দুজনেই চান যে রাজকার্যে আমারও কিছু ভূমিকা থাকুক, তাই নিজেকে রাজার অন্যতম উপদেষ্টা বলে কল্পনা করে নিলাম।

যে অপ্রিয় গানটি আমার নজরে এসেছিলো, তার প্রচারের মূলে ছিলেন, দু দ্য আয়গুলোঁ ও তাঁর বন্ধুরা। তিনি হলেন মাদাম দু বারির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। মাদাম দু বারি এখন রয়েছেন সংসারত্যাগিনীদের জন্যে সংরক্ষিত একটি মঠে কিন্তু মঁসিয়ে আয়গুলোঁ রাজসভায় থেকে যথারীতি আমার চরম শত্রুতা করে চলেছেন। লুইয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছি আমি, জানিয়েছি ওই লোকটি আমার চরম শত্রু। স্বামী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ওঁকে নির্বাসনে পাঠাবেন। অতটা চাইনে আমি। রাজাকে বলেছি ওঁকে যেন শুধু পদচ্যুত করা হয়।

সত্যিই আমার অন্ধতার কূলকিনারা নেই। পদচ্যুত করার জন্যে আমিই দোষী হলাম, ওঁর প্রতি প্রদত্ত শাস্তির মাত্রা লঘু করার জন্যে উনি কৃতজ্ঞতা জানাতে অসমর্থ হলেন। পারীতে বসে উনি আর বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলেন। আগামী বছরগুলোতে আমার সম্পর্কে হাজার হাজার গান ও প্রচার পুস্তিকা বিতরণের সেই হলো সূত্রপাত।

সেই মুহূর্তে তো আমি বিজয়ী। আয়গুলোঁকে সরিয়েছি, প্রিয়বন্ধু মঁসিয়ে দ্য চোয়াস্যুকে এনে বসাতে হবে উচ্চতম পদে।

‘বেচারা দ্য চোয়াস্যু!’ শয়নকক্ষে লুইকে একদিন বললাম। ‘রাজসভায় ফিরে আসতে চান তিনি।’

‘ওঁকে কোনদিনই পছন্দ করিনি আমি।’

‘তোমার ঠাকুর্দার প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি…’

‘এবং যথাসময়ে বিতাড়িতও হয়েছেন।’

‘সে তো দু বারির জন্যে। তিনিই নষ্টের গোড়া। তুমি তো আর ওই জাতীয় মেয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছো না।’ স্বামীর গলা জড়িয়ে

চুমু খেলাম। ওতে বেচারা যেন বিব্রত বোধ করলেন। 'লুই', আদুরে গলায় বললাম। 'তুমি যদি অনুমতি দাও ম'সিয়ে চোয়াসুকে আমি আবার রাজসভায় ফিরিয়ে আনতে চাই। তুমি কি আমাকে এই দয়াটুকু ভিক্ষে দেবে না?'

'তুমি তো জানো তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই কিন্তু...'

ওকে ছেড়ে দিতে দিতে বলি, 'জানি, আমাকে তুমি নিরাশ করবে না।' ভাবলাম, জিতে গেছি।

একটুও সময় নষ্ট না করে ম'সিয়ে চোয়াসুকে জানালাম যে ওঁকে রাজসভায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাজার সম্মতি পেয়েছি। উনিও অনতিবিলম্বে এসে হাজির হলেন।

স্বামী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা বাকি ছিলো আমার। আমাকে ভালবাসেন, আমাকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই তাঁর কিন্তু ওঁর ওপর আদেশ চালান যাবে না। তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে রাজনীতির সড়ক থেকে মহিলাদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আমাকেও কোন কিছুতে নাক গলাতে দেবেন না তিনি। শান্ত চোখে চোয়াসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শেষবার যখন আমাদের দেখা হয় তার থেকে বেশ মোটাসোটা হয়েছেন আপনি। মাথার টাকও বিস্তৃত হয়েছে দেখছি, ম'সিয়ে লে দু।' তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

কি করবেন ভেবে পেলেন না ম'সিয়ে চোয়াসু। কিছুই করার ছিলো না তাঁর। রাজার কোন আগ্রহ নেই ওঁর প্রতি, রাজা ওঁকে সরে পড়ার ইঙ্গিত করেছেন।

ব্যাপারটা আমারও চোখ খুলে দিলো। স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। সেটা একান্তভাবে তাঁর মন্ত্রীদের ব্যাপার।

দুঃখ হলো ম'সিয়ে দু চোয়াসুর জন্যে। ক্ষমতার স্বপ্ন আর না হয় দেখবো না। রাজনীতির মতো গম্ভীর ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে বেশিক্ষণ জড়িয়ে রাখা কঠিন আমার পক্ষে। মার্সি বরং মাকে জানিয়ে দিন যে রাজা আপন পথে পদচারণা করতে ভালবাসেন, ওখানে আমার কোন ভূমিকা নেই।

রাজা ও রানী হবার অল্পদিন পরেই লুই এমন একটা কিছু আমাকে উপহার দিলেন যা তুলনাহীন।

একদিন আমাদের শয়নকক্ষে এসে তিনি জানালেন যে ফ্রান্সের রাজাদের মধ্যে একটা নিয়ম চালু আছে। কোন রাজা সিংহাসনে বসার পর রানীকে একটি বাসস্থান দান করেন যা হবে রানীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি। রানী তাঁর সেই বাসস্থান নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও রুচি মতো ব্যবহার করতে পারেন। তাই তিনি ঠিক করেছেন যে আমাকে 'লে পেতি ত্রায়ানো' দান করবেন।

ভারি সুন্দর অথচ ছোট্ট বাড়ি 'লে পেতি ত্রায়ানো'। রাজার প্রস্তাবে যারপর নেই খুশি হয়ে উঠলাম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন তিনি। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর কণ্ঠলগ্না হলাম।

'বাড়িটা কিন্তু নেহাৎ ছোট।'

'ঠিক যেন একটা পুতুল-ঘর।' আমি বলে উঠি।

'ফ্রান্সের রানীর থাকার মতো লাগসই নয় মোটেই।'

'কিন্তু খুবই সুন্দর। পৃথিবীর আর কোন প্রাসাদের সঙ্গে এর বিনিময়ে সম্মত নই আমি। এখন এটার মালিক আমিই। এটাকে আমার খুশিমতো সাজাতে পারি তো? একজন সাধারণ মানুষের মতো ওখানে থাকতে পারি আমি। লুই, এটা নিশ্চিতভাবে তোমায় বলতে পারি যে, একজন বিশেষ অতিথি ওখানে কোনদিন প্রবেশাধিকার পাবেন না। তিনি হলেন শিষ্টাচার। উনি ভার্সাইতেই পড়ে থাকুন।'

প্রিন্সেস দ্য লঁব্যালকে তখনই ডেকে পাঠালাম। তাকে এবং আরও কয়েকজন তরুণী মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম 'লে পেতি ত্রায়ানো' পরিদর্শনের জন্যে। আগে দূর থেকে যেমন দেখেছিলাম, এখন কেমন যেন অন্যরকম মনে হলো। মনোরম একটি বাসভবন এটা—ঠিক যেন সাদাসিদে মানুষের বসবাসের জন্যে তৈরি। কোন রানীর জীবনে অসংখ্য ক্লান্তিকর কর্তব্যের মাঝখানে—এমন বিরল মুহূর্ত আসে যা সাধারণ

পরিবেশে শান্তি খোঁজে। বান্ধবীদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'এটা ছিলো রাজা পঞ্চদশ লুই আর তাঁর প্রেমিকা মাদাম দু বারির প্রমোদ-নিকেতন—এখানেই ওঁরা কপোতকূজনে নিরত থাকতেন।' শুনে আহত বোধ করলাম। 'সে সবের ইতি কবেই ঘটে গেছে।' বললাম। 'এখন এটা মারি আঁতোয়ানেতের আশ্রয়স্থল। এটার সম্পূর্ণ সংস্কার করবো আমরা যাতে অন্য কোন রমনীর ব্যবহারের সব স্মৃতি এর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে যায়।'

বাড়িটাতে মাত্র আটটি কামরা। আসবাবপত্রের পরিকল্পনায় রুচির কোন কার্পন্য নেই। ঠাকুর্দার তীক্ষ্ণ নজর ছিলো সেদিকে। দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে বাইরের লন আর বাগান দেখতে লাগলাম। কত কি যে করার আছে! সবটাই নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারি, যদিও বর্তমান আসবাব আমারও পছন্দ। এমন জাঁকজমকপূর্ণ কিছু থাকবে না যা অহরহ ভার্সাইয়ের ছায়া হয়ে উঠবে। এখানে অভ্যর্থনা জানাবো শুধু আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের। আমাদের আচরণে রানী আর প্রজার সম্পর্ক ফুটে উঠতে দেওয়া হবে না।

এখান থেকে ভার্সাই চোখে পড়ে না, যা আমাকে আরও আশ্বস্ত করে তুললো। চতুর্দশ লুই তাঁর প্রিয়তমার জন্যে যে 'লে গ্রাঁ ত্রায়ানো' নির্মাণ করেছিলেন, তার থেকেও এ বাড়ির পরিবেশ সুন্দর। এটা আমাকে যে এতটা খুশি করে তুলবে, ভাবতেও পারিনি। ভার্সাইতে ফিরে এই আনন্দ সংবাদটুকু লুইকে দেবার তর সইছিলো না আমার।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার ভাই ম্যাক্সমিলান পারী বেড়াতে এলো। ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম এ কবছরে ফ্রান্স কেমন বদলে দিয়েছে আমায়। ম্যাক্স ভব্যতার ধার ধারে না, কেমন আড়ষ্টতা ওর ভাব-ভঙ্গিতে। এমন মর্যাদার সঙ্গে ফরাসীরা ওকে স্বাগত জানালো অথচ সেই মর্যাদার কোন মূল্য ম্যাক্স দিতে পারলো না। এর স্বীকৃতিও ম্যাক্স দিতে পারলো না।

লুই ওকে ব্যক্তিগত নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। এমন আন্তরিকতা

দেখালেন যেন ম্যাক্স ওঁর নিজের ভাই। আমিও বাড়ির অন্যান্যদের সম্পর্কে, বিশেষ করে মার বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করলাম ওকে। বুঝতে পারলাম পাঁচ বছর আগেকার সেই জীবনস্রোত থেকে কত দূরেই না সরে গেছি আমি। মনে প্রাণে ফরাসী বনে গেছি।

ফরাসী শিষ্টাচার সম্পর্কে ম্যাক্স যে শুধু অজ্ঞ ছিলো তাই নয়, তা মেনে চলতেও রাজি হলো না কিছুতেই। রাজসভায় ওকে 'আর্চডিউক' না বলে 'আর্চফুল' বলা হতে লাগলো। রাজবংশের প্রতিনিধি হিসেবে ওর কর্তব্য হলো ফরাসী রাজবংশীয় কুমারদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। ওঁরা সেজন্যে অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু ম্যাক্স তাঁদের ধারকাছেও ঘেঁষলো না। বললো, সে তো বেড়াতে এসেছে, রাজ-রক্তের অংশীদারদেরই তো কর্তব্য হলো তার সঙ্গে দেখা করা। আর ওঁরা এটাকে ওঁদের বংশের প্রতি অবমাননাকর বলেই মনে করলেন।

আমার দেওর প্রোভাঁস ম্যাক্সের সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করলো, এই রাজকুমাররা কিছু না কিছু অজুহাত দেখিয়ে তাতে যোগ দিলেন না, শহর ছেড়েও চলে গেলেন। আমার ভাইয়ের প্রতি এটা সত্যিই অপমান প্রদর্শন।

আমার স্বামী ওঁদের হাবভাবে রুষ্ট হয়ে কণ্ডি ও কন্টির রাজকুমারদের এক সপ্তাহের জন্যে সভা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

এতে সান্ত্বনার মাত্রা খুবই সামান্য। ওই রাজকুমাররা ফরাসী জনসাধারণের প্রচুর সমর্থন পেতে লাগলেন যেন ওরা আমার ভাইকে পাত্তা না দিয়ে বীরোচিত কিছু করে বসেছেন। ভাইকে দুঃখের সঙ্গে বিদায় জানাতেই হলো। ওদিকে পারমায় আমার বোন অ্যামেলিয়াও নানা ধরনের অশালীন কাজ করছে বলে খবর আসতে লাগলো। ফরাসীরা ভাবতে লাগলো যে, আমি এমন একটা পরিবার থেকে এসেছি, যাদের সুনাম নেই।

আমি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি ত্রায়ানো নিয়ে। বলতে গেলে ফ্রান্সের অবস্থা দিন দিন যে ভয়ঙ্করতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, সেদিকে এতটুকুও নজর দিইনি আমি।

বুঝতেও পারতাম না কিন্তু রাজার যেন দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। তাঁর উদ্বেগের একটুও আমার ওপর চাপাননি তিনি, চোয়াস্যুকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমার উদ্যোগের কথা স্মরণ রেখেই উনি ভেবেছিলেন রাজনীতি থেকে আমাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখবেন। ত্রায়ানো নিয়ে আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে আছি—এতেই উনি যেন নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওদিকে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা হলো এই :

আগষ্ট মাসে লুই, মঁসিয়ে অ্যান রবার্ট জ্যাকস তুর্গোকে ফ্রান্সের অর্থনীতি বিষয়ক অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক এই মানুষটি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। স্বামী খুবই পছন্দ করতেন ওঁকে, একটি বিষয়ে দুজনের মধ্যে মিল ছিলো বলে। লোকজনের মাঝখানে পড়লে দুজনেই কেমন যেন অসহায় বোধ করতেন। ওঁর সম্পর্কে লুই মাঝে মাঝে দুচার কথা আমাকে বলতেন। আমি তখন আমার নিজের ব্যাপারের মধ্যে এমন ডুবে আছি যে বেশিক্ষণ সে আলোচনায় নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। কিন্তু তবুও লুইয়ের মুখে শুনেছিলাম যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সে সময় ভয়ানক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো। তুর্গো তিনমুখো কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তার সমাধানের জন্যে। তা হলো,

দেউলিয়া অবস্থার মধ্যে না পড়া
করের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা
ধার না করা

'জানো।' স্বামী বললেন। 'মসিয়ে তুর্গোর কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ কেবল একটিমাত্র পন্থাবলম্বনেই সম্ভব। তাহলো খরচের ব্যাপারে একেবারে হাত গুটিয়ে নেওয়া। বছরে অন্তত দুকোটি সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের আর পুরনো দেনা শোধ করে ফেলতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। শোবার ঘরের জন্যে হালকা নীল এবং হালকা গোলাপী। আমার শোবার ঘর। একক একটা শয্যা, যেখানে স্বামীর জন্যেও জায়গা থাকবে না…।

লুইকে কেমন লজ্জিত দেখাচ্ছিলো। 'তুর্গো বলছিলেন নিজের

ব্যয়সঙ্কোচ যেন করি কারণ আমার প্রথম কর্তব্য হলো জনগণের প্রতি। 'মহানুভব রাজা যেন জনসাধারণের অর্থ নিজের প্রিয়জনদের জন্যে নিয়োগ না করেন।' আমি তার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছি। এমন একজন যোগ্য মন্ত্রী খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।'

'সত্যিই তো।' কড়কড়ে সাটিন একটুও পছন্দ নয় আমার। ভারি ব্রোকেডও নয়। ওসব ভার্সাইতেই মানায়। আমার প্রিয় ত্রায়ানোর জন্যে·· হালকা রঙের নরম সিল্কই ভালো।

'আমার কথা কি শুনছো?'

'হ্যাঁ। শুনছিই তো। তোমার সঙ্গে আমিও একমত যে মঁসিয়ে তুর্গো খুবই বিচক্ষণ লোক। ব্যয়সঙ্কোচ করতেই হবে আমাদের। গরীবদের কথাই আগে ভাববো আমরা।'

হাসলেন তিনি। বললেন যে তিনি জানতেন এই ব্যাপারে আমি ওঁর পাশে রয়েছি। ওঁর মতো আমিও জনগণের কল্যাণ চাই। সায় দিলাম। সত্যিই তাই। আমিও তো চাই প্রত্যেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিন কাটাক আর আমাদের প্রশংসা করুক। মাকে সেদিনই লিখলাম, 'মঁসিয়ে তুর্গো অত্যন্ত সৎস্বভাবের মানুষ। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঁর উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রয়োজন।'

আজ উপলব্ধি করতে পারছি যে সদিচ্ছা এবং তার যথাযথ রূপায়ণের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়। মঁসিয়ে তুর্গো সত্যিই সৎলোক কিন্তু আদর্শবাদীরা প্রায়ই কর্মযোগী হয়ে ওঠেন না। ভাগ্যও ওঁর অনুকূলে ছিলো না। সে বছর শস্যোৎপাদন ভালো হলো না। অন্তর্দেশীয় অবাধ ব্যবসার পত্তনী করেছিলেন তিনি, কিন্তু শস্যের দাম তাতে স্থিতিশীল রইলো না স্বল্পতার জন্যেই। তার ওপর রাস্তা খারাপ, পারীতে শস্য আনা অসুবিধাজনক হয়ে উঠলো। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্যে তুর্গো সরকারী গুদাম থেকে খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়লেন। তাতে সাময়িকভাবে দাম কমলেও সেই শস্যভাণ্ডার খতম হতেই দাম আবার চড়ে গেলো। জনগণের অসন্তুষ্টি বেড়ে গেলো। খবর আসতে লাগলো যে দেশের বিভিন্ন অংশে লোকে অনশনে দিন কাটাচ্ছে। তুর্গো

জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন।

অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হলো নানা-স্থানে। লোকেরা জড়ো হয়ে বাজারে লুটতরাজ করতে আরম্ভ করলো। নদীপথে শস্যবাহিত নৌকাগুলো আক্রমণ করে, বস্তার মুখ খুলে দিলো কিছু দুষ্কৃতকারী। রাজার কানে যখন এলো যে ওরা শস্য লুঠ করেনি, শস্যের বস্তাগুলো জলে ফেলে দিয়েছে, খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। 'ক্ষুধার্তদের কাণ্ড বলে তো মনে হচ্ছে না, এটা যেন দুষ্কৃতকারীর কাজ।' বললেন তিনি। তুর্গো অবশ্যই বরাবর রাজার সঙ্গে ছিলেন যদিও বাতের অসুখে ভুগছিলেন তিনি।

আমি লে ত্রায়ানোতে বসে দেওয়ালের জন্যে ওয়াতোঁর চিত্রাবলী বেছে নিচ্ছিলাম। স্থির করেছিলাম প্রতিটি কক্ষের কৌণিক ও চকচকে প্যানেলগুলো হঠাবো না। ফিরে এসে দেখলাম রাজা শিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে তুর্গোর সঙ্গে আলোচনায় কেটেছে তাঁর। আমাকে জানালেন যে, এই মনমরা অবস্থা থেকে কিছুক্ষণ সরে থাকতে চান। একটু পরেই তুর্গো আর মরেপা পারী রওনা হলেন। ওখানেও নাকি কিছু হামলাবাজ বাজার আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বামী স্থির করলেন যে, তাঁর অবকাশ খুব অল্পক্ষণ স্থায়ী হবে।

উনি যখন ফিরে এলেন নিজের কক্ষেই ছিলাম আমি।

'প্রাসাদ ছাড়তেই একদল হাঙ্গামাকারীর ওপর চোখ পড়লো। সাঁ জারমেঁ থেকে আসছে ওরা ভার্সাইয়ের বাজার লুঠ করতে।'

শুনেই আঁতকে উঠলাম। হাঙ্গামাকারীরা আসছে ভার্সাইতে? মরেপা আর তুর্গো—কেউ তো এখানে নেই। কারা ওদের হঠিয়ে দেবে একমাত্র রাজা ছাড়া?

লুইকে বিবর্ণ অথচ দৃঢ় দেখাচ্ছিলো। 'জনগণ আমার বিরুদ্ধে গেলে অসহ্য লাগে আমার।' বললেন তিনি। 'নষ্ট করার মতো একটুও সময় হাতে নেই। কাজে নেমে পড়তে হবে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। যথাযোগ্য কাজ।' তার চোখে সেই পুরনো দ্বিধাসংকোচের দৃষ্টি ফিরে এলো।

ব্যূভো আর দ্য পোয়া রাজকুমারদ্বয়কে ডাকলেন তিনি। অবস্থাটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন ওঁদের। বললেন, 'তুর্গোর কাছে খবর পাঠাচ্ছি, তারপরেই কাজে নেমে পড়তে হবে।' তখনই লিখতে বসলেন। 'ভার্সাই আক্রান্ত।…আমার দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করতে পারেন। বাজারের চারদিকে রক্ষী মোতায়েন করেছি। যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আপনি পারীতে নিয়েছেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট। তবু ওখানে যা ঘটছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই আমার। যাদের কথা বলেছেন, তাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আপনার নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু তাদের হাতের মুঠোয় পাবার পর তাড়াহুড়ো করার অথবা নানা ধরনের প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই। এখানে ও আশেপাশের বাজারে এবং কারখানায় কি করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি আমি।'

ওঁর সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ ছিলাম এবং মনে মনে স্বস্তি পেলাম যে, আমার উপস্থিতি ওঁকে খুশি করে তুলেছে।

'যাতে শঙ্কিত হয়ে উঠছি তা হলো ঘটনার ধারা। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা তৈরি দাঙ্গা।' উনি বললেন। 'এর পেছনে জনসাধারণ নেই। অবস্থার ততটা অবনতি ঘটেনি। এমন কিছু নেই যার সমাধানে আমরা অসমর্থ। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নকল ব্যাপার, পরিকল্পিত। আমাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে—কিন্তু কেন?'

পারী প্রবেশের সেই প্রথম দিনের স্মৃতি আমার চোখের সামনে যেন ভাসছিলো যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তুমুল হর্ষধ্বনিতে স্বাগত জানাচ্ছিলো আমাদের। 'জনগণ আমাদের ভালবাসে লুই। শত্রু হয়তো থাকতে পারে আমাদের কিন্তু ওরা জনসাধারণ নয়।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি।

ভয়ঙ্কর দিন ছিলো সেটা। গলা দিয়ে কিছু নামলো না আমার, মনে হচ্ছিলো যেন মূর্ছা যাবো। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো যেন অসহ্য হয়ে উঠছিলো। ক্ষুদ্ধ জনতার হট্টগোল রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে শোনা যেতে লাগলো। জনতার বীভৎস চেহারাটুকু সেই প্রথম চোখে পড়লো আমার—বিশৃঙ্খল, পরণে কম্বল, হাতে লম্বা লম্বা লাঠি,

মুখে অশ্লীল ভাষা। জানালা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলাম। কেউ যেন একটা কিছু ছুঁড়ে মারলো। ওপরের বারান্দায় এসে পড়লো সেটা ; গলিত রুটি একটা।

রাজা বললেন ওদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। বারান্দায় এগিয়ে গেলেন। এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর তাঁর গলা শোনা গেলো,—'প্রিয় জনগণ'...

ওদের চিৎকারে তাঁর কণ্ঠ ডুবে গেলো। আমার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। চোখে তাঁর জল।

'চেষ্টা করে তো দেখলে।' আমি সান্ত্বনা দিলাম। 'যতদূর সম্ভব তোমার চেষ্টার তো কোন ত্রুটি নেই।' সেই মুহূর্তে তাঁর দৃঢ়চিত্ততা, তাঁর অটল সংকল্প তাঁকে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ করে তুলেছিলো।

প্রাসাদের চত্বরে রক্ষীরা প্রবেশ করলো। নেতৃত্ব করছিলেন রাজকুমার ব্যুভো। তাঁকে ঢুকতে দেখেই ক্ষিপ্ত জনতা ঘিরে ধরলো। ময়দা ছুঁড়ে মারতে লাগলো তাঁর দিকে। দামী ময়দায়, যা দিয়ে রুটি তৈরি হয়, সর্বাঙ্গ সাদা হয়ে গেলো তাঁর। 'রাজপ্রাসাদে ঢুকবো আমরা।' জনতার মধ্য থেকে কেউ চিৎকার করে উঠলো। 'রুটির দাম কত হলে সন্তুষ্ট হও তোমরা?' প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন। 'দু সৌ।' 'তবে তাই হবে।' দ্য ব্যুভো জানালেন।

বিজয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে ওরা প্রাসাদের দিক থেকে সরে গেলো। বোধ হয় রুটির দোকানে ছুটে যেতে লাগলো দু সৌতে রুটি কেনার জন্যে। এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটলো ভার্সাইয়ের হাঙ্গামার। কিন্তু যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো—দেখা গেলো যে, তাদের কেউই দরিদ্র, উপবাসে ক্লিন্ন চাষী নয়—প্রচুর আর্থিক সঙ্গতি আছে ওদের। একজনকে তো চিনতেই পারলাম—আরতোঁর খাদ্যশস্যের জোগানদার। পচা কয়েকটি রুটি, যা নিয়ে জনতা অভিযোগ তুলেছিলো, পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে, ময়দার সঙ্গে তার মধ্যে ছাই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটা অতীব দুঃখজনক।

ওদিকে মঁসিয়ে তুর্গোয় সতর্কতা সত্ত্বেও পারীতে দাঙ্গা হলো।

পারীর পুলিস প্রধান লেনোয়া দোনামোনা ভাব দেখাতে লাগলেন দাঙ্গা-বাজদের শায়েস্তা করতে, তুর্গো ওঁকে বরখাস্ত করতে দেরি করলেন না। ওঁর জায়গায় বসালেন নিজের অনুগামী অ্যালবার্টকে। ধরপাকড় অনেক হলো, শৃঙ্খলাও ফিরিয়ে আনা হলো। ভার্সাইতে পার্লামেণ্টের জরুরি অধিবেশন ডাকা হলো।

'এসব গুণ্ডাবাজি বন্ধ করবোই।' রাজা বললেন। 'এতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শান্ত শহর পারী এবং আমার রাজ্যের কোন অসুবিধে এতে ঘটবে না। আমার বিশ্বাস আপনাদের আনুগত্য এবং সমর্থন আমার প্রতিই ন্যস্ত থাকবে কারণ এমন বিধিব্যবস্থা আমি গ্রহণ করতে চাই যাতে আমার রাজত্বকালে এ জাতীয় দুঃখজনক ঘটনা পুনর্বার আর না ঘটে।'

পারীর হাঙ্গামা কিন্তু চট করে থেমে গেলো না। যাদের গ্রেপ্তার করা হলো, দেখা গেলো তারা মোটেই দীনদুঃখীর শরিক নন, তারা দস্তুরমতো বিত্তশালী মানুষ। রাজা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। 'এটা আমাদের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত। সে জন্যেই এতো চিন্তিত আমি', রাজা বললেন।

'কিন্তু রাজকীয় কর্তব্যই পালন করছো তুমি, যথাযথভাবেই।' আমি সান্ত্বনা দিলাম।

ঘটনার জের থামতে চাইলো না। একদিন রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার সঙ্গে আঁটা এক টুকরো কাগজের ওপর চোখ পড়লো আমার। তাতে লেখা ছিলো 'রুটির দাম যদি না কমে আর মন্ত্রীদের যদি পরিবর্তন না করা হয়, ভার্সাই রাজপ্রাসাদের চার কোণায় আগুন ধরিয়ে দেবো আমরা।' রাজার দৃষ্টি ওদিকে ফেরাতে তিনি বললেন, 'এটা জনগণের কাজ নয়। আমার বিশ্বাস জনগণ এর হোতা নয়।' কিন্তু বিচলিত হলেন তিনি। আমিও। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত যেন সারা প্রাসাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো।

তুর্গো এবং অ্যালবার্ট কিন্তু চুপ করে ছিলেন না। সন্দেহবশত অনেককেই গ্রেপ্তার করতে লাগলেন। দুজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে

চুরির জন্যে হাতেনাতে ধরা হলো এবং প্রকাশ্যভাবে ওদের ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। রাজা এসব সহ্য করতে না পারলেও ওঁরা তাঁকে বোঝালেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অন্যদের সতর্ক করে তুলবে, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটলো। পারীর হাঙ্গামা থেমে গেলো।

কিন্তু এই চক্রান্তের মূল আবিষ্কার করা গেলো না। হাঙ্গামা থেমে গেছে—এতেই রাজা নিশ্চিন্ত। আমিও। ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান না হয়েই আমরা এই অপ্রিয় ঘটনাটিকে ভুলে যেতে চাইলাম।

একমাসের মধ্যেই রাজার অভিষেকের আলোচনায় সকলে মুখর হয়ে উঠলো। রাজা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন বলেই ফ্রান্সের মাটিতে দীর্ঘদিন অভিষেক উৎসব হয়নি। অথচ রাজা ষোড়শ লুই এতে উৎসাহী ছিলেন না। এসব সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় উৎসবের মধ্যে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন না, কেমন জবুথুবু হয়ে যেতেন। এসব অনুষ্ঠান বড় বেশি সেকেলে, নিয়মের রজ্জুতে বাঁধা, যা চলে আসছে ফরাসী রাজতন্ত্রের উদ্ভব থেকেই। রাজা তাই চেষ্টা করতে লাগলেন কোন উপায়ে এটাকে পাশকাটানো যায় কিনা।

মার্সি এবং মা ভাবছিলেন যে, রাজার সঙ্গে আমার মাথায়ও মুকুট পরানো হবে। রাজার মতো আমার অনুষ্ঠানভীতি ছিলো না। কিন্তু জানা গেলো যে, আমার জন্যে কোন অভিষেক অনুষ্ঠান থাকবে না। 'এতে খরচের বহর শুধুই বাড়বে।' লুই বললেন। 'যখন খরচের সাশ্রয় করাই আমাদের উচিত, এর ওপর আবার ক্লথিলডের বিয়ে আছে, আরতোঁর ভাবী সন্তানের জন্যে অনুষ্ঠান···' বলতে গিয়েই থামতে হলো তাঁকে। সেই লজ্জাকর সত্যের মুখোমুখি হতে হলো। আমিও বিষণ্ন বোধ করলাম। তিন ভাইয়ের মধ্যে আরতোঁই প্রথমে বাপ হতে চলেছে। জায়ের প্রতি ঈর্ষা জাগছে মনে মনে। সেই ঈর্ষা ভোলার জন্যে লে ত্রায়ানোর প্রাসাদকে ঢেলে সাজাতে উঠে পড়ে লেগেছি। 'সুতরাং,' রাজা আগের কথার খেই ধরলেন, 'আমার সঙ্গে তোমার অভিষেক হচ্ছে না।'

জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে দেওর ও জাদের সঙ্গে রীমস রওনা হলাম। ওখানে পৌঁছতে মধ্যরাত হয়ে গেলো। সারা শহরটা তখন চাঁদের আলোয় স্নান সারছে। ওর মধ্যেই অগনিত জনতার অভ্যর্থনা কুড়োলাম। রাজার আগমনের একদিন আগে পৌঁছেছিলাম বলে রাজার প্রবেশের শিহরণটুকু সম্পূর্ণই অনুভব করতে পেরেছিলাম। রীমসের প্রধান গীর্জায় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। বেদীর ওপর আমার স্বামী যখন দাঁড়ালেন, সে দৃশ্য আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোনালী আর ঘন লালে আচ্ছাদিত তিনি, উষ্ণীষ রুপোলী কাপড়ের, ভেলভেটের টুপিতে হীরে আর মুক্তোর বাহার। তাঁর জীবনে অনেকবারই সেই বিরল মুহূর্ত এসেছে যখন তিনি সত্যিকারের রাজার সত্তায় অনুপ্রবেশ করেছিলেন। জনগণের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অথচ মহত্ত্বে অতুলনীয়। বড়সড় মজলিশে তিনি হয়তো লাজুক, মুখচোরা কিন্তু তিনি সত্যিকারের সাহসী মানুষ।

সেই মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। আমার চোখের ওপর তাঁর অবিচলিত দৃষ্টি এমন স্থির হয়ে গিয়েছিলো যে, মনে হচ্ছিলো অমন ভরাট অনুষ্ঠানের কথা যেন ভুলেই গেছেন তিনি। পরে মনে হয়েছিলো, সেই অকল্পনীয় মুহূর্ত থেকেই আমাদের যুগ্ম জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিলো। তারপর থেকে আমরা দুজনে মিলে যেন একটি সত্তা—দুজনের প্রতি আমাদের দুজনের প্রেম যেন অফুরন্ত। নীরব এই অনুরাগ, কামনার ছলচাতুরী বিহীন বলেই যেন এই বন্ধন অচ্ছেদ্য।

জানতাম সেই মুহূর্তে আমি যা-ই চাইবো তাঁর কাছে, তাই দিতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না তিনি। কিন্তু কি যে চাইবার আছে আমার! একটিমাত্র আকাঙ্খাই অপূরণীয় রয়ে গেছে। তা হলো সন্তান। তিনি দিতে পারেননি আমাকে। তবু এটা তো আমার জানা যে, সন্তানের আকাঙ্খা আমার চেয়ে কোন অংশেই কম নেই তাঁর মধ্যে।

যথাসময়ে আমার ছোট জা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো। ওর জায়গায় যদি আমি হতাম! সেই প্রসবের যন্ত্রণা যদি ওর বদলে আমি

ভোগ করতাম! সেই বিষণ্ণ আনন্দের মুহূর্তগুলো যেন একটা আশ্চর্য অনুরণন তুললো আমার মধ্যে। ছেলেটা চিৎকার করে কাঁদছিলো। তার মধ্যেই নিজের পরিচারিকাদের নিয়ে ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে আমার প্রিয়সখি লঁব্যাল আর মাদাম কঁপাঁ যার কুমারী নাম ছিলো আনরিয়েত জেনে, আমাকে বই পড়িয়ে শোনাতো। এদের দুজনেই আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগতা, এদের বাদ দিয়ে এক পাও যেন চলে না আমার।

আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় এক দঙ্গল মেয়ের সামনে পড়ে গেলাম। মাদাদ কঁপাঁ আর লঁব্যাল ওদের ঠেকাতে পারলো না। ওদের কেউ আমার পোশাক, কেউ বা আমার হাতের আঙ্গুলগুলো স্পর্শ করতে লাগলো। ফরাসী দেশের রীতি হলো রানীর সন্তান হবার সময় জনসাধারণের প্রাসাদে প্রবেশ করার অকুণ্ঠ অধিকার থাকবে। অবশ্য রাজপরিবারের অন্য কারও ব্যাপারে শুধুমাত্র পরিবারের লোক-জনই উপস্থিত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে পারীর বেশ কিছু মহিলা প্রাসাদে এসে ভিড় করেছিলো। আমাকে ঘিরে নানা রকম সরস মন্তব্য করতে লাগলো ওরা। 'মা হচ্ছো না কেন, তোমার তো উচিত একটা ছেলের জন্ম দেওয়া। শুধু সারারাত ধরে না নেচে রাজার সঙ্গে শুলেও তো পারো। শুনেছি, রাজা নাকি নপুংসক, ওঁর প্রজনন ক্ষমতাই নেই।' এ সব বিচ্ছিরি মন্তব্যে গা জ্বালা করছিলো। মাদাম কঁপাঁ অবশ্যই ওদের জানালেন, 'রানী এই মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত, ওঁর বিশ্রাম দরকার।' ওরা কান দিলো না। কিন্তু আমাকে তা আমার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনলো। গম্ভীর মুখে, চোখে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ফুটিয়ে, ওদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলাম নিজের ঘরের দিকে। শুধু মাদাম কঁপাঁকে সঙ্গে রেখে বাকি সবাইকে চলে যেতে হুকুম করে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো আমার। বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

রাজা আমার হেনস্থার কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

'ব্যাপারটা অবিবেচনাপ্রসূত, খুবই নিন্দনীয়।' বললাম আমি।

'আমার কি দোষ বলো?' ওঁর মুখে কষ্টের রেখা ভাসতে দেখে নিজেকে সংশোধন করলাম। 'আমাদের কি দোষ বলো?'

আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তিনি। ওঁর কানে কানে বললাম। 'শুধু একটা পথই খোলা রয়েছে আমাদের কাছে। তোমার সেই সামান্য অস্ত্রোপচার।'

'তাই। তাই।'

'করবে কি?'

'ভেবে দেখি।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো আমার। কতদিন ধরেই না ভাবছেন তিনি। ছ বছর তো কেটেই গেলো। কিসের ভয়ে ভীত উনি? সামান্য ছুরির? নিশ্চয়ই নয়। কাপুরুষ তো তিনি নন। জানি, অবজ্ঞার কথাই ভাবছেন। সবাই জেনে ফেলবে, সবাই ভেতরে ভেতরে জল্পনাকল্পনা করতে থাকবে। সবারই চোখ পড়ে থাকবে ওঁর ওপর। এখনই, আমার শয়ন-কক্ষে তাঁর পদার্পন ঘটলে সবাই জেনে ফেলে, ক ঘণ্টা আমার ঘরে কাটালেন ওরা হিসেব করে। এই অনুক্ষণ নজর রাখাটা আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ওরা যদি আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দিতো!

'তুমি, তুমি কি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলবে?'

স্বীকৃতি জানালেন। যা চাই, তাই দিতে চান আমাকে। আমারও জানাতে দ্বিধা নেই যে, আমার সন্তানের চাহিদা সব কিছুরই ওপরে।

উনি বিদায় নিলে মার কাছে চিঠি লিখতে বসলাম। 'আশা করছি রাজাকে অস্ত্রোপচারে রাজি করাতে পারবো। আমাদের দাম্পত্য মিলনে আর বাধা থাকবে না।' মা উত্তরে জানালেন ওঁকে যেন সব কিছু জানাতে থাকি। তাই করতে লাগলাম। সবই খোলাখুলিভাবে জানালাম কিন্তু কোন্ যন্ত্রণায় আমি অনুক্ষণ পীড়িত হচ্ছি, বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না তিনি। তখন আমার বয়স কুড়ি। তরুণী, স্বাস্থ্যের প্রভায় জলজ্বলে। বলতে গেলে কুমারীর জীবন তো কাটাচ্ছি না। দু জনের মধ্যে সে সব অসম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রচেষ্টাগুলো তো ছিলোই।

দিন দিন অস্থির আর অসুখী হয়ে পড়ছি। ওঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, আবার ওঁকেই জড়িয়ে ধরছি। চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা যে করেননি তা নয়। প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের সব খুঁটিনাটিই জেনে নিয়েছেন। যে অস্ত্রটি ব্যবহার করা হবে তাও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তারপর ফিরে এসেছেন আমার কাছে।

'আমার বিশ্বাস, যথাসময়ে এটা আপনা আপনিই সেরে যাবে।'

দমে গেলাম। অস্ত্রোপচার করানো শক্ত ওঁর পক্ষে। পুরনো অসফল পদ্ধতিকেই আঁকড়ে থাকতে হবে আমাদের।

আমার ঘরে আসতে হলে সদর দরজা দিয়েই আসতে হয় ওঁকে। সবাই চোখ পাকিয়ে লক্ষ্য করে। ব্যঙ্গ কবিতা আর মস্করার গানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে আমাদের সম্পর্কে। অসম্ভব কিছু ঘটানোর সেই তরুণ রাজা আর রানীর ভূমিকায় আমরা আর নেই। ফ্রান্সের রাজপথ দুধ আর মধুর প্রবাহে ভাসিয়ে দেবার ক্ষমতা যে আমাদের নেই—এটা সবার জানা হয়ে গেছে। রুটি নিয়ে রক্তারক্তির ঘটনার স্মৃতি কারও মন থেকে মুছে যায়নি। আমরা হলাম একজন নপুংসক মানুষ আর তার চপলা তরুণী স্ত্রী। আমাদের মিলন নিয়ে লোকের অহেতুক জল্পনা কল্পনা ভারি বিব্রত করে তুলছে আমাদের। এই মুহূর্ত-গুলো দুজনকেই ভীতচকিত করে তোলে। কিন্তু কর্তব্য তো করতেই হবে। তাই ওঁকে বলেছিলাম যে, ওঁর আর আমার শোবার ঘরের মধ্যে যদি একটা গোপন সিঁড়ির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমার ঘরে ওঁর আসা কারও নজরে পড়বে না।

তাই করা হলো। স্বস্তি তো পেলাম কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো না। জানতাম ওই অস্ত্রোপচারটুকু না করালে কিছুই ঘটবে না। তবু নিশ্চিত জানি, এই খাদটুকু ছাড়া স্বামীর সম্পর্কে অভিযোগ আনার কিছুই ছিলো না আমার। ওঁর প্রতি অনুরাগের অভাব আমার মধ্যে ছিলো না কিন্তু উনি আমাকে দাম্পত্য সুখ দিতে পারেননি, আমার যৌবনিত শোনিতে ছড়িয়ে দিতে পারেননি ওঁর সন্তানের প্রাণ।

কিন্তু জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে আমার আচরণের জন্যে কোন

কৈফিয়ৎ আমার সত্যিই নেই। জানি, মাকে এটা ভয়ানকভাবে চমকে দিয়েছিলো। নিজের জন্যে সওয়াল করতে গেলে অজুহাত দেখাতে হয় আমার তারুণ্যের, আমার মধ্যে উদ্বেলিত যৌন পিপাসার যা পরিতৃপ্তির রাস্তা খুঁজে পায়নি এবং আমার চারদিকের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের।

সন্তানের প্রয়োজন ছিলো আমার। কোন মেয়েরই সন্তানাকাঙ্খা আমার চেয়ে বেশি ছিলো না। যখনই গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণে যেতাম আর দেখতাম ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে অথবা মায়ের পোশাক ধরে টানাটানি লাগিয়েছে কোন ছোট বাচ্চা, ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে উঠতো আমার মন। সত্তার সমস্ত আর্তি সন্তানের চেহারা ধরে বেরিয়ে আসতে চাইতো। আমার পরিচারিকাদের মধ্যে কারও সন্তান হলেই হুকুম দিতাম তক্ষুনি যেন তাকে আমার সামনে হাজির করা হয়। তাদের ছেলেগুলোকে অথবা আমার কুকুর বাচ্চাগুলোকে যেভাবে দলাই মলাই করতাম তাতে মার্সি পর্যন্ত আঁতকে উঠে ভাবতেন যেন ওটা আমার একধরনের মানসিক রোগে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় নিজেকে ব্যক্তিগত আমোদ আহ্লাদের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখা ছাড়া আর কি কোন উপায় ছিলো আমার? এই অসফল অসম্পূর্ণ জীবনের সালতামামিতে আমার এতটুক আগ্রহ ছিলো না। প্রায়ই প্রচণ্ড মাথাধরায় আক্রান্ত হচ্ছিলাম, জ্বরজ্বর এবং মুমূর্ষু ভাবও তার সঙ্গে থাকতো। মার্সি বলতেন 'স্নায়ুজনিত আক্রমণ।' ভাবতেই পারতেন না যে, আমার অসুখ করতে পারে। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যের আভায় জ্বলজ্বল করতাম আমি। অবিশ্বাস্য প্রাণবন্যায় ছুটে বেড়াতাম। অধিক রাত নেচে কাটাতে অভ্যস্থ ছিলাম। কিন্তু সামান্য কারণেই চোখের জলে ভাসতে থাকতাম। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতাম তাতে।

আকাঙ্খা ছিলো স্নেহের—একটানা আদরের, যা কখনই লুইয়ের কাছ থেকে পাইনি। এই আকাঙ্খার আক্রমণ যে খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। চারদিকে ছিলো সুন্দর প্রাণচঞ্চল পুরুষের ভিড়, আমার এতটুকু সাড়া পেলে আমাকে সুখী করার আগ্রহের অন্ত ছিলো না তাদের। পাকে প্রকারে আমাকে পাবার

ইচ্ছে তারা জানাতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু ভেতরের সাবধান বাণীও অনুক্ষণ কানে বেজেছে আমার, যা আমার মার। 'এটাই তোমার বিপদ। যে সন্তানের মা হবে তুমি সে হবে ফ্রান্সের রাজকুমার। রাজা ছাড়া অন্য কারও সন্তান যদি গর্ভে ধারণ করো, অপরাধের অন্ত থাকবে না তোমার।'

তবু মাঝে মাঝে যৌন আবেগের রাশ টানা কঠিনতর হয়ে উঠতো, প্রগল্‌ভা সাজতে ইচ্ছে হতো। বোধ হয় মাদাম দু মারসাঁ ঠিকই বলতেন, আমার স্বভাবে রয়েছে ব্যভিচারের বাসনা। কিন্তু কোন তরুণ যুবকের সঙ্গে একা কাটাবার সাহস ছিলো না আমার, জানতাম আমার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে অসংখ্য চোখের দৃষ্টি। আমার চারদিকে এমন অনেক মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে যারা আমাকে বিপাকে ফেলতে চায়। জানতাম বিশ্রী এক দুঃখজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে আমার জন্যে আর অনেকের ধারণা যে গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছি আমি।

অস্থিরতার জন্যে মার্সির বকুনি খেতাম। ভোরের আগে বিছানা ছুঁতাম না। উত্তেজক পরিবেশের প্রতি আমার আগ্রহের যেন সীমা-পরিসীমা ছিলো না। রাজসভার তরুণ আর চঞ্চল পুরুষদের নিয়ে সর্বক্ষণ মত্ত থাকতে চাইতাম। যাঁরা আমার শুভ চিন্তা করেন এবং আমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেন তাঁদের সঙ্গ একেবারে অসহ্য মনে হতো আমার। মার্সিকে বোঝাতে চাইতাম। ভাবতাম ওঁর সঙ্গে অকপট হতে বাধা নেই। অন্তত মস্করার গান যাঁদের কণ্ঠে, মার্সি তাঁদের নতুন মালমশলা জোগাবেন না। 'নিজের অদ্ভুত অবস্থায় বিব্রত আমি। দেখছেন তো, রাজা আমায় কেমন একা ফেলে রেখেছেন। একঘেয়েমির শিকার হতে ভালো লাগে না আমার। নিজেকে নিয়েই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। যন্ত্রনাকাতর ভাবনার হাতে নিজেকে সঁপে না দেবার জন্যেই আমার চাই সর্বক্ষণের ব্যস্ততা। নতুনত্ব না পেলে চলে না আমার।' কঠিন হয়ে উঠতো তাঁর চোখের দৃষ্টি। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মাকে লিখতে বসতেন।

স্নেহ বিতরণের একটা আধার চাই আমার। ছোট্ট এলিসাবেথকে

তাই দিয়ে ভরিয়ে দিতাম, ওকে কাছছাড়া হতে দিতাম না। ক্লথিলডের বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো মারি থেরেসি লুইস, রাজকুমারী ল'ব্যাল। ওকে খুবই ভালো লাগতো, এমন মৃদুভাষী, নরম আর মিষ্টি ছিলো ওর স্বভাব যদিও অনেকেই ভাবতো মেয়েটি নেহাত বোকা। সেই অনিশ্চিত দিনগুলোতে ওই ছিলো আমার মনের সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষ। আমার প্রতি ওর আনুগত্যের পরিধি ছিলো না। কাঁধে কাধ মিলিয়ে দুটি স্কুলের মেয়ের মতো বাগানে বেড়াতাম আমরা। এদৃশ্য দেখে আঁতকে উঠতো অনেকেই, কারণ কোন রানীর পক্ষে এই আচরণ একটুও শিষ্টাচারসম্মত নয়। কিন্তু যতই হতাশার ভারে দমিত হচ্ছিলাম, ততই যেন জোরের সঙ্গে স্থির করছিলাম যে, ফরাসী শিষ্টাচারকে এক পয়সার মূল্য দেবো না আমি।

সেই সময়ে পরিচিত হলাম কঁতেস জুলের সঙ্গে। এমন সুন্দরী মেয়ে আর চোখে পড়েনি আমার। বড় বড় নীলচোখের অধিকারিনী সে, মাথাভর্তি ঘন কোঁকড়ানো চুল, কাঁধ পর্যন্ত ঝুল নেমেছে। কোন মনি-মুক্তোর আভরণ নেই। ওকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিলো আমার। কিন্তু প্রথম দিন দেখেছিলাম একটি লাল গোলাপ শোভা পাচ্ছে ওর কাঁচুলিতে। ওর জা হলো আরতোঁর ছেলের ধাত্রী কঁতেস ডায়না দ্য পলিগন্যাক, যিনি জুলেকে এখানে নিয়ে আসেন। ওকে দেখেই ওর পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে পড়লাম, হুকুম দিলাম ওকে যেন আমার সামনে হাজির করা হয়। প্রথম পরিচয়ের সময়ে ওর বয়স ছিলো ছাব্বিশ যদিও ওকে দেখাচ্ছিলো ঠিক আমারই বয়সী। বেচারি গরীব অথচ ওর কোন উচ্চাশা নেই। রাজসভার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছেও ওর নেই। আরও লক্ষ্য করলাম, আমি যে রানী সেই ধারণাটুকু ওর অকারণ অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠেনি, এমন ভাব দেখাতো যেন আমরা দুজনে অনেকদিনের বান্ধবী। এমন সহজ সুন্দর মনোভাব আমাকে ওর প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তুললো। ওর কুমারী নাম গ্যাব্রিয়েল নামেই ডাকতে লাগলাম ওকে, আমার পরিচারিকাদের অন্যতমা করে নিলাম।

সময়টা আর তেমন অসহ্য মনে হচ্ছিলো না। গ্যাব্রিয়েলকে সব

সময়ের সঙ্গিনী করে নিলাম। ও জানালোও যে ওর একজন প্রেমিক ছিলো। এখানে সব মেয়েরই প্রেমিক থাকে, সব পুরুষেরই রক্ষিতা। এটাই প্রচলিত ধারা। সবারই থাকে সত্যিই, কিন্তু রানীর থাকতে নেই। ওর প্রেমিক কঁৎ দ্য ভোদ্রেয়্ কিন্তু তেমন সুবিধের লোক নন। আরও আবিষ্কার করলাম যে, প্রেমিক হিসেবে ভদ্রলোক যতই আকর্ষণীয় হোন, উচ্চাশার কোন অন্ত নেই ওঁর।

এদিকে লঁব্যালও আমার নতুন বন্ধু সম্পর্কে ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠেছিলো। গ্যাব্রিয়েল সম্পর্কে ওর খুঁতখুঁতোনি আমাকে খুব অস্থির করে তুলতো। ওদিকে পলিগন্যাক পরিবার তৈরি করতে সুরু করেছিলো একটা স্তাবকের দল; উদ্দেশ্য—আমাকে কেন্দ্রবিন্দু করে নানাধরনের সুখসুবিধে লুটে নেওয়া। আমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে ওদের আখের গুছিয়ে নেবার ব্যাপারটাও আমার মোটা মাথায় ঢুকছিলো না।

যা করে যাচ্ছিলাম, তার সবটুকুই অবিবেচনাপ্রসূত। মেয়েদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে বিকৃত কটুকাটব্য কানে আসছিলো। জানতাম এ সব মার কানে যাবেই। তাই অন্য কেউ ওঁকে জানাবার আগেই নিজের সাফাই গেয়ে রাখলাম। আমার ইচ্ছায় কঁৎ জুলে দ্য পলিগন্যাক পেলো অশ্বপালের পদ। তাতে রাজসভায় কঁতেস জুলে, অর্থাৎ গ্যাব্রিয়েলের স্বীকৃতি জুটলো, ওকে আমার কাছে রাখারও সুযোগ হলো। এখন আমি একটা হৈ চৈ করা দলের মধ্যমণি হয়ে উঠলাম। আমাকে ঘিরে রইলো একদল হাসি খুশি তরুণ। গ্যাব্রিয়েলের আবাসস্থল হলো আমার কক্ষের ঠিক পাশেই, বিনা ভূমিকায় ওর ঘরে যেতে কোন বাধা রইলো না আমার।

এই স্তাবকের দলকে মন্দ লাগছিলো না, যদিও এদের কেউ সাদাসিদে নন। এর মধ্যে ছিলেন প্রিন্সেস দ্য গুইমিনি, যিনি ছিলেন ছোট রাজকুমারীদের পরিচালিকা। তিনি আমার প্রিয়পাত্রী ছিলেন, আমার মতই তাঁরও কুকুর পোষা শখ ছিলো। স্বামী প্রিন্স গুইমিনিকে ছেড়ে এসেছিলেন মহিলা, নতুন প্রেমিক জুটিয়ে নিয়েছিলেন দ্যু দ্য কোয়াগ্নিকে। এই ভদ্রলোকও দেখতে সুশ্রী, যদিও একটু বুড়োটে,

আচারে ব্যবহারে বেশ কেতাদুরস্ত। আর ছিলেন প্রিন্স দ্য লিনে, যিনি একজন কবি। শ্রীযুক্ত এস্টারহেজি একজন হাঙ্গেরিয়, যাঁর সম্পর্কে আমার মা আমাকে জানিয়েছিলেন। আর কজনের নাম করবো! ব্যারন দ্য বেসেঁভা, কঁৎ দ্য লুজঁা, দ্যু দ্য আধিমার, মারকুই দ্য লা ফেয়েৎ ইত্যাদি। সবাই ভিড় করতেন গ্যাব্রিয়েলের কক্ষে, আর সেখানে আবির্ভাব ঘটতো ফ্রান্সের মহারানীর যিনি জীবনের একঘেয়েমি আর বিরক্তি তাড়াতে বদ্ধপরিকর।

একদিন রাজকুমারী লঁব্যাল নিয়ে এলো রোজ বার্তিনকে। তার নাম আরও অনেকেই বলেছে আমাকে। রু সাঁ হোনোরে তার দর্জির দোকান। আমাকে দেখেই তো সেই অতি বুদ্ধিমতী মহিলার মুখে খই ফুটতে লাগলো—অপূর্ব আমার দেহসৌষ্ঠব, চমৎকার গায়ের রঙ, অনন্য আমার চাকচিক্য। আমাকে ঠিকমতো পোশাক পরানোর চেয়ে বেশি কাম্য ওর আর কিছু নেই। সঙ্গে করে খুবই মনোহর কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছিলো। সেগুলো আমার শরীরে জড়িয়ে দিয়ে তার উপযুক্ততা যাচাই করে নিচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, অন্যদের কাছ থেকে সাধারণত যে সম্মান আমার প্রাপ্য সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই, ওর মতে রাজত্বের চেয়ে দর্জির কাজের মূল্য যেন বেশি। রানীর ভূমিকা থেকেও যা আমাকে বেশি মানায় তা যেন কোন নিপুণ দর্জির মডেল হয়ে বসা। আমার জন্যে একটা গাউন তৈরি করে দিলো যা খুবই সুন্দর। বললাম যে এমন চমৎকার গাউন আমার আগে ছিলো না। বাস, পরদিন অন্য একটা পোশাক আমার জন্যেই আবিষ্কার করে বসলো। আর কারও জন্যে এমন পোশাক হতে পারে না, আমার পছন্দ না হলে ও নাকি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও এমন সব পোশাক তৈরি করবে যা কেবল ফ্রান্সের রানীর অঙ্গেই শোভা পাবে। ওর হাবভাবে বেশ আমোদ পেতে লাগলাম। বসার ঘরে একটুও অপেক্ষা না করে সরাসরি আমার কক্ষেই ঢুকে পড়তো ও। পরিচারিকাদের একজন ওকে দর্জি বলাতে ভয়ানক অপমানিত হয়ে বললো, 'আমি হলাম একজন শিল্পী।'

মানতেই হয় সেকথা। সিল্ক, ব্রোকেড আর রঙের কথা এমন ভাষায়

বলতো যে, আকৃষ্ট না হয়ে উপায় থাকতো না আমার। নানা ধরনের নক্সা নিয়ে প্রায়ই আসতো আমার কাছে। সুতরাং আমার পোশাকের চমক দিন দিন বাড়তে লাগলো। আমার জায়েরাও আমার অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। রোজ বার্তিন গোপনে হাসাহাসি করতো। 'ওঁদের কি অ্যাফ্রোদিতির মতো দেহ সুষমা আছে, মেঘের ওপর পা ফেলার মতো কি ওঁদের চলার ছন্দ? পরীর সৌন্দর্য আর সুষমার অধিকারিনী কি ওঁরা?'

ও আর আমি মিলে রাজপ্রাসাদের রুচি বদলে দিলাম। কোন ঘরে ঢুকতে দেখলেই সবার চোখ পড়তো আমার পোশাকের ওপর। ওরা ছুটতো রোজ বার্তিনের কাছে, অনুনয় করতো অমন পোশাক তৈরি করে দেবার জন্যে।

জীবনের নতুন অর্থ আরোপিত হলো আমার কাছে। রোজ বার্তিনের বিলের বিশাল টাকার অঙ্ক না দেখেই সই করে হুকুম দিতাম, 'প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হোক।'

রোজ বার্তিন আমার মতো ক্রেতা পেয়ে যেমন খুশিতে ডগমগ, ওর মতো দর্জি পেয়ে আমার অবস্থাও প্রায় সেরকম।

আঃ, সে সবদিনের অশেষ মূর্খতা! চারদিকে কি ঘটে যাচ্ছে, সেটা দুচোখ খুলে দেখতেও যেন আমার অনীহা। ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক যে দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাতে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিলো না আমার। রুটি নিয়ে সেই রক্তারক্তির স্মৃতিও আমাকে সজাগ করে নি। রাত তিনটে চারটে অবধি নাচের আসরে কাটাচ্ছি অথবা তাসের আড্ডায় জুয়ার অঙ্কও দিন দিন বেড়ে চলেছে আমার।

ফরাসী শিষ্টাচার ভাঙার চেষ্টায় ততটা সফল হতে তখনও পারিনি। ঘুম ভাঙতেই চাকরানীদের কেউ হালফ্যাশানের পোশাকের একটা খাতা আমার চোখের সামনে খুলে ধরতো। নতুন কোন পোশাক এলেই তার নক্সা এই খাতায় তুলে রাখা হতো। আমার প্রথম কাজ হলো সেদিন কি পোশাক পরবো তা বলে দেওয়া। তার জন্যে সারাদিন আমার কি

কি কাজে ব্যাপ্ত থাকতে হবে, কোথায় কোন্ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা আছে, সবটুকুই ভেবে নিতে হতো। তার ওপর সে সব পোশাকের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে এমন অলংকারও পছন্দ করে দিতে হতো।

একেক দিন এসবেও যেন ক্লান্তি লাগতো। অনেক দিন ধরেই ত্রায়ানোতে বেশিক্ষণ সময় কাটাবার কথা ভাবতাম। নিজের একান্ত নিজস্ব কক্ষে ঘুম থেকে জেগে ওঠা! কি যে আনন্দের সেটা! বিছানা থেকে মাথা তুলেই দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া বাগানের ওপর যা আমি আমার একান্ত পছন্দমতো তৈরি করেছি। রাত্রিবাসের ওপর শুধু একটা আল-খাল্লা চাপিয়ে সেই বাগানে ঘোরাঘুরি করা! রাতের শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপরে পা ফেলে চলার কি অসীম আনন্দ! ত্রায়ানোতে সেটা হলো অনেক আনন্দের একটা মাত্র।

ভার্সাই থেকে কতই না তফাৎ! সেখানে শিষ্টাচারের ঠেলায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, জীবনী-শক্তির অর্ধেকটাই যেন উপে যায়। সেই জন্যেই ত্রায়ানোতে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে লাগলাম।

আরও বড় একটা অনুষ্ঠান ছিলো সারাদিনের কর্মসূচীর মধ্যে। সেটা হলো কুন্তল সজ্জা। পারীর তথা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে নামী কুন্তল শিল্পী মঁসিয়ে লিওনার্দকে নিয়োগ করেছিলাম এই কাজের জন্যে। প্রত্যেকদিন সকালে পারী থেকে তিনি গাড়ি ছুটিয়ে ভার্সাই আসতেন এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে। ছ-ঘোড়ার সেই অপূর্ব গাড়ি দেখতে রাস্তায় লোক জমে যেতো। বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, আমার অপব্যয়ের এসব নমুনা জনগণের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলো। আমার একার জন্যে রোজ বার্তিন যেমন পোশাকের উদ্ভাবন করতো, মঁসিয়ে লিওনার্দও নতুন নতুন কুন্তল সজ্জা উদ্ভাবন করতে কার্পণ্য করতেন না। উচুঁ কপাল নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে অস্বস্তির সীমা ছিলো না আমার। নতুন ধরনের চুল বাঁধার পদ্ধতিতে তা ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলো, চুল বাঁধার ভঙ্গিরও অদ্ভুত বিবর্তন হচ্ছিলো। পমেড দিয়ে চুল শক্ত করে নেওয়া হতো, তারপর মাথার ওপরে সোজা করে বসানো হতো, কপাল থেকে প্রায় আঠারো ইঞ্চি বেশি উঁচু। তারপর মঁসিয়ে

লিওনার্দ যেন শিল্পসৃষ্টিতে লেগে যেতেন। নকল ফুল আর রিবনের সাহায্যে সেই চুলের ওপর তিনি তৈরি করতেন ফল, পাখি, এমন কি জাহাজ অথবা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীও।

সারা ভার্সাই আর পারীর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আমার চেহারা। লেখালেখি ঠাট্টা তামাসা চলতো তা নিয়ে, খরচের বহর নিয়ে হতো নিন্দাবাদ। মার্সি মাকে যথানিয়মে জানাতেন। মা তিরস্কারের ভঙ্গিতে লিখতেন, 'সংবাদপত্রের মারফৎ যা জানতে পারছি, সে সম্পর্কে দু একটা কথা তোমাকে না জানিয়ে থাকতে পারছিনে। বলছি, তোমার কুন্তল সজ্জার ভঙ্গি সম্পর্কে। শুনছি, চুলের গোড়া থেকে তা প্রায় তিনফুট ওপরে উঠে চূড়ার আকার ধারণ করছে আর তাতে শোভা পাচ্ছে পালক আর রিবন।' জানালাম যে, চুল চূড়ার মতো বাঁধাই হলো চলতি রীতি। এতে এখন আর কেউ অবাক হয় না। মা লিখলেন, 'চলতি রীতির সঙ্গে পা ফেলার ব্যাপারে একটুও আপত্তি নেই আমার কিন্তু পোশাক-আশাকের অতি বাড়াবাড়ি আমার অসহ্য। একজন রানী,- যার স্বাভাবিক অঙ্গসুষমার অভাব নেই, তার পক্ষে এমন মূর্খতা সাজে না। পোশাক পরিচ্ছদের সারল্য তার সদগুণ বিবেচনায় লোকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, উঁচু পদের সঙ্গে তাই বেশি খাপ খেয়ে যায়। রানীর আসরে বসে তুমি যখন এসব রীতি চালু করছো, সারা পৃথিবী সে সব অপ্রয়োজনীয় রীতির অনুকরণ করবে। কিন্তু আমি, যে সেই ছোট্ট রানীকে একান্ত ভালবাসি আর তার প্রত্যেক পদক্ষেপ সতর্কভাবে লক্ষ্য করি, মনে করি, তাকে অতিচাপল্যের বিরুদ্ধে সাবধান করা উচিত।'

আগে আগে মা সরাসরি হুকুম চালাতেন, এখন শুধু সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন। ওঁর সেই সাবধান বাণী শুনে আমার জীবনধারা যদি বদলাতাম ! কিন্তু আমিও তো বদলেছি, এখন আমি প্রাপ্তবয়স্কা একজন নারী, নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করার সনদ পেয়েছি। সুতরাং রোজ বার্তিন বহাল রইলো, বিলের অঙ্ক বাড়তে থাকলো অবিশ্বাস্য পরিমাণে, কুন্তল সজ্জার বাহারও বদলাতে লাগলো প্রতিদিন।

তার ওপর আরতোঁ আমায় জুয়া খেলায় উৎসাহিত করে তুলেছে।

অনেক অর্থ হেরেও কোন আক্ষেপ হতো না আমার। আসলে অর্থ সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার তৈরি হয়নি। বিলের ওপর 'দিয়ে দাও' শব্দ দুটো লিখে চাকরদের হাতে তুলে দিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে স্বামী হাতখরচের জন্যে যা টাকা দিতেন, তার সবটুকুই জুয়ার টেবিলে খরচ হয়ে যেতো।

অবশ্য স্বামীর উদারতার অন্ত ছিলো না। আমোদের পেছনে আমার অবিরাম ছুটে চলার এই মানসিকতার জন্যে তিনি নিজেকেই দোষী বলে মানতেন। আমার সব দেনা বিনা দ্বিধায় শোধ করতেন তিনি।

আমার আসল আকর্ষণ কিন্তু এ সবের কোনটাতেই নয়। সেটা ছিলো হীরেতে। এ সব জ্বলজ্বলে চোখ ধাঁধাঁনো পাথর আমাকে অভিভূত করে ফেলতো। ওগুলো ঠাণ্ডা কিন্তু যেন আগুনে ভরতি, আমিও তাই। কোন তরুণের সঙ্গে কখনও একা থাকতাম না, ভয় পেতাম বলে অন্যদের ধারণা। কিন্তু এই আপাত শীতলতায় লুকিয়ে ছিলো প্রচণ্ড আগুনের শিখা, যা ওই হীরের মতোই হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে উঠতো।

মণিমাণিক্যের অভাব ছিলো না আমার। কিছুটা এনেছিলাম অস্ট্রিয়া থেকে, বাকিটা পেয়েছিলাম আমার বিয়ের দিনে ঠাকুরদার কাছ থেকে। কিন্তু নতুন কোন জহরত দেখলেই যেন আকৃষ্ট হয়ে যাই। লোকেরা আমার ব্যয়বাহুল্যের জন্যে যতই অভিযোগ তুলুক, ব্যবসায়ীরা কিন্তু খুশি হতো। রাজসভার দুজন মণিকার—বোহেমার আর বাসঁগে আমাকে নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। নতুন নতুন গয়না আমার সামনে তুলে ধরতেন ওঁরা, ওসবের দ্যুতি আর ঔজ্জ্বল্যে আমি পাগল হয়ে যেতাম। না কিনে উপায় থাকতো না আমার।

তার ওপর ত্রায়ানোর অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। অভূতপূর্ব সেই বাগানে টান টান হয়ে শুয়ে থাকতাম। সারা পৃথিবীতে তেমন বাগান বোধ হয় দুটো ছিলো না। ইংরেজদের রীতিনীতির অনুকরণই তখন ফ্রান্সের রেওয়াজ হয়ে উঠেছিলো, তাই ইংরেজি রীতিতে বাগান সাজানোর পরিকল্পনা ছিলো আমার। বাগানের মাঝখানে একটি ছোট্ট মন্দির তৈরি করবো, তার মধ্যে থাকবে বুশারদোঁর করা গ্রীক দেবতা

এরোসের একটি মূর্তি, মন্দিরটার নাম দেবো, 'প্রেম মন্দির'।

আমার স্বামীরও যেন পরিবর্তন হচ্ছিলো। রাজকীয় হাবভাবগুলো তিনি ত্যাগ করে ফেলছিলেন। চাকরদের সঙ্গে ঘরের মেঝেতে কুস্তি লড়তেন তিনি। প্রায়ই ওদের হারিয়ে দিতেন। সব কিছুতেই উনি ছিলেন আমার প্রতিবিন্দু। আমার অপব্যয়ে অভিযোগ তুলতেন না কিন্তু টাকা এত মেপে মেপে খরচ করতেন যে, ওঁকে কৃপণ বলে অভিহিত করা যায়। ওঁর ক্ষিধে ছিলো প্রচণ্ড। প্রাতরাশের টেবিলে একদিন খেলেন একটা মুরগী ও চারটে কাটলেট, কয়েক টুকরো শুয়োরের মাংস, ছটা ডিম আধ বোতল শ্যাম্পেনের সঙ্গে। ওপরের ঘরে পেটাই কারখানায় আগের মতোই কাজে লাগাতেন নিজেকে। তালা তৈরি করা ওঁর নেশা ছিলো। গেমেঁ নামে একজন মিস্ত্রিকে ওখানে নিয়োগ করেছিলেন। এই লোকটা ওঁকে কোনদিন রাজা বলে ভাবতো না, ভাবতো নিজের একজন সহকর্মী বলে, সেরকম হাসি ঠাট্টা চালাতো ওঁর সঙ্গে। আর লুই যেন তাতে প্রচুর আমোদ উপভোগ করতেন।

স্বামীর কাছ থেকে দিন দিন কত দূরে সরে যাচ্ছি—তার প্রতি আমার চোখ ঘুরিয়ে দিলেন দু দ্য লুজঁা। প্রিন্সেস দ্য গুইমিনির কক্ষে একটি ভোজসভায় লুজঁা এলেন অপূর্ব সামরিক পোশাকে সেজে, শিরস্ত্রাণে শোভা পাচ্ছিলো জাঁকজমকপূর্ণ হিরণ পার্ময়র পালক। এমন সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওটা যে, প্রকাশ না করে পারলাম না। পরদিন গুইমিনি একজন লোক পাঠালেন আমার কাছে একটি পালক নিয়ে, চিঠিতে লিখলেন পালকটি পাঠিয়েছেন দু দ্য লুজঁা, আমি যদি ওটা গ্রহণ করি ভদ্রলোক ভারি খুশি হবেন। বিব্রত বোধ করলাম, ওটা গ্রহণ না করলে ভদ্রলোক গভীরভাবে আঘাত পাবেন। ভেবে নিলাম একবার পরেই ওটা সরিয়ে রাখবো। মঁসিয়ে লিওনার্দ ওটা কুন্তল সজ্জায় কাজে লাগালেন। লুজঁা সেটা প্রত্যক্ষ করে আনন্দে ঢলে পড়লেন। পরদিন আমার কক্ষে এসে তিনি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। মাদাম কঁপাঁ তখন আমার পরিচারিকা ছিলেন। সাক্ষাৎ করতে রাজি হলাম।

লুজাঁ জানালেন আমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চান তিনি। মাদাম কঁপাঁকে ইশারা করলাম। সামনের ঘরে ঢুকে দরজা খোলা রেখে দিলেন তিনি, জানতেন যে কোন পুরুষের সঙ্গে একা থাকা আমার সম্ভব নয়।

কঁপাঁ সরে যাবার পরই লুজাঁ নতজানু হলেন আমার হাঁটুর কাছে, আমার দুহাতে গাঢ় উত্তেজনায় চুমু খেতে লাগলেন। 'খুশিতে ভরে গেছে আমার মন, যখন আপনি আমার পাঠানো পালকটি পরেছিলেন।' বলতে লাগলেন তিনি। 'এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করে থেকেছি। আপনি আমাকে করে তুললেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ…'

'থামুন! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন মঁসিয়ে দ্য লুজাঁ?'

পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, মুখের সব রক্ত যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে তাঁর। 'মহামান্যা রানী কি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেননি ওই ইশারার মাধ্যমে…'

'থামুন, আপনাকে বরখাস্ত করা হলো।' আমি বললাম।

'কিন্তু—মহামান্যা…'

'আপনি যাবেন কিনা মঁসিয়ে দ্য লুজাঁ? এক্ষুনি…। মাদাম কঁপাঁ এখানে আসুন।'

কঁপাঁ একটুও দেরি করলেন না। নমস্কার করে বিদায় নেওয়া ছাড়া লুজাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিলো না। 'ওই লোকটা আর কোনদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না।' মানসিক অস্থিরতায় কাঁপতে লাগলাম। যুগপৎ ক্রুদ্ধ আর সতর্ক হয়ে উঠেছি। জানি, দোষটা সম্পূর্ণ আমারই। একজন প্রগলভা নারীর মতো আচরণ করেছি আমি। বোকার মতো ওর পাঠানো পালক আমার মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু এসব মূর্খরা কেন বোঝে না যে, ওটা আমার নিছক আমোদ!

লুজাঁ আমাকে কখনই ক্ষমা করেনি। আমার প্রতি ওর বিদ্বেষের অন্ত ছিলো না। প্রেমিক হতে না পারলেও শত্রু হতে ওর কোন বাধা ছিলো না। এবং তাই হয়েছিলো সে—ভবিষ্যতে, যখন আমার সত্যিই বন্ধুর দরকার হয়ে পড়েছিলো।

সময়ে সময়ে রানীর জীবন বড়ই ক্লান্তিকর মনে হতো আমার। তখন যেতাম ত্রায়ানোতে। কিন্তু এককে সময় সেখানেও তিষ্ঠোতে পারতাম না, মনে হতো অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। সম্পূর্ণ একা একা। কিন্তু যাই করি, সেটাই তো অনুষ্ঠান হয়ে উঠতো। আমি যে রানী। ঘোড়ায় চড়তে গেলেও সঙ্গে চলতো কোচম্যান আর পদাতিক রক্ষিবাহিনী।

একবার গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাবার সময় দেখছিলাম আশেপাশে ছেলেমেয়েরা কেমন খেলে বেড়াচ্ছে। সুন্দর সুন্দর বাচ্চারা, আমার নিজের বলে যাদের ভাবতেও ভালো লাগে। গ্রামের রাস্তা ধরে চলার সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে এসে প্রায় ঘোড়ার খুরের নীচে পড়ে যাচ্ছিলো। চিৎকার করে উঠলাম, কোচম্যান গাড়ি থামালো, বাচ্চাটা রাস্তার ওপর পড়েছিলো। 'ওর লাগেনি তো?' গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম। পদাতিক রক্ষীদের একজন ওকে টেনে তুলতে গেলে ছেলেটা সশব্দে কেঁদে উঠলো। 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

আনা হলো। পুরনো জামা কাপড় পরনে কিন্তু অপরিচ্ছন্ন নয়। আমার কাছে এসে ওর কান্না থামলো, অবাক চোখে দেখতে লাগলো আমাকে। বড় আর নীলচে চোখ, ওর চুল হালকা রঙের আর কোঁকড়ানো। মনে হচ্ছে যেন ছোট্ট একটি স্বর্গীয় প্রাণী।

'তোমার লাগেনি তো সোনা?' বললাম। 'আমাদের ভয় পেও না?'

পাশের কুটির থেকে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো। সঙ্গে এই বাচ্চাটির থেকে বয়সে বড় আরও দুটি বাচ্চা। 'বাচ্চাটি…' বলতে গিয়ে ও আমার দিকে অবাক চোখে তাকালো। বোধ হয় আমাকে চিনে উঠতে পারেনি। 'জ্যাকোয়েস, ওখানে কি করছিস্?'

আমার কোলে বসা বাচ্চাটি ওর দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিলো, আমার কাছে আরও ঘন হয়ে এলো। ওতেই মনস্থির করে ফেললাম। এটি আমার। ভগবান আমার কোলে তুলে দিয়েছেন। স্ত্রীলোকটিকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম। 'তুমি কি এর মা?'

'না, মাদাম, ওর ঠাকুমা। ওর মা মানে আমার মেয়ে, গত শীতে মারা গেছে। আমার ওপর দিয়ে গেছে পাঁচপাঁচটি ছেলেমেয়ের দায়িত্বভার।'

'এই জ্যাকোয়েসকে আমি নিতে চাই। ওকে পুষ্যি নেবো আমি। নিজের ছেলের মতো ওকে বড় করে তুলবো।'

'ও তো সবার চেয়ে দুষ্টু। বরং অন্য একটা…'

'এই আমার। আমাকে দাও একে, এতে খেদ করার কোন কারণ ঘটবে না তোমার।'

'মাদাম, আপনি তো…'

'আমি রানী' বলতেই জড়োসড়োভাবে অভিবাদন জানাতে গেলো ও। 'তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে।' বললাম। কৃতজ্ঞতার জলে ওর দুচোখ ভরে যেতে দেখে আমার চোখও শুকনো রইলো না। 'এই ছোট্ট ছেলেটি আমার নিজের সন্তানের মতোই আদরযত্ন পাবে।'

শুনেই ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। 'আমি রানী চাই না, আমি মারিয়াঁর কাছে থাকতে চাই।'

'মারিয়াঁ ওর বোন, মাদাম। ভীষণ বাড়িমুখো এই ছেলেটা। দেখবেন, আপনার কাছ থেকে পালিয়ে আসবে।'

ওকে চুমু খেলাম। 'না, পালাবে না আমার কাছ থেকে।' ছেলেটা কিন্তু ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। কঁপাকে বললাম বুড়ির ঠিকানা টুকে রাখতে। প্রাসাদের দিকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলাম।

ছোট্ট জ্যাকেয়েস সারাটা পথ হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো যে, সে থাকবে মারিয়াঁ এবং তার ভাই লুইয়ের কাছে। কত সান্ত্বনা দিতে লাগলাম ওকে, কিন্তু ছেলেটা সমানে বলতে লাগলো, 'আমি মরিয়াঁর কাছে যাবো।'

প্রাসাদে ফিরে এলে, আমার কোলে একটি ক্রন্দনরত চাষীর ছেলে দেখে তো সবাই অবাক। রানীর সর্বশেষ বোকামি বলে ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করলো ওরা। গ্রাহ্য করলাম না। নিজের নাড়ীছেঁড়া না হলেও একটি ছেলে তো পেয়েছি। তক্ষুনি একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করলাম।

ওকে নিয়ে পরম সুখের মুহূর্তগুলো কাটতে লাগলো আমার।

পোশাকে-আশাকে সজ্জিত করার পর দেখা গেলো শিশুটি সত্যিই সুন্দর। ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। এবার আর আপত্তি উঠলো না ওর তরফ থেকে। অদ্ভুত সুন্দর দুটি নীল চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর বিছিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, 'মামণি।'

ওকে আরমাঁদ নামে ডাকতাম। এটা ওরই পারিবারিক নাম। প্রত্যেকদিন সকালে ওকে আমার কাছে নিয়ে আসা হতো। আমার বিছানার ওপর উঠে বসতো সে। একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতাম, মাঝে মাঝে খানাও। রাজাও যোগ দিতেন আমাদের সঙ্গে, উনিও ক্রমশ ওকে বেশি স্নেহ করছিলেন।

আমার কিন্তু মাথায় আসেনি যে শিশুদের আবেগ অত্যন্ত গভীর হয়, এমন কি বয়স্কদের চেয়েও গভীর।

কারও মনে কোন দ্বিধা ছিলো না যে, স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সন্তোষজনক নয়। স্বামী অবশ্যই আমার প্রতি খুবই নরম মনোভাব পোষণ করতেন কিন্তু আমার চেয়ে অন্যদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতেন উনি। ওঁর সেই মিস্ত্রি গেমে ওঁর সময়ের অনেকখানি দখল করে নিতো। রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। ওঁর হাবভাবে এটা অস্পষ্ট ছিলো না যে, আমার প্রতি উদার মনোভাব দেখানো, আমার অত্যধিক খরচের রাশ টেনে না ধরা, আমার দেনা শোধ করা, তার প্রতিবিধানে ওঁর নিজের কার্পণ্য, এমন কি একটি চাষীর ছেলেকে এনে লালন পালন ইত্যাদি সব কিছুকে মেনে নিলেও রাজনীতিতে আমার নাক গলানোতে ওঁর এতটুকু ঔৎসুক্য নেই। তাই আমার মা এবং আমার প্রকৃত হিতৈষিদের যেমন—ভেরমঁ, মার্সি, কৌনিজ, অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছিলো। সারা ইউরোপে মার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলো প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক, যিনি নিজেকে বলতেন, 'ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট,' আর মা বলতেন, 'দানব।' সেই ফ্রেডরিক সব অঞ্চলেই গুপ্তচরের জাল বিছিয়েছিলেন। আমাদের বিয়েকে সম্পূর্ণতায় নিয়ে আসার ক্ষমতা যে রাজার নেই—এই খবরও ওঁর অজানা ছিলো না। ভেবেছিলেন

একজন চপলা নারীর পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, একজন অভিজ্ঞা নারী হয়তো সেটা সম্ভব করে তুলতে পারবে। সেই নারী হলো একজন নামকরা অভিনেত্রী, লুইস কঁতাৎ। এই সুন্দরী, লাস্যময়ী, প্রচণ্ড যৌন আবেদনে প্রমত্তা মহিলাকে ফ্রেডরিক পাঠালেন ফ্রান্সের রাজার মন হরণের জন্যে। ভেরমঁ আর মার্সির সৌজন্যে আর সতর্কতায় ব্যাপারটা অগোচর ছিলো না আমার। কিন্তু আমি একান্তই নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, আমার স্বামী কোনদিন অবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন না।

তবু একটা কিছু তো করতেই হবে। জানতে পারলাম ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে আমার ভাই জোসেফ শিগগির পারীতে এসে পৌঁছচ্ছেন।

॥ সাত ॥

খবর পেলাম যে আমার দাদা পারীতে এসেছে এবং অস্ট্রিয় দূতাবাসে উঠেছে। মার্সি তার দেখাশোনা করছে। মনে মনে খানিকটা অস্বস্তি যে বোধ করছিলাম না তা নয়। মা তিরস্কার করে যে সব চিঠি আমাকে দিয়েছেন, অস্ট্রিয়ার সম্রাট আর সম-শাসক হিসেবে কিছুই তো দাদার অজানা থাকার কথা নয়।

ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ফ্রান্সে আমার আসার দিন, যখন আমাকে বিদায় দেবার জন্যে আমার সঙ্গে খানিকটা এসেছিলো। এখন নিজের পরিবারের একজনের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় আমি যুগপৎ আনন্দিত অথচ চিন্তিত হয়ে উঠছিলাম।

জোসেফ অবশ্য আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলো যে, ওর আগমনকে কেন্দ্র করে যেন কোন জাঁকজমক না হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের পরিচয়ে দেশভ্রমণে বেরোয়নি ও, নাম নিয়েছে কাউন্ট ফলকেনস্টেন। পারীর দূতাবাসে এসেছে খোলা গাড়িতে, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে।

অনুমান করেছিলাম যে, আমার ব্যয়বাহুল্যের জন্যে ওর বকুনি খাবো। ওর মানসিকতার দিক থেকে এটা খুবই নিন্দনীয়। নিজেকে অপরিচিত রেখে জনগণের সেবা করাই ওর লক্ষ্য বলে প্রচার করে ও। কিন্তু হিংস্রুটে লোকেরা বলে প্রথম প্রথম নিজের পরিচয় গোপন রাখলেও বেশিদিন তা রাখতে চায় না ও। নিজের পরিচয় কাউকে দিয়ে কৌশলে প্রকাশ করিয়ে নেয়, আর নাটকীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, 'হ্যাঁ, আমিই সম্রাট।'

বিশ্বাস হয় না আমার। বোধ হয় ওই হিংস্রুটেদের অপপ্রচার এসব। যদিও ওর বিদায়ের পর আর অতটা জোর ছিলো না আমার মনে। বস্তুতঃ, ছদ্মবেশে থাকার ব্যাপারটাই কেমন যেন ক্লান্তিকর। দূতাবাসে থাকারই বা দরকার কি ওর! আবার জানিয়েছে ভার্সাই থাকার সময়ে প্রাসাদে অথবা ত্রায়ানোতে থাকতে চায় না। শহরে দুটি সুসজ্জিত ঘরের ব্যবস্থা করা চাই, সেখানে সাধারণ হিসেবে দিন কাটাতে চায় ও।

সকাল নটায় সবে স্নানের ঘরে ঢুকেছি। মাথার চুল খোলা, কাঁধের ওপর ঝুলছে। মঁসিয়ে লেওনার্দ তখনও এসে পৌঁছননি। এমন সময় উঠোনে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। শুনলাম অ্যাবেই ভেরমঁ অন্য একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেই ভদ্রলোকটি অতি সাদাসিধেভাবে সরাসরি আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখেই বিস্মিত উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, 'আরে, এ যে আমার দাদা জোসেফ!' আমার যা স্বভাব, সব ভুলে গিয়ে ওকে নিয়ে পড়লাম। যেন সেই অতীতের শৈশবে ফিরে গেছি। জোসেফও উদ্বেল হলো, আমাকে আলিঙ্গন করলো, ওর দুচোখে অশ্রু দেখা দিলো। 'ছোট্ট বোনটি আমার, সুন্দরী ছোট্ট বোনটি আমার!'

'জোসেফ, তোমাকে দেখতে পাওয়া কি যে সৌভাগ্যের! কতদিন যে হয়ে গেলো—তোমার, আদরের মার আর আমাদের বাড়ির কথা কত যে ভেবেছি…'

জার্মান ভাষায় অনর্গল বকবক করে যাচ্ছিলাম, কেমন অবচেতনতায়

শৈশবের স্মৃতিতে ফিরে গেছি। জোসেফও বললো যে, আমাকে কাছে পেয়ে ওর ভারি ভালো লাগছে। দুজনের মনে কত কথা যে জমে আছে আমাদের! মা কেমন আছেন? স্কুনব্রুনের বাগানটা এখন কেমন দেখতে হয়েছে? ফোয়ারাগুলো আগের মতো রয়েছে কিনা, এমন কত ছেলেমানুষী প্রশ্ন করতে লাগলাম ওকে। জোসেফও আমার সঙ্গে সমানতালে কথা বলতে লাগলো। এক ঘণ্টারও বেশি সময় এসব আজেবাজে কথা বলার পর জোসেফ সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ওঠালো যার জন্যে ওর এতদূর ছুটে আসা।

এতক্ষণে ওর দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেরালাম। পোশাক পরিচ্ছদে ওকে একটুও সম্রাটের মতো দেখাচ্ছে না। ছোট মাপের জুতো ওকে যেন একেবারে সাধারণ করে তুলেছে, চুলের সজ্জাও তাই। একটু যেন ঝুঁকে গেছে ও, সারা মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। 'তুই ভাবছিস, আমাকে দেখতে রাজার মতো মনে হচ্ছে না, তাই না?'

'আমি তো আমার দাদা জোসেফকে দেখছি। সম্রাটকে নয়।'

'আমি সহজ সরল মানুষ, সাদাসিধে ভাবে থাকতেই ভালবাসি। এখন তোর সঙ্গে একদম একলা থাকতে চাই আমি, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

'তোমাকে এখন রাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন তিনি।'

'সে সব যথাসময়ে হবে। যে সব কথা কানে এসেছে আমার, তোর কাছ থেকে আগে সেগুলোর যাথার্থ্য জেনে নিতে চাই। তোকে সোজাসুজি সত্যি কথা বলতে হবে, তার জন্যেই আমার ভার্সাই আসা। কিছুই গোপন না রেখে আমাকে সোজাসুজি বলবি।'

ওকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

'সারা ইউরোপে তোর বিয়ের কথা সোচ্চার। এটা কি সত্যি যে, রাজার কোন যৌন ক্ষমতা নেই?'

'সত্যি।'

'যদিও সন্তানোৎপাদনে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই।'

'তাই।'

'ডাক্তাররা নাকি পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন যে, স্বাভাবিক করে তুলতে হলে ওঁর ওপর ছুরি চালাতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ অস্ত্রোপচারে নাকি ওর ভীষণ ভয়?'

'হ্যাঁ।'

'হুঁ, কিন্তু ওকে দিয়ে যে এটা করাতেই হবে!'

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো জোসেফ। ওর হাবভাবে ফুটে উঠলো সম্রাটের গাম্ভীর্য। ওকে আর সর্বসাধারণের একজন বলে একটুও মনে হচ্ছে না। আরও অনেক অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করলো, আমিও সত্যি কথা বললাম। বললো 'আমি ঠিক সময়েই এসেছি।'

একটা চাকরকে দিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠালাম যে, আমার দাদা প্রাসাদে এসেছে এবং তাকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে চাই। জোসেফকে নিয়ে স্বামীর কাছে গেলাম, লুইও চটপট দরজার কাছে এসে জোসেফকে আলিঙ্গন করলেন।

লুই, দাদার থেকে মাথায় লম্বা, দেখতেও অনেক সম্ভ্রান্ত। কিন্তু জোসেফের হাবভাব বড়দাদার মতো। ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতে চাইলে কি হবে, জোসেফের ব্যবহারে যেন প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিলো—অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে সে ফ্রান্সের রাজা থেকে উঁচু মনে করে। লুইয়ের পোশাক এখন লাল ভেলভেটের কারণ পর্তুগালের রাজার মৃত্যুতে শোক পালন করছেন তিনি। রীতিমাফিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর লুই জোসেফকে রাজপ্রাসাদে থাকার অনুরোধ জানালেন।

'না ভাই,' জোসেফ হাসলো। 'সাধারণ মানুষের মতো দিন কাটাতে চাই আমি। ভার্সাইতে যে বাসস্থান ঠিক করা হয়েছে, সেটা খুবই পছন্দ আমার।'

'কিন্তু এখানকার মতো আরামের ব্যবস্থা তো ওখানে নেই।'

'আরামের দিকে আমার নজর নেই, তোমাদের মতো ওতে তেমন অভ্যস্তও নই আমি। আমার যা দরকার তা হলো একটা ক্যাম্পখাট ও

একটা ভালুকের চামড়া।'

রাজপরিবারের লোকজনের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় হওয়া দরকার বলে রাজা ওকে জানালেন। কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গেও, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে ছ্য মরেপার সঙ্গে। জোসেফ আনন্দের সঙ্গে রাজি হলো। সারা সকাল কাটলো পরিচয় পর্বে। চুল বাঁধা হয়নি বলে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তার সময়ও অবশ্য ছিলো না।

আমার শোবার ঘরে বসে তিনজনে খাওয়াদাওয়া সারলাম। কোন অনুষ্ঠান চলবে না, জোসেফের দাবী। এখানেও অস্বস্তি। বিশেষ করে লুই এবং আমার। এভাবে মধ্যাহ্ন ভোজনে অভ্যস্ত নই আমরা।

পরের কয়েকদিন তিনজনের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হলো। ফ্রান্সে জোসেফের আগমনের তিনদফা উদ্দেশ্য ছিলো। চপলতার জন্যে আমাকে সাবধান করে দেওয়া, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করে তোলা এবং আমাদের বিয়ের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা ও তার প্রতিকার করা। জোসেফের ধারণা তিনটে উদ্দেশ্যই সফল করার ক্ষমতা ওর আছে।

প্রথমের দিন কয়েক গেলো এতদিন বাদে ভাইবোনের দেখা হওয়ার আবেগের মধ্যে। ফরাসী রাজসভার অমিতব্যয়িতাও জোসেফের নজর এড়ালো না, এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশেও কোন দ্বিধা দেখা গেলো না ওর মধ্যে।

দ্বিতীয় দিনে এলিজাবেথের কক্ষে রাজপরিবারের সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত হলো জোসেফ। আমার ইচ্ছে ছিলো এলিজাবেথের দিকে ওর একটু নজর পড়ুক, কারণ আমার এই ননদটি দেখতে যেমন সুন্দরী, স্বভাবেও তেমনি মিষ্টি। জোসেফেরও একটি স্ত্রী দরকার। হুটি অসুখী বিয়ের অভিজ্ঞতা ওর আছে, ওর একমাত্র সন্তানেরও মৃত্যু হয়েছে। ও হলো অস্ট্রিয়ার সম্রাট, ওর দরকার একজন উত্তরাধিকারীর। অবশ্যই আরতোঁ জোসেফের আড়ালে ওকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে কারণ আরতোঁ এবং প্রোভাঁসের ধারণা জোসেফ তেমন মার্জিত-রুচি নয়।

কিন্তু খাবার টেবিলে ওরা কেউই তেমন সহজ হতে পারলো না।

পরে ওকে বলেছিলাম, 'দেখলে, এলিজাবেথ কেমন ডাগর হয়ে উঠেছে।' 'ফ্রান্সের রাজা যদি কোন সম্পূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠতো, আমার বেশি ভালো লাগতো।' জোসেফের কড়া জবাব।

জোসেফকে পেতি ত্রায়ানো দেখাবার বাসনা ছিলো আমার। পরদিন ওখানে নিয়ে গেলাম ওকে। সঙ্গে দুজন মাত্র পরিচারিকা। বললাম, 'ত্রায়ানো হলো আমার বিশ্রামাগার এবং এখানে আমি সাদামাটা থাকতেই ভালবাসি।' খুবই অহমিকার সঙ্গে ওকে আমার বাগানে নিয়ে গেলাম, যার তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

জোসেফের মধ্যে কোন ঔৎসুক্য জাগলো না। উল্টে ওর বাক্যবাণ শুরু করলো—আমি কি বুঝতে পারছি না নিজেকে আমি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি? এমন সব নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করছি যাদের চরিত্র আলোচনার উর্ধ্বে নয়। 'তুমি বুদ্ধিহীনা, আমোদ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে শেখোনি।'

'সময় তো কাটাতে হবে আমার।'

'সেটা সৎকাজে কাটাতে পারো তো।'

'আমার যদি ছেলেপিলেও থাকতো…'

'তাই। সব কিছুর মূল হলো সেখানে। কিন্তু স্বামীর প্রতি তোমার আচরণ আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে।'

'ক্ষুব্ধ করেছে?'

'স্ত্রী হবে স্বামীর অনুগতা। তোমার মধ্যে ওকে সুখী করে তোলার চেষ্টার অভাব রয়েছে। ওর প্রতি তোমার অনুরাগ দেখানো উচিত। নিজের খামখেয়ালী ছেড়ে ওকে তোমার খুশি করার চেষ্টা করা উচিত।'

'আমার রুচির সঙ্গে ওঁর রুচির এতটুকুও মিল নেই।'

'ওর রুচিকেই তোমার রুচি বলে মনে করা উচিত।'

'ওর লোহাপেটানোর কারখানায় যেতে বলছো আমায়? বলছো ওর মতো তালা তৈরি করতে, নাকি ননদের সঙ্গে কুস্তি করতে? রাজার রুচি মতো চলা একেবারে অসম্ভব আমার পক্ষে।'

'না, না। এসব করার দরকার নেই। কিন্তু আরও অনুগতা হতে

বাধা কোথায় তোমার ? ওর সঙ্গ পেলে তুমি যে খুশি হয়ে ওঠো, তাও তো দেখাতে পারো। ওকে স্বাভাবিক করে তোলার কাজে তোমার অবদান হতে হবে অনেক।'

চুপ করে রইলাম। জোসেফ বকেই চললো। সারারাত ধরে আমার নাচার ঘটা, আমার জুয়ার প্রবণতা, আমার বন্ধু খোঁজার বিদ্‌ঘুটে স্বভাব, আমার অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি নিয়ে।

'নিজেকে শুধরে নেবো আমি।' ক্ষীণগলায় বললাম।...

লুইয়ের ওপরও বাক্যবাণ চালাতে কার্পণ্য ছিলো না ওর। 'রাজার উচিত প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা, ছদ্মবেশে ওদের মধ্যে চলাফেরা করা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশলেই তো ওদের দুঃখ কষ্টের, কঠিন জীবনযাত্রার হদিস রাজার নজরে আসবে।'

পারীর অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার আকর্ষনই তীব্র ছিলো জোসেফের কাছে। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে দেখা করলো সে। এমন কি মাদাম দু বারিও বাদ গেলেন না। জোসেফ বোধ হয় এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলো, ওর মধ্যে কোন ইতরতা নেই, আভিজাত্যের অন্ধতাও নেই। অথচ অস্ট্রিয়ার এককালীন বন্ধু দু দ্য চোয়াস্যুর সঙ্গে দেখা করলো না। এর মধ্যে সময় করে আমাদের গেরস্থালী মেরামতেও হাত লাগালো। আমাকে বকাঝকাও নিত্যকারের ব্যাপার, আমার দেওররাও ওর মন্তব্যের শিকার হলো।

কিন্তু ওর এ জাতীয় সবজান্তা মনোভাব আমাদের সবাইকে ক্লান্ত করে তুললো। তবু একটা ব্যাপারে জোসেফের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। লুইকে ও বারবার বুঝিয়েছে যে, ওঁর যৌন অক্ষমতাই সব জটিলতার কারণ। যৌন ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে যা করা উচিত লুই যেন বিনা আপত্তিতে তা করে। লুইকে ও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো যে, এই ব্যাপারে করণীয় ব্যবস্থা উনি গ্রহণ করবেন।

মে মাসের শেষের দিকে বিদায় নিলো জোসেফ, এক মাসেরও বেশিদিন আমাদের মধ্যে কাটিয়ে।

ওর বিদায় নেবার পরমুহূর্তে আমার স্বামী বলেছিলেন, 'জোসেফের

জন্যেই এই সময়টুকুতে আমরা দুজনে অনেক বেশি সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি, এর জন্যে ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এমন অকৃপণ অন্তরঙ্গতা লুইয়ের কণ্ঠে কখনও ফুটে উঠতে দেখিনি। ওর দু চোখের দৃষ্টিও কেমন একটা অজানা প্রতিশ্রুতির আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠেছিলো।

জোসেফ জানতো আমি বুদ্ধিহীনা, হাল্কা-মনের আর চঞ্চলা। দীর্ঘ দিনের জন্যে কোন গভীর চিন্তাকে লালন করার মানসিকতা আমার নেই। আমার স্মৃতি-শক্তিও দুর্বল। তাই যাবার আগে ওর অমূল্য উপদেশমালা লিখিতভাবে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো। আমি যেন সময় পেলেই সেগুলো পড়ি। তাহলে নিজেকে খানিকটা আমি চিনতে পারবো।

সেই উপদেশমালার বিস্তার অনেকখানি, বেশ কয়েকপাতা জুড়ে। আমার আচরণ আর চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা ছিলো ওতে। আমার অমিতব্যয়িতা, জুয়ার প্রতি আকর্ষণ, সব সময় আমোদ আহ্লাদের পেছনে দৌড়নো, স্বামীর প্রতি ঠাণ্ডা ব্যবহার, প্রেমহীনতা, স্বামীর রুচির সঙ্গে মেলে না বলে ওঁকে দূরে সরিয়ে রেখে নচ্ছার চরিত্রের নারী-পুরুষের সঙ্গে নিরন্তর মেলামেশার প্রবণতা ইত্যাদি বদ্ দোষের ধারক হয়ে আমি নিজের ভবিষ্যতের মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করছি। সাবধান আর সতর্ক হবার এখনও সময় আছে আমার হাতে। এসব একান্তভাবেই বর্জন করতে হবে আমাকে। নইলে অমঙ্গলের যে বজ্র আমার মাথার ওপর নেমে আসবে তাতে আমার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। আরও একটা শাণিত বাক্য ব্যবহার করেছিলো জোসেফ। 'বিপ্লব একটি অতি নিষ্ঠুর সত্য এবং সম্ভবত সেটা তোমার নিজের হাতেই তৈরি হয়ে উঠছে।' সে কথার তাৎপর্য সেদিন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ওর লেখা থেকে শব্দগুলো যেন লাফ মেরে উঠে আমার চোখের সামনে ভাসছে, লাল কালিতে লেখা, যা রক্তের রঙ।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, সব ছাড়তে হবে আমাকে।

চেষ্টার ত্রুটিও করিনি। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গ পরিহার করে স্বামীর শিকার যাত্রার সঙ্গিনী হয়েছি, রাতে অপেরা নাচের আসরে যোগ না দিয়ে গভীর বিষয়ের ওপর কোন গ্রন্থের পাঠোদ্ধারে মন দিয়েছি। মাকে জানিয়েছি যে, নিজেকে শোধরাবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমি ব্যস্ত, সফল আমাকে হতেই হবে।

লুইয়ের মধ্যেও পরিবর্তনের হাওয়া বইছিলো। জোসেফের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মর্যাদা উনি ভোলেননি, অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছিলেন। সেটা সর্বপ্রকারে সফলও হয়েছিলো।

আমার খুশির সীমা রইলো না। মার কাছে তক্ষুনি লিখলাম, 'এমন সুখের অধিকারিণী হয়েছি যা সারাজীবনের একমাত্র কাম্য ছিলো।... আমার বিয়ে এখন সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। কাল দ্বিতীয় দফায় সেই প্রচেষ্টা চালানো হলো আর এটা প্রথমবারের চেয়ে বেশি সার্থক। ভেবেছিলাম আমার আদরের মামণির কাছে একজন বিশেষ দূত পাঠাবো কিন্তু ভয় ছিলো যে, এটা নানা ধরনের জল্পনা কল্পনার জন্ম দেবে।...এখনও আমার রক্তস্রোতে সন্তানের প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি, তবে যে কোন মুহূর্তে তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।'

স্বামীর পরিবর্তনও অবিশ্বাস্য। শুধু যে সুখী হয়েছেন তা নয়, তাঁর আচরণ হয়ে উঠেছে প্রেমিকের মতো। আমার সঙ্গে যেন সর্বক্ষণ কাটাতে উৎসুক উনি, আমিও ওঁকে ছাড়তে চাইছি না। নিজেকে অনুক্ষণ বলছি শিগগির আমার স্বপ্ন সার্থকতায় ভরে উঠবে। অন্য যে কোন মেয়ের মা হবার সম্ভাবনা যতটুকু, আমার ক্ষেত্রে তার একতিলও কমতি নেই। লুই জানালেন যে, জোসেফের কাছে ওঁর চিঠি লেখা একান্ত কর্তব্য। লিখলেনও তিনি।

সারা রাজসভা এই সংবাদে সরগরম হয়ে উঠলো। পিসিরা জোর করতে লাগলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা ওঁদের জানা দরকার। আদেলেদ তো উত্তেজনায় অস্থির, বোনদের সবকিছু জানালেন উনিই।

আদেলেদের কাছে লুইয়ের মন্তব্য, 'কি যে, অপার আনন্দের স্বাদ পেলাম! ভেবে যন্ত্রণা পাচ্ছি যে, জীবনের এতগুলো দিন এমন আনন্দের

আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়েই বরবাদ হয়ে গেলো আমার।'

রাজার মানসিক বিবর্তনে রাজসভার উন্মুখতার যেন শেষ নেই। সবাই সতর্ক হয়ে কান পেতে রয়েছে রাজপরিবারে নতুন ভ্রূণের আবির্ভাবের সংবাদের জন্যে। প্রোভাঁস আর তার স্ত্রীর ঈর্ষাকাতর চোখের দৃষ্টি নজর এড়ালো না আমার, আরতোঁ প্রোভাঁসকে উত্তেজিত করার ভূমিকায় নামলো, কিন্তু কোন কিছুই গ্রাহ্য করলাম না আমি। সেই দিনটির জন্যে সমস্ত সত্তা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম যখন ঘোষণা করতে পারবো যে, আমি মা হতে চলেছি।

আশায় আশায় দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। জোসেফের নির্দেশ মতো স্বামীর পরিচর্চায়ও মন দিলাম। লুইও সে দিক থেকে পিছিয়ে রইলেন না। অবশেষে তুজনের আকাঙ্খা একটি শীর্ষবিন্দুতে এসে পৌঁছলো। স্বপ্ন দেখলাম আমার ছোট্ট রাজকুমারের, ওকে কোলে পেলে জীবনের কাছে আর কিছু চাইবার থাকবে না আমার। ভেতরে ভেতরে সেই একান্ত আকাঙ্খার আগুনের তীব্রতায় জ্বলতে লাগলাম।

সারা বছরটাই আশায় আর স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেলো। ভাবতে শুরু করলাম ব্যাপারটা কখনই ঘটবে কিনা। প্রত্যেক দিন সকালেই ছোট্ট আরমাদকে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলি, ওর সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হই। বড্ড আতুরে হয়ে উঠছে ছেলেটা। ভাসা ভাসা নীল চোখ তুটি আবার এমন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে যে, ওকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হই। কিন্তু ওকে দেখলেই নিজের সন্তান স্পৃহা বেড়ে যেতে থাকে আমার।

মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যেতে লাগলো আমার। পুরনো পদ্ধতি-গুলো আবার ধরতে লাগলাম নিছক সান্ত্বনা পাবার জন্যেই। আরতোঁ তো আমার পাশে ছিলোই, আমার আগেকার আমুদে সত্তাকে পুনরুদ্ধার করতে সে বদ্ধপরিকর। আবার ছদ্মবেশে অপেরায় যাবার প্রস্তাব এলো ওর কাছ থেকে।

কার্নিভালের সময় ওটা। যাবার ইচ্ছে আমার ষোল আনা কিন্তু

স্বামী যখন জিজ্ঞেস করলেন আমি যাচ্ছি কিনা, সোজা না বলে দিলাম এই ভেবে যে, উনি হয়তো চান না আমি যাই। উনি বললেন যে, আমার আমোদ প্রমোদে বাধা দিতে চান না উনি। সুতরাং আবার নাচের আসরে নেমে পড়লাম। দ্য গুইমিনির কক্ষে গিয়ে বড় বাজিতে খেলাও শুরু করে দিলাম। জোসেফের সাবধান বাণী ভুলতে সময় লাগলো না।

সন্তান লাভের আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, হঠাৎ মনে হলো আমি সন্তানসম্ভবা হতে চলেছি। এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে, স্বাভাবিক কর্মসূচীতে ছেদ পড়ার উপক্রম হলো। হয়তো ভুলও হতে পারে আমার, তাই ঠিক করলাম নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কিছু জানাবো না। অসুস্থতার ভান করে নিজের ঘরে বন্দী করলাম নিজেকে, যাতে সর্বক্ষণ সন্তান স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

শরীরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম। না, এখনও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। স্নানঘরে ঢোকা আর বেরিয়ে আসাটা খুবই সাবধানে করতে লাগলাম যাতে পা ফসকে পড়ে না যাই। কয়েক সপ্তাহ আমার এই গোপনীয়তা বজায় রাখলাম, ভেতরে ভেতরে নিশ্চিন্তও হলাম। সন্তানের আবির্ভাব যেন অনুভবের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বামীকেই জানানো উচিত সর্বপ্রথম। এমন উত্তেজিত বোধ করছি যে, কেমন করে কথাটা পাড়বো তাই ভেবে উঠতে পারছি নে। জানি, উনিও আবেগের জোয়ারে ভেসে যাবেন। আমার মতো ওঁরও সন্তান স্পৃহা কি কিছু কম?

ওঁর ঘরে গেলাম, আধা হাসি, আধা কান্নায় ভরে গিয়ে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন, কিছুটা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। হাসিহাসি গলায় বললাম, 'প্রভু, আমি এসেছি আপনার জনৈক প্রজার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে।'

'মানে! কি হলো?' উনি অবাক।

'আমাকে লাথি মেরেছে।'

'লাথি মেরেছে?' ওঁর গলায় অবিশ্বাস আর ভয় যেন একসঙ্গে বেজে

উঠলো : 'কে লাথি মেরেছে ? কোথায় মেরেছে ?'

হাসিতে ফেটে পড়লাম। 'আমার গর্ভের মধ্যে। সে এখনও ছোট, তাই আশা করছি রাজামশায় ওর ওপর কঠিন হয়ে উঠবেন না...'

আমার দিকে তাকালেন, সারা মুখে বিস্ময়। সন্তানের লাথি দেবার সময় আসেনি এখনও, কিন্তু সে স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমার সত্তা।

'সত্যি ?' স্বামীর আকুল প্রশ্ন।

'হ্যাঁ গো।'

আমাকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিলেন উনি। কয়েকটি বিস্ময়-বিহ্বল মুহূর্ত কেটে গেলো। অন্তহীন সুখের অন্তরে আমরা প্রবেশ করলাম অথচ দুজনের চোখেই জল।

মাকে লিখলাম,

'মাদাম, আদরের মামণি আমার, আমার প্রথম আবেগ যা গত কয়েক সপ্তাহ আমাকে অস্থির করে তুলেছে, তাহলো আমার আশা সম্পর্কে তোমাকে জানানো। থেমেছি শুধু এই ভেবে যে, আশা যদি ছলনাময়ী হয়ে ওঠে, তোমার বিষণ্ণতার অবধি থাকবে না। এমনও মনে হয়—এটা বোধ হয় নিছক স্বপ্ন, তবু স্বপ্নের ঘোরটা থাকেই কিন্তু এবার মনে হয় আর সে সন্দেহের অবকাশ নেই...'

ভার্সাই এবং ত্রায়ানোর বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছি, মৃদু অথচ নরম গানের আসরে গিয়ে বসছি, হাতে আমার সূচের কাজ। সন্তানের পরিচ্ছদ কেমন হবে তাই আমার ভাবনা। এমন মানসিক টানা-পড়েনে কাটছে যে, ওর আবির্ভাবের জন্যে আর যেন অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

সন্তানসম্ভবা বলে যে শারারিক ভাঙন শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিন্দু-মাত্র মাথাব্যথা নেই আমার। বরং সে-সবকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু সময় যে আর কাটতে চাইছে না। সন্তানের কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছি যেন।

প্রসবকাল ডিসেম্বর মাসে, গরমকালটা তাই অন্তহীন মনে হচ্ছে। এমন একটা ঘটনা তখন ঘটলো যা সাময়িকভাবে সন্তানের কথাও

ভুলিয়ে দিলো আমাকে।

আগষ্ট মাসের একদিন, বসেছিলাম জনাকীর্ণ বৈঠকখানায়, সঙ্গে ছিলেন আমার স্বামী, দেওর, জায়েরা। একটু ক্লান্তি বোধ করছিলাম। জানতাম যে, লুইয়ের চোখে চোখ পড়লেই উনি আসর ভেঙে দিতে সময় নেবেন না। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার চেয়েও ওঁর দুশ্চিন্তা বেশি।

তারপরই সেই ঘটনা ঘটলো। আমাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, স্বামী অথবা দেওরদের কেউই চিনতে পারেননি ওঁকে। কিন্তু আমি তো চিনি। সেই অসাধারণ আর অতি সুন্দর মুখের ওপর এক পলক তাকালাম, সোনালী চুল আর কালো চোখের সেই বৈপরীত্ব, যা সেই অপেরা গৃহে ছদ্মবেশে নাচার সময়ে প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম। 'আঃ,' আমি বলে উঠলাম, 'একজন পুরনো বন্ধুর দেখা পেলাম।'

'মাদাম।' আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালেন তিনি। আমার হাতে চুম্বন করলেন। নিজেকে ভারি সুখী মনে হচ্ছিলো আমার।

'কঁৎ ছ্য ফের্সেন!' অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম।

খুশি হলেন উনি। অন্যেরা সতর্ক চোখে আমাকে দেখতে লাগলো, যেমন ওদের বরাবরের অভ্যেস। ওদের চোখে জিজ্ঞাসা।

শেষবার দেখা হবার পর ওঁর পরিবর্তন সামান্যই। আমিও তো বদলেছি। দুজনেই বেশি সাবালকত্ব অর্জন করেছি। অপেরায় দেখা হবার পর কি কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করলাম ওঁকে।

ভারি সুন্দর ওঁর হাসি। বললেন যে, ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে উত্তর ফ্রান্সে ও হল্যাণ্ডে। তারপর সুইডেনে নিজের বাড়িতে।

'বাড়িতে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আপনার?'

'ফ্রান্সের তুলনায় সুইডেনকে কেমন যেন শুকনো মনে হয়।'

'কিন্তু ওটা তো আপনার স্বদেশ।'

'তা হলেও। ব্রাসেলস্, বার্লিন, রোম, লণ্ডন, পারী—বিশেষ করে পারীর তুলনায়।'

'শুনে সুখী হলাম আমাদের রাজধানী আপনার ভালো লাগে।'

আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। সে চোখে এমন কিছু ছিলো যা আমাকে শিহরিত করে তুললো। ওঁর অভীপ্সা গোপন থাকলো না আমার কাছে।

'আপনার পরিবার কি বেশ বড়সড় ?'

'ছোট ভাই আর তিন বোন, কেউই প্রায় বাড়িতে থাকে না। সকলেই রাজসভায় কোন না কোন পদে বহাল আছে।'

ওঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যেতে সাহস হলো না আমার। সবার দৃষ্টি যে আমাদের ওপরেই সেটা তাঁর মতো চালাক লোকের অজানা রইলো না। 'আবার কখনও কথা বলার সুযোগ হবে আমাদের।' নীচু গলায় বললাম।

অভিবাদন করে চলে গেলেন তিনি। আমার পাশে দাঁড়ানো জায়ের দিকে মুখ ফেরালাম। মারিয়া জোসেফি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে, কথাবার্তার সবটুকুই ওর কানে গেছে।

সেই দিনগুলো কি অদ্ভুত! জীবনে সে সবের চেয়ে সুন্দরতর মুহূর্ত আর আসেনি আমার। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে পেটের ওপর হাত বুলিয়ে সন্তানের উপস্থিতি টের পেতাম। ভাবতাম, কেমন করে আমার ছোট্ট সোনা আমার কোলে রয়েছে, কেমন করে ওকে হাঁটা শেখাচ্ছি আমি, ওর গলায় আধো আধো স্বর, 'মামণি'!

আর ভাবতাম, কঁৎ দ্য আক্সেলের মুখখানা, অদ্ভুত সুন্দর মুখশ্রী আর অন্তরঙ্গ চোখের ভাষা। আমি সুখী। সন্তান ধারণের সৌভাগ্য আগে আমার হয়নি। এমন কোন মানুষের সাক্ষাতও আগে মেলেনি যার সঙ্গে আমার মানসিকতায় কোন সঙ্ঘর্ষ নেই। কল্পনার তুলিতে কত যে অদ্ভুত ছবি আঁকতাম···একখানা ছোট্ট ঘরে আক্সেলের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করছি, কয়েকটি ছেলেপুলেকে নিয়ে। এটাই যেন জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা আমার। জুয়া, নাচ, রসালো কথাবার্তা, দামী সিল্ক আর ব্রোকেড, অকল্পনীয় কুন্তলসজ্জা, হীরের দ্যুতি, রাজমুকুট—একটা সাধারণ জীবনের পরম তৃপ্তির তুলনায় এসবের কিই বা দাম! বিবেকের

কাছে সাচ্চা থেকে বলতে পারি, এটা পেলেই আমি বেশি সুখী হতাম। এখন আমি নিজেকে একজন সামান্যা রমণী বলে ভাবতে পারছি, এমন রমণী যার মাতৃত্ব ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই।

কিন্তু ভুল করে রানীর ভূমিকায় নামনো হয় আমাকে।

আক্সেল ছ্য ফের্সেনকে যত বেশি জেনেছি ততই যেন অভিভূত হয়েছি। সঙ্গীতের প্রতি ওঁর অনুরাগ ছিলো খুবই প্রবল। কনসার্টে ওঁকে আমন্ত্রণ জানাতাম, কখনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে ওঁকেও আমন্ত্রণ করতাম। কখনও হার্পসিকর্ড বাজিয়ে শোনাতাম, কখনও গান করতাম যদিও সুগায়িকা ছিলাম না। গানটা আক্সেলই গাইতেন বেশি। কিন্তু অন্যদের সদাসতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শুধুমাত্র আমাদের দুজনের একত্র-সাক্ষাৎ কখনই সম্ভব হয়নি।

তবু আমাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটেছে বেশ কয়েকবার। ওঁর মার কাছে নিয়ে গেছেন আমাকে, বাবার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, উনি চান ইউরোপ ঘোরা ছেড়ে দিয়ে আক্সেল কোথাও স্থিতি হয়ে বসুক। মাদামোয়াজেল লেয়েল সম্পর্কে অবহিত করেছেন আমাকে। লেয়েলও সুইডেনের অধিবাসী, থাকে লণ্ডনে। পরিবারের সবার ইচ্ছা ওদের বিয়ে হোক।

'ওর বিরাট সম্পত্তি প্রলুব্ধ করেছে আমাদের পরিবারকে।' ওঁর গলা গম্ভীর।

'তোমার কি ইচ্ছে ?'

'বড় সম্পত্তির প্রতি আমার তেমন অনীহা নেই।'

'ও কি সুন্দরী ?'

'অন্যেরা তাই বলে।'

'তোমার লণ্ডন অভিযানের কাহিনী শোনাও না।'

'মেয়েটির মা-বাবার সুসজ্জিত প্রাসাদে ওঁদের অতিথি হয়েছিলাম।'

'খুবই আনন্দে কেটেছে বলো।'

'না, একদম না।'

'মানে?'

'কারণ প্রেমনিবেদনে আমার আর তেমন উৎসাহ নেই।'

'আমাকে অবাক করলে।'

'একটুও না। আমি একটা স্বপ্নের সম্মোহনে ঘুরে বেড়াই।··· আমার যেন কিছু একটা হয়েছিলো···কয়েক বছর আগে···পারীতে। এখানকার অপেরা হাউসে।'

এ কথার জবাব দিতে ভয় করছিলো আমার। একটু দূরেই নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে আমার জা দুজন।

'তুমি কি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করোনি?'

'ওকে জিজ্ঞেস করেছি। এটা আমার বাবার অভিপ্রায় আর তাঁকে খুশি করা আমার কর্তব্য।'

'সুতরাং বিয়ে করছো সেই ধনী আর সুন্দরী মহিলাকে?'

'মোটেই না। ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'প্রত্যাখ্যান?'

'রানী মহোদয়ার বিশ্বাস হলো না বুঝি! মেয়েটির জ্ঞানগম্যি আছে। আমার অসম্পূর্ণতা ওর নজর এড়ায়নি।'

হো হো করে হাসলাম। 'তোমার লণ্ডন চলে যাওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়।···এত তাড়াতাড়ি। এই তো সেদিন এলে পারীতে।'

এভাবেই দিন কাটতে লাগলো। চারদিকে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটছিলো, কিন্তু আমার সে সবে কোন ঔৎসুক্য ছিলো না, পরে অবশ্য সে সব নিয়ে ভেবেছি। ইংলণ্ড আর তার আমেরিকার উপনিবেশ নিয়ে ফরাসী রাজসভা মুখর হয়ে উঠেছিলো। সবার মুখে হাসি কারণ ফ্রান্সের পুরনো শত্রু ইংলণ্ড ওখানে বিপদে পড়েছে। ফরাসীরা অন্ধভাবে ইংরেজদের অনুকরণ করলেও চ্যানেলের অপরপারের অধিবাসীদের সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা জন্ম নিয়েছিলো সবার মনে।

সাত বছরের যুদ্ধে পরাজয় ও অপমান ফরাসীরা ভুলতে পারেনি। ১৭৭৫ সালে লুইয়ের শাসনের প্রথম থেকেই আমরা আমেরিকানদের

উৎসাহিত করে আসছিলাম। অনেক ফরাসীর অভিমত ছিলো যে, ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। লুই কখনও যুদ্ধ চাননি। 'যুদ্ধে নামলে জনগণের শুভ কাজে আমাকে পেছনে পড়ে থাকতে হবে।' এই ছিলো লুইয়ের অভিমত। যাহোক, ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। উপনিবেশকারীদের শুভেচ্ছা জানালাম আমরা। তিনজন আমেরিকান নেতা শুভেচ্ছা সফরে ফ্রান্সে এলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, সিলাম ডীন ও আর্থার লী। অদ্ভুত গাম্ভীর্য ওদের। পোশাক আশাক সাধারণ, চুলের কোন পরিচর্যা নেই। আমাদের ফুলবাবুদের পাশে ওঁদের কেমন বেমানান লাগছিলো। কিন্তু সম্বর্ধনার ত্রুটি ঘটেনি কোথাও। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে রাজার ওপর চাপ দিচ্ছিলেন ওঁরা কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না লুই, যদিও গোপনে আমেরিকায় সাহায্য পাঠানো হলো। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, এমনকি অর্থও। অবশ্য ফরাসী ও ইংরেজ নৌবহর যুদ্ধে নেমে পড়াতে রাজাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৌ-যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলো।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আঙ্কেল আমাকে বিষদভাবে জানিয়েছিলেন। উনি ছিলেন মুক্তির একনিষ্ঠ সমর্থক। ওর বক্তব্যই আরও জোরের সঙ্গে রাজার কাছে উপস্থাপিত করেছিলাম। আমাকে খুশি করার জন্যে লুই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবার। আমার বিশ্বাস নৌযুদ্ধ ঘোষণার এটাই আসল কারণ। আমেরিকানদের জয় সম্পর্কে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। সে সময় কেউ যেন এ সম্পর্কে আমার দাদা জোসেফের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। 'বৃত্তি হিসেবে রাজ-তন্ত্রকে আঁকড়ে আছি আমি।' এটা আমার প্রতি পরোক্ষ সতর্কবাণী। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্রধারণ করছে তাদেরই আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। এটা ভালো কি মন্দ—সে প্রশ্নের জবাব এখনই পাওয়া মুশকিল। তবে রাজা এবং রানী—যাঁরা ভাবছেন যে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার প্রজাদের আছে—তাঁরা কি জেনে শুনেই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন না?

সে বছরের গরম এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে, গর্ভধারণের যন্ত্রণা

অনুভব করতে লাগলাম। ব্যায়াম করতে পারছি না বলে সারা সন্ধ্যা প্রাসাদের বারান্দায় বসে থাকতাম। বাগানে সাধারণ লোকেদের বেড়াবার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো, ওরাও দলে দলে সে সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। শরৎ সমাগমে ভাবলাম যে, জনগণের সামনে উপস্থিত হওয়াটাকে যথাসম্ভব পরিহার করবো। এটা করার যোগ্য কারণও আমার ছিলো। সুতরাং নিজের ঘরেই সময় কাটাতে লাগলাম একান্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত সঙ্গিনীদের নিয়ে। এদের মধ্যে ছিলো মাদাম পলিগনেঁা, লঁব্যাল এবং এলিজাবেথ।

এই মিলনচক্রে প্রায়ই যোগ দিতেন আক্সেল দ্য ফের্সেন। আমরা গান করতাম, বাজনা বাজাতাম আর গল্প করতাম। আমার স্বামীর তখন দিন কাটছে অবিরাম দুশ্চিন্তার মধ্যে। তবু দিনে অন্তত দশবার আমার ঘরে এসে জেনে নিতেন কেমন আছি আমি। যখন আসতেন না, তখন ডেকে পাঠাতেন ডাক্তারদের, আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইতেন।

সন্তানের আবির্ভাব যজ্ঞ! আমি এখন তার শিকার। যে কোন মহিলার পক্ষেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়া ভীতিজনক যদিও তা যেন একটা অনুপম অভিজ্ঞতা। কিন্তু রানীর পক্ষে এ সব তো আছেই, তার ওপর রয়েছে জনগণের মিছিল প্রত্যক্ষ করার যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা। আমি হয়তো জন্ম দিতে চলেছি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে, সুতরাং প্রত্যেক ফরাসীর অধিকার রয়েছে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার।

ভার্সাই শহর দর্শকের ভিড়ে উপচে পড়ছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরে কোথাও একটি ঘরও খালি নেই। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। প্রত্যেকেরই দৃঢ় সংকল্প—আমার সন্তানের জন্ম দেবার মুহূর্তের সাক্ষী থাকবে।

ঠাণ্ডা ডিসেম্বরের দিন সেটা, মনে আছে আঠারো তারিখ—আমার ব্যথা শুরু হলো। সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি উঠলো। উদ্দেশ্য—সবাইকে জানানো যে আমি সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছি। রাজকুমারী লঁব্যাল এবং পরিচারিকা মহিলারা আমার শয়ন কক্ষের দিকে ছুটলেন। হতচকিতভাবে

স্বামীও উপস্থিত হলেন। আমাদের বিয়ে নিয়ে এতই বাদানুবাদ হয়ে গেছে যে, তাঁর ভয়, অন্যান্য রাজকুমারের জন্ম থেকে এর জটিলতা অনেক বেশি হবে। নিজেই আমার বিছানার চারদিকে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। 'যাতে দর্শকরা ওদের মাড়িয়ে দিতে না পারে।' তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞান যে কতখানি ছিলো! সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাঠালেন পারী এবং সাঁ ক্লুদের সব রাজবংশীয়দের কাছে যাতে তাঁরা রাজসন্তানের জন্ম-মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারেন। এটাই হলো রাজকীয় রীতি।

আমার প্রসব যন্ত্রণা ক্রমশই বেড়ে উঠছে। সহ্য করার চেষ্টা করছি ভাবছি, সারা জীবন ধরে এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছি আমি। আগেই মাদাম দ্য লঁব্যালের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যে, আমার সন্তান ছেলে না মেয়ে—সেটা ইশারায় জানিয়ে দেবে আমাকে। আমার শয্যাপাশে বসে রয়েছে ও। ঘরটায় অসহ্য উত্তাপ, জানালা-গুলো ঠাণ্ডার জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আঁতুড় ঘরে যে এতো জন সমাগম হতে পারে, আমার কল্পনায়ও আসেনি। আমার যেন নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিলো। একদিকে প্রসব যন্ত্রণা, অন্যদিকে নিঃশ্বাস যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করছিলাম আমি। ভিনিগার আর এসেন্সের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ঘামের গন্ধ, তার ওপর অসহ্য গরম। আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না।

সারাটা রাত সন্তানের জন্ম আর নিজের জীবনরক্ষার যুদ্ধ চালালাম। ১৯শে ডিসেম্বরের সকাল সাড়ে এগারটায় আমার সন্তানের জন্ম হলো। শরীরে আর একবিন্দুও শক্তি ছিলো না। তবু জানতে চাই পুত্র সন্তান প্রসব করেছি কিনা। লঁব্যালের দিকে তাকালাম। ও মাথা নাড়লো নির্ধারিত পদ্ধতিতে।

মেয়ে! হতাশায় যেন কুঁকড়ে গেলাম…এবং তারপর…নিঃশ্বাস নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হলো। চারদিকে মুখের অস্তিত্ব…এক সমুদ্র মুখ…কঁপাঁর, লঁব্যালের ডাক্তারের, রাজার। কেউ যেন চিৎকার করে উঠলো, 'দোহাই, ওকে একটু হাওয়া পেতে দাও।'

তারপরই চেতনা হারালাম…।

পরে কি ঘটেছিলো মাদাম কঁপাঁ আমাকে বলেছিলো। মেয়েদের কেউই জনতার ভিড় ঠেলে গরম জল আনতে যেতে পারছিলো না। ডাক্তাররা বলেছিলেন, হাওয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি আমি। কিন্তু জনতাকে ঘর থেকে হঠানো যাচ্ছিলো না। ওরা তো নাটক দেখতে এসেছে, এখনও তার যবনিকা নেমে আসেনি।

'জানালাগুলো খুলে দাও।' কিন্তু সেগুলোকে লোহার পাত আর কাগজ দিয়ে এমন করে বন্ধ করা হয়েছে যে, খুলতে অন্তত ঘণ্টাকয়েক লেগে যেতে পারে।

রাজা তখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। এমন প্রচণ্ড শক্তিতে জনতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলেন যে, কোন একটা মানুষের পক্ষে অবিশ্বাস্য। মুচড়িয়ে জানালা খুলে দিলেন আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘর ভরে গেলো।

ধাত্রীদের একজন ডাক্তারকে বললেন, আমার রক্তপাত অস্ত্রোপচারেই ঘটানো দরকার কারণ গরম জল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পায়ে অস্ত্রোপচার করা হলো। মাদাম কঁপাঁ পরে বলেছিলো যে, গলগল করে রক্ত বেরোতেই আমি নাকি চোখ খুলে তাকিয়েছিলাম, আর সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

বেঁচে গেলাম এবং সন্তানের আবির্ভাবও সার্থক করলাম, যদিও একটা মেয়ে।

জ্ঞান হবার পর দেখলাম, আমার পায়ে পটি বাঁধা রয়েছে। রাজা এগিয়ে এসে জানালেন সব কিছু। দেখলাম সবাই কাঁদছে।

'ওরা আনন্দ করছে তোমার সেরে ওঠায়।' রাজা বললেন। 'আমরা তো ভেবেছিলাম···' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভবিষ্যতে এ রকম যাতে না ঘটে সেদিকে নজর রাখবো আমি। প্রতিজ্ঞা করছি।'

'আমার সন্তান···'

সায় দিলেন তিনি। শিশুটিকে নিয়ে এসে আমার কোলে দেওয়া হলো। ওকে দেখা মাত্রই ভালবেসে ফেললাম, মেয়ে বলে যে ওর অনাদর হবে মোটেই তা নয়। আমার সুখের বৃত্ত পূর্ণ হলো।

আমার মায়ের নামে নাম রাখলাম ওর, মারি থেরেসে শারলোট,

কিন্তু রাজবাড়ির সবাই ওকে ডাকতে লাগলো 'মাদাম রয়েল' বলে।

খবর পাঠানো হলো চারদিকে। রাজা ভিয়েনাতে স্বহস্তে চিঠি লিখলেন। উৎসব মুখর হয়ে উঠলো চারদিক। মিছিল বের হলো। বাজির আলোয় সারা আকাশ এমন জ্বলজ্বল করতে লাগলো যে, রাতের অন্ধকার কেটে গেলো। আমি কেমন আছি তা জানার জন্যে প্রাসাদের সামনে বিস্তর ভিড় জমতে লাগলো। রোজ বুলেটিন প্রকাশিত হতে লাগলো। রাজার উৎসাহের অন্ত নেই। বাবা হওয়ার আনন্দে তিনি মশগুল। ওর ভাবভঙ্গিতে হেসে ফেলছি অথচ আমার নিজের অবস্থাও তো সেরকম। আমিও তো সারাদিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই। আমার মেয়ে, আমার একান্ত আপনার মেয়ে।

মেয়েকে নিয়ে পারীর গীর্জায় গেলাম আমরা। নানা ধরনের উৎসব করা হলো। চারদিকে জনতার ভিড় কিন্তু করতালি আর হর্ষধ্বনি দিয়ে কেউ আমাদের তেমন অভ্যর্থনা জানালো না। অবাক হলাম। প্রাসাদে ফিরে এসে মার্সির কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে, জনগণ আমার অমিতব্যয়িতায় আমার ওপর রুষ্ট হয়েছে। এখন যুদ্ধের সময় অথচ আমি নিজেকে নির্বোধ আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছি বলে জনগণ অসন্তুষ্ট। তার ওপর আমার শত্রুদের প্রচারকার্য তো আছেই। এমন একটা দিন যায় না যেদিন আমার বিরুদ্ধে কোন না কোন প্রচারপুস্তিকা অথবা ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে না।

ওঁকে জানালাম যে, আর ওসবের মধ্যে নেই আমি। আর ওসবের দরকারই বা কি! এখন তো আমি মা।

ভিয়েনা থেকে মার চিঠিও পেলাম। আমার মেয়ে হবার খবর পেয়ে তিনি খুবই খুশি, কিন্তু ছেলে হলে আরও বেশি খুশি হতেন। ফ্রান্সের সিংহাসনের জন্যে চাই একটি রাজকুমার।

জোসেফ বলেছিলো—আমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। সত্যিই তাই। নইলে আমার বিরুদ্ধে চারদিকে এমন ঘৃণার প্রাচীর তুলতে আমি পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাবো কেন। এটা যুদ্ধের সময়। জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে, করের বোঝা ক্রমশই ভারি হয়ে উঠছে জনসাধারণের ওপর। আমার স্বামী তাতে চিন্তিত, প্রজাদের জন্যে সব ছেড়েছেন তিনি, ভালো একটা পোশাক পর্যন্ত পরেন না। অথচ আমি মশগুল দামী দামী পোশাকে, গয়নায়, নাচে আর ইচ্ছামতো টাকা ওড়ানোয়। আমার শত্রুরা প্রচার করার মতো প্রচুর মালমশলা নিত্য নিয়ত হাতে পাচ্ছে। লোকেরা ভাবে এই অস্ট্রিয় মহিলার হাতে পড়ে রাজা যেন মন্ত্রমুগ্ধ ; উনি বিনা প্রতিবাদে অনেক টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। সব টানা-পড়েনের জন্যে আমিই একমাত্র দায়ী। আমি তো একজন বিদেশিনী।

আমার নাম ওরা দিয়েছে 'অস্ট্রিয় মহিলা'। সারা পারী আমার নামে থুথু ফেলছে। ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ফলাও করে ওখানে আমার অমিতব্যয়িতার নিদর্শন হিসেবে প্রচারিত হচ্ছে।

এ সব তো জানা। জেনেই বা করবো কি ? ভুলে যেতে চাই, সারা জীবন ধরে সব শুভানুধ্যায়ীর সমস্ত সতর্কবাণীকে যেভাবে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। আমার যেন শত্রু তৈরি করার অনন্য একটা প্রতিভা ছিলো, এমন বন্ধুও যোগাড় করতাম যারা পদে পদে আমার বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলতো। ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে যাওয়াই যেন আমার নিয়তি। তাই স্বামী, আমার মা, মার্সি অথবা ভেরমঁ—কারও সতর্কবাণী আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্রোতে গা ভাসানোই আমার স্বভাব, তবু ফিরতে পারার সময় তখনও আমার হাতে ছিলো। আমি যেন কিছুতেই পেরে উঠিনি।

অথবা আমার স্বামী যদি একটু অন্য ধরনের হতেন···কিন্তু তাঁকে

তো দোষ দেওয়া চলে না। তিনি তো প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রাজ্যশাসন সম্পর্কিত কোন শিক্ষাই তাঁকে দেওয়া হয়নি। মনে পড়ছে, রাজা হবার পর তিনি বলেছিলেন, 'ওঁরা আমাকে কিছুই শেখাননি।' ওঁর পিতামহ পঞ্চদশ লুই মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, 'এই রাজ্যের শাসনযন্ত্র কি ভাবে চলছে হৃদয়ংগম করতে পারি কিন্তু আমার অবর্তমানে এর চেহারা কি দাঁড়াবে এবং বেরি কি ভাবে নিজেকে এর বাহুপাশ থেকে মুক্ত করবে, আমার জানা নেই।' আমার স্বামী বেচারা এমন দয়ালু অথচ দু একটা আশ্চর্য মুহূর্ত ছাড়া এমন অক্ষম যে, কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে এসব গভীর ভাবনা আমার মধ্যে ছিলো না। অপমানজনক কবিতা, মিথ্যাচার, নিন্দা—এসবের কোন ত্রুটি ছিলো না আমার বিরুদ্ধে। এর পেছনে কারা সক্রিয় রয়েছে, ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। মাথায় ঢোকেনি যে, এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে আমার দেওররা, জায়েরা, কণ্ডি, কন্টি, অর্লিন্স প্রভৃতি রাজবংশীয়রা যাদের আমি রুষ্ট করে তুলেছি। ধ্বংসের সেই রুদ্রনাচন শুরু হয়ে গেছে আমার একান্ত অজান্তেই।

চারপাশে কত না আয়োজন নিজেকে সুখী করে তোলার। আমার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, আক্সেল ভ্য ফের্সেন, যিনি ছায়ার মতো অনুসরণ করছেন আমায়। রয়েছেন রাজা নিজে, সব সময়ই কৃতজ্ঞ কারণ তাঁর যৌনক্ষমতার পরিচয় নিজের দেহে বহন করেছি আমি। আরও রয়েছে সৌন্দর্যে ভরা ত্রায়ানো। ওখানকার বাগানের সংস্কার করেছি। গ্রন্থাগারে লাগিয়েছি সাদা রং, দরজা জানালায় লাগিয়েছি সবুজ পাতলা অথচ চকচকে রেশমী কাপড়ের পর্দা। বইয়ের তাকে শোভা পাচ্ছে নানা নাটকের বই, আমার ইচ্ছে ত্রায়ানোতে ওগুলোর অভিনয় করা। ওখানে একটি থিয়েটার তৈরি করছি, আমার অভিনয় দলকে ওখানে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু এতে খরচের কথাটা নিয়ে একটুও ভাবিনি। অর্থের কথাটা কেন যে আমার মনে থাকে না। আমি চাই, ন্যূনতম সময়ে আরব্ধ কাজ শেষ হয়ে যাক। ত্রায়ানোঁ নিয়েই এক বছরে

খরচ হলো তিনশ পঞ্চাশ হাজার লিভারেরও বেশি। অথচ সেটা যুদ্ধের সময়, পারীর জনগণ রুটির দাম নিয়ে নিরন্তর অভিযোগ তুলছে। উৎরাইয়ের সেই মরণখেলা তখন শুরু হয়ে গেছে।

তবু আমি তো সুখী! সন্তানের জন্মের দুমাস পরেই অপেরা বলে যোগ দেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম। লুইকে আমার ইচ্ছের কথা জানালাম। উনি অন্যমনস্কভাবে জানালেন যে, উনিও আমার সঙ্গী হবেন। ছদ্মবেশে গেলাম আমরা। লোকজনের ভিড়ে মিশে গেলাম। সেদিন ছিল রবিবার। আবার মঙ্গলবারে যাবার বায়না ধরলাম। সোমবারে রাজার এমন জরুরী কাজ পড়লো যে, মঙ্গলবারে তিনি নড়তে পারলেন না। কিন্তু আমাকে থামায় সাধ্যি কার? একটি মাত্র পরিচারিকাকে নিয়ে বের হলাম। স্থির হলো পারীতে মঁসিয়ে কোয়াগ্নির বাসায় উঠবো। ওখানে পোশাক বদলে অন্য গাড়িতে করে অপেরায় যাবো। কিন্তু এত অল্প সময়ে তিনি যে-গাড়ি যোগাড় করতে পারলেন, তা ভাঙা এবং অকেজো। পথেই ভেঙে পড়লো। চালক বললো একটা ভাড়াটে গাড়ি যোগাড় করে আনবে সে। তাই করলো। আমি এমন বোকা যে, ফলাও করে পরদিন বন্ধুদের সে গল্প শোনালাম। বাস, পরদিন সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেলো সেই মুখরোচক সংবাদ। রানী যান ভাড়াটে গাড়িতে, ওঠেন মঁসিয়ে কোয়াগ্নি বাড়িতে, উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। প্রচার পত্রের নাম 'ভাড়াটে গাড়িতে অভিযান।' তা নিয়ে আবার নানামুনির নানামত।

আর এই সময়ে আমার সুখের জন্যে বেশি করে নির্ভর করছি আক্সেল দ্য ফের্সেনের উপস্থিতির ওপর। তাও লোকের নজর এড়াচ্ছে না। আমার ভ্রূক্ষেপ নেই কিন্তু ফের্সেন সতর্ক। আমার সুনামের ব্যাপারটা ওর অজানা নয়। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে লুকোচুরি করার মতো কিছু নেই। এই সম্পর্ক নীতিসম্মত। দুজনেই জানি এটার অন্য কোন প্রকরণ থাকতে পারে না। কিন্তু এটা আমাদের দুজনের কাছেই অমূল্য। ফের্সেন আমার প্রেমিক সাজতে পারে না। আমার কর্তব্য হলো ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ রাজাকে গর্ভে ধারণ করা, রাজা ছাড়া আর

কারুরই আমার সন্তানের জনক হবার অধিকার নেই। কিন্তু পরস্পরকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা তো কেউ রোধ করতে পারবে না। এটা সেই ধরনের প্রেম যেখানে প্রেমিকা ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে।

আমার এতেই সুখ, এর চেয়ে বেশি কিছু কাম্য নেই আমার। তাসের খেলায় ওকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিন্তু এমন একদিন ও এলো যেদিন আমি আসরে যাবো না ঠিক করেছিলাম। ওকে লিখে জানালাম যে, এজন্যে কত দুঃখিত আমি। শুনলাম যে, ও রাজার 'লাইট ড্র্যাগুন' বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়েছে, সেই পোশাকে ওকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। পরদিনই সেই পোশাকে হাজির হলো ও। সেই রোম্যান্টিক পোশাকে ওকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিলো। অনেকেই লক্ষ্য করলো যে ওর সেই চেহারা দেখে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছি আমি। ওর মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। ওর অনুপম মুখশ্রী, সুন্দর চুল আর বড় বড় কালো চোখ, যেন কোন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। মনে হলো, অন্য কোন পুরুষকে দেখে কখনো এমন সমর্পণের মনোভাব আমার আসেনি।

কাজে কাজেই আমাদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেলো। ওকে আমার প্রেমিক বলে অভিহিত করলো ওরা।

'এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা মানেই আপনার বেশি ক্ষতি করা।' আক্সেল দ্য ফের্সেন গম্ভীরভাবে বলে উঠলো।

জানালাম যে, নিন্দাবাদ শুনতে অভ্যস্ত আমি, আরও কিছু বাড়তি হলে আমার চরিত্রের কোন হেরফের ঘটবে না।

'আমার সামনে আপনার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাহস যদি কারও থাকে, আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি।'

জানি, কোন অতিশয়োক্তি করেনি ও। আমার জন্যে প্রাণ দিতে হলে ও একটু দ্বিধা করবে না। আমার সুনামের জন্যে ফ্রান্স ছেড়ে যেতেও আপত্তি করবে না।

গ্যাব্রিয়েল সান্ত্বনা দিলো আমাকে।

'কি দুর্ভাগ্য আমার নাহলে এমন হবে কেন। কিন্তু আক্রোশ বশে

লোকেরা যদি ধরেও নেয় আমার একাধিক প্রেমিক আছে, তাই বলে এতগুলো! এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রেম করে যাচ্ছি! আশ্চর্য্য!'

গ্যাব্রিয়েলও ওটা অস্বাভাবিক বলে ভাবতো। আমাদের সমাজে প্রেমিকহীনা মহিলা প্রায় ছিলেনই না কেউ। এমন কি গ্যাব্রিয়েলও ভওদ্রেয়ুর রক্ষিতা ছিলো। এ সব মহিলাদের প্রেমিকরা আমারও প্রেমিক বলে নিন্দা রটেছিলো কারণ ওদের ঘরে সে-সব আগন্তুকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতাম আমি। আমার উচিত ছিলো শুধু লঁব্যাল ও ননদ এলিজাবেথের সঙ্গেই মেলামেশা করা।

আক্সেল সেই মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলেছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐকান্তিক সমর্থক ও, সক্রিয় সাহায্য দেবার জন্যে সে আমেরিকা চলে যাবে।

শুনে খুবই নিরাশ হলাম। কিন্তু ভান করতে হলো যেন সামান্য পরিচিত কাউকে নেহাত ভদ্রতার খাতিরে বিদায় জানাচ্ছি।

'মানে?' একজন ডাচেস সে কথা শুনে বলে উঠলো, 'জেতা সম্পত্তি ছেড়ে দিচ্ছো?'

না শোনার ভান করলাম, আরতোঁর দিকে তাকালাম শূন্যদৃষ্টিতে। ওর দুচোখে শৃগালের চাহনি ফুটে উঠেছে।

'জিতে যদি নিতে পারতাম, সেটা ছেড়ে যেতাম না।' আক্সেল বলে উঠলো। 'কাউকে পেছনে ফেলে চলে যাই না আমি, আমার জন্যে যে কান্নায় ভাসবে।'

মিথ্যা বললো ও, আমার মনোভাব জানে বলেই। এটাই একমাত্র করণীয় ছিলো ওর। এখানে থাকার সাহস ওর নেই।

সুতরাং চলে গেলো আক্সেল। ঠিক আছে, আমিও আমার সন্তানের মধ্যে নিমজ্জিত হবো।

স্বামীর কাছে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি কতো যে সদয়! আক্সেলের চলে যাওয়া উচিত বলে ভেবেছিলাম শুধু ভয়ে নয়, আমি অবিশ্বাসিনী হবো না, স্বামী যোগ্যা হয়ে উঠবো—এই অভিলাষেও! জানি, উনি কখনও অবিশ্বাসী হননি, কোন রক্ষিতার

প্রতিপালকের ভূমিকা নেননি। এমন পবিত্র হৃদয় কি আর কোন ফরাসী রাজার ছিলো ?

তার ওপর আমার সন্তান আমার আদরের মাদাম রয়েছে। কি যে ভালবাসি ওকে ! এখন আর আরমাদের দিকে আগের মতো নজর নেই আমার। কেমন বোকা বোকা ও বিষণ্ণ হয়ে গেছে ছেলেটা। এটা হঠাৎ আবিষ্কার করায় ওকে নিয়ে এসে আমার বিছানায় বসিয়ে মিষ্টি খেতে দিয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থা পালটে গেছে। সে এখন আর আমার ছোট্ট ছেলেটি নয়, নামেমাত্র আরমাদ, চাকররা যার ভালমন্দ দেখা শোনা করছে। আমার হাতে যতটুকু সময়, তার সবটুকুই খরচ হয়ে যাচ্ছে মেয়ের পেছনে। তাকে আদরের স্বর্গে তুলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি ভুলেছিলাম কিন্তু সে ভোলেনি। আগামী বছরগুলোতেও সে কথা সে স্মরণে রেখেছিলো। আমাকে ধ্বংস করার সংকল্পে যারা জ্বলে যাচ্ছিলো, সে হয়ে উঠেছিলো সেই জঘন্যতম শত্রুদের একজন। এমন কি সহানুভূতি দেখাতে গিয়েও, আমার প্রবল-বিরুদ্ধ মতবাদকে পরোক্ষে গড়ে তুলে, আমার ধ্বংসের রাস্তা প্রশস্ততর করতেই সাহায্য করেছি।

মার চিঠি অনবরতই পাচ্ছিলাম। বিষয়বস্তু একটি—রাজকুমারের আবির্ভাব সফল করো। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটাচ্ছি একথা মার্সি ওঁকে জানিয়েছিলেন। এভাবে চললে কি পুত্রলাভ হবে ? রাজা তাড়াতাড়ি শুতে যান, ওঠেনও খুব ভোরে। আমি রাত করে শুই, দেরিতে উঠি। আরও শুনেছেন যে, ত্রায়ানোতে গিয়ে একা একা রাত কাটাই আমি। সেটা তাঁর একটুও পছন্দ নয়। প্রত্যেক মাসেই তিনি উৎসুক হয়ে থাকছেন খবর পাবার জন্যে যে, আমি আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছি কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠছে না।

আমারও একান্ত ইচ্ছা যে, আমার একটি ছেলে হোক। মাদাম রয়েলকে নিয়ে একান্তভাবে আত্মস্থ হতে চেয়েছি। ওর মুখে প্রথম যেদিন 'বাবা' শব্দটি ফুটলো, ভারি খুশি হয়েছি আমি এবং রাজা। প্রত্যেক দিনই এ জাতীয় নতুন নতুন কিছু না কিছু ঘটছিলো।

কিছুদিনের মধ্যে মনে হলো আমি আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছি

ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখলাম। জানালাম শুধু রাজা আর আমার একান্ত অন্তরঙ্গ কজন বন্ধু—গ্যাব্রিয়েল, লঁব্যাল, এলিজাবেথ ও কঁপাঁকে। কিন্তু একদিন ঘোড়া-গাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মনে হলো ভারি শীত শীত লাগছে। লাফ দিয়ে উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলাম, সেটাই কাল হলো। কয়েকদিন পরেই আমার গর্ভপাত হয়ে গেলো।

খুব মুষড়ে পড়লাম। দুঃখিত হলেও রাজা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন—ভেঙে পড়ার মতো হয়নি কিছুই, আবার সন্তান ধারণের উপযোগী হয়ে উঠতে সময় লাগবে না আমার, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। ভাবলাম, ভালোই করেছি, এই ব্যাপারে ঢাক পেটাইনি। পিসিরা অথবা জায়েরা জানতে পারলেই সমস্ত দোষটা আমার ওপর চাপাতো। আমি চঞ্চল, দায়িত্বজ্ঞানহীন।

স্বাস্থ্য আমার এতই ভালো যে, এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দেরি হলো না। কিন্তু কয়েকদিন পরে হাম হলো আমার। এই ছোঁয়াচে রোগে যাতে রাজা আক্রান্ত না হন সেজন্যে চলে গেলাম ত্রায়ানোতে। সঙ্গে গেলো আরতোঁ, দুই জা, লঁব্যাল, এলিজাবেথ, এবং আরও চারজন পুরুষ; দ্য গুইনেঁ, দ্য কোয়াগ্নি, কঁৎ দ্য এস্টারহেজি এবং ব্যারন দ্য বেসেঁভা। এরা চারজন আমার রোগশয্যায় আমাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা আর কলঙ্কের ঝড় বয়ে গেলো। বলা হলো যে, হামটা আসলে একটা অজুহাত পুরুষসঙ্গ লাভের। প্রশ্ন তুললো—রাজার হাম হলে কোন কোন মহিলা তাঁর সেবা করবেন?

অবশ্য মার্সি অথবা রাজা এতে কোন দোষ দেখতে পেলেন না। রাজা অথবা রানী তাঁদের শোবার ঘরে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পারেন, এটাই চিরাচরিত রীতি।

সেরে যাবার পরও ত্রায়ানোতে থেকে গেলাম। ওখানে থাকতেই ভালো লাগে আমার। ভিয়েনা থেকে প্রতিবাদ এলো, মার্সি আমায় বোঝালেন আমার থাকা উচিত এমন স্থানে যেখানে সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে নইলে নিন্দে রটে, ঈর্ষার সৃষ্টি হয়, অবস্থার জটিলতা বাড়ে। তাঁকে জানাই আমি শীগগির ভার্সাই ফিরে যাচ্ছি।

ভার্সাইতে ফিরে এসে রানীর কর্তব্য-কর্মে মন দিলাম বটে, কিন্তু অনেককেই অসন্তুষ্ট রেখে এলাম।

আঘাত নেহাত অতর্কিতভাবেই এলো। আমার এও জানা ছিলো না, তিনি অসুস্থ। অ্যাবেই ভেরমঁ আমার কক্ষে এসে জানালেন যে, আমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চান তিনি। তাঁর চোখে ত্রাস, ঠোঁট যেন কাঁপছে। 'সাজ্ঘাতিক দুঃসংবাদ।'

'কি হয়েছে?' অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। ওঁর হাতের চিঠিটার দিকে চোখ পড়তেই হকচকিয়ে গেলাম। 'সম্রাজ্ঞী কি···?'

'হ্যাঁ, মারা গেছেন।' 'মারা গেছেন!' 'হ্যাঁ, তিনি আর নেই।'

আর কথা জোগালো না আমার মুখে। যেন অসাড় হয়ে গেছি। বুকে সব হারানোর বেদনা আমার, মনে হচ্ছে আর কোনদিন নিজেকে সুরক্ষিত বলে ভাবতে পারবো না।

'বিশ্বাস হয় না।' দম বন্ধ হয়ে আসা গলায় বললাম। 'আমাকে একা থাকতে দিন।'

চলে গেলেন তিনি। বিছানায় বসে ওঁর স্মৃতির অতলে ডুবে গেলাম। ভিয়েনায় কতভাবেই না দেখেছি ওঁকে। আয়নায় ওঁর প্রতিবিম্ব দেখেছি যখন পরিচারিকা ওঁর চুল বেঁধে দিচ্ছে। অনুভব করছি ঠাণ্ডা ভিয়েনার হাওয়া। ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকা আমার শরীরের ওপর নেমে এসেছে ওঁর মুখ। গলা শুনছি ওঁর 'এটা করো না, ওটা করো। এই চাপল্য, এই অন্যমনস্কতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। তোমার কথা ভাবলে আমার বুক কাপে···'

তোমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠুক মা। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আমি একদম একা, অসহায়।

রাজা এলেন, দুজনে একসঙ্গে চোখের জল ফেললাম। আমার কাছে আসার আগে আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে ওঁকে। পাশের ঘরে অ্যাবেই বসেছিলেন, ওঁকে জানিয়েছেন যে, একলা থাকতে চাই

আমি। সে ইচ্ছার ইজ্জত দিয়েছেন তিনি।

'সবাই আঘাত পেয়েছি এতে,' আমাকে জড়িয়ে ধরে রাজা বললেন, 'কিন্তু তোমার আঘাত সবচেয়ে বেশি।'

বিছানার ওপর বসলেন তিনি, হাতের মুঠিতে আমার হাত। আমার কানে বেজে চলেছে মার কণ্ঠ, সারা জীবনে যেভাবে আদেশ, অনুরোধ আর মিনতি করেছেন আমার কাছে। তবু শোক করা তো উচিত নয় আমার, এই তো আমার স্বামী, আমার মেয়ে। আমার একটুও ভুলে থাকা উচিত নয় যে, ফ্রান্স আমার কাছে তার ভবিষ্যৎ যুবরাজকে প্রত্যাশা করে।

রাষ্ট্রীয় শোক দিবস ঘোষণা করলাম। নিজেকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করলাম। রাজপরিবারের লোকজন, গ্যাব্রিয়েল ও লঁব্যাল ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করলাম না। কয়েকদিন ও ভাবেই কাটলো।

কি ভাবে মার শেষ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছিলো, সে খবর মার্সির কাছে পেলাম। গত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই খুব ভুগছিলেন তিনি। গত উনত্রিশ তারিখে পরিচারিকাকে বলেন, 'পৃথিবীতে আজই আমার শেষ দিন। পেছনে ফেলে রাখা সন্তানদের জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।' একে একে সবার নাম উচ্চারণ করেন তিনি, আকাশের দিকে হাত তুলে। আমার পালা এলে বলেন, 'মারী আঁতোয়ানেৎ, ফ্রান্সের রানী।' বলেই অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সারা দিন একইভাবে কাটলো। রাত আটটা থেকে শ্বাসযন্ত্রণা শুরু হলো। বিছানার পাশে বসেছিলো জোসেফ। মা ডাক্তারদের দিকে ইশারা করলেন। 'আমি বিদায় নিচ্ছি। মৃত্যুর মোমবাতি জ্বেলে দিন আর বন্ধ করে দিন আমার দুচোখ।'

জোসেফের দিকে শেষ বারের মতো তাকালেন। ওঁকে বুকে তুলে নিলো জোসেফ এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

আবার আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করতে হলো। মার মৃত্যুর প্রায় বছর-খানেক পরে। পুত্রলাভের কামনায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রত্যাশা

করতে ভয় পেলাম। মেয়ের প্রতি তো আমার স্নেহের এতটুকুও ঘাটতি ছিলো না। প্রার্থনা করলাম, 'ভগবান, একটা ছেলে।'

এবারে রাজা আদেশ জারি করেছিলেন যে, আঁতুড়ঘরে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শুধু রাজপরিবারের লোকজন আর আমার ছজন সঙ্গিনী, ধাত্রীরা ও ডাক্তাররা আমার পাশে থাকবে।

বাইশে অক্টোবর সকাল থেকেই ব্যথা অনুভব করলাম। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো আধা সচেতনতার মধ্যে। কেউ কথা বলছিলো না আমার সঙ্গে রাজার হুকুম মতো, কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ভয় পাচ্ছিলাম—ছেলে না মেয়ে? চোখ মেলে রাজাকে দেখতে পেলাম। তাঁর চোখে জল, আবেগের প্রাবল্যে তিনি যেন ভেসে যাচ্ছেন। 'দেখো, কেমন শান্ত রয়েছি। কাউকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করিনি।' আস্তে আস্তে বললাম আমি।

'এবারে রাজকুমারকে পেয়েছি আমরা।' আবেগপূর্ণ রাজার স্বর।

ছেলে! আমার স্বপ্নের ধন! হাত বাড়িয়ে দিলাম, আর তাতে তুলে দেওয়া হলো ওকে। ছেলে, সুন্দর ছেলে!

'একটুও দেরি না করে ওকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হোক।' রাজা আদেশ করলেন।

ছোট্ট রাজকুমারের দীক্ষা পর্ব সমাপ্ত হলো বিকেল তিনটেয়। একশো একটা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হলো যেন সারা পারী জানতে পারে রাজকুমারের আবির্ভাব সংবাদ। সারা শহর আনন্দে ফেটে পড়লো। ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলো, বের করা হলো বর্ণাঢ্য মিছিল। আলোক মালায় সজ্জিত হয়ে উঠলো সারা শহর, বাজি পোড়ানো হলো। ভাবলাম, যারা কুৎসা আর নিন্দেবাদ নিয়ে ছাপা প্রচার-পত্রগুলোর ওপর উল্লাসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এখন তারাই আমার দীর্ঘ জীবনের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে কারণ আমি ওদের রাজকুমারের মা। ওরা এখন নৃত্য করছে, আমার স্বাস্থ্যপান করছে, চিৎকার করে বলছে, 'রাজা ও রানী দীর্ঘজীবি হোন, রাজকুমার দীর্ঘজীবি হোন।' মা ঠিকই বলেছিলেন, 'ফরাসীরা আবেগপ্রবণ মানুষ।'

ছেলেকে পেয়ে খুশি হলাম। মাদাম রয়েলকে কাছে ডাকলাম যাতে ভাইকে দেখতে পায় ও। তিন বছরের মেয়েটি দোলনায় ওর ভাইয়ের মুখ দেখলো। দরজায় দেখলাম আরমাদের মুখ। কিন্তু ওকে ইশারা করতেই চোখ নামিয়ে নিলো সে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর চুলে হাত দিয়ে আদর করলাম। আগের মতো অতটা সুশ্রী মনে হলো না ওকে। বোধ হয় আমার নিজেরই ভুল, অজান্তে আত্মজদের সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছি ওর।

তিনদিন তিনরাত ধরে একটানা বেজে চললো বাদনধ্বনি। পারীতে ছুদিনের ছুটি ঘোষণা করা হলো। শহরে মদের ফোয়ারা ছুটলো। মাংসের দোকান বসানো হলো। নকল ফুলের মালা গলায় নাগরিকেরা রাজকুমারের দীর্ঘ জীবন কামনা করে পরস্পরকে অভিনন্দন জানালো।

উৎসবের পর উৎসব। প্রত্যেক পৌরসংস্থা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠালেন ভার্সাইতে। একটানা নদিন চললো উৎসবের ঘনঘটা। সারা রাজসভা তাঁদের সম্বর্ধনা জানালেন। পারীর পথে পথে পরিক্রমণ করলাম আমরা। জনগণ অকুণ্ঠচিত্তে অভ্যর্থনা জানালো আমাদের।

ভাবলাম আমার অতীতের ভুলভ্রান্তি নিয়ে লোকে আর মাথা ঘামাবে না কারণ সিংহাসনের নতুন উত্তরাধিকারীকে ওদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি আমি।

বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে ভাবি, আমি কি পারতাম এই অশুভ পরিস্থিতির হাত এড়াতে? হয়তো বা পারতামও!

রানী হবার পর থেকে রাজসভার ছুজন মণিকার মাঝে মাঝে আমার কাছে হাজির হতেন। ওঁরা হলেন বোহেমার আর বাসেঁগে। মাদাম ছু বারিও ওঁদের কাজের প্রশংসা করতেন। বোধ হয় তাঁর কাছে বিক্রি করার বাসনা নিয়েই ওঁরা একটা অতি অপূর্ব হার তৈরি করেন। সারা য়ুরোপের সবচেয়ে দামী মনিমুক্তোয় গড়া হারটিতে ওঁরা নিজেদের মূলধনের প্রায় সবটুকুই খাটিয়েছিলেন। ওঁদের ছুর্ভাগ্য মাদাম ছু বারির হাতে ওটা তুলে দেবার আগেই রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যু হলো।

হতাশ হয়েই প্রথমে আমার কথা ভাবলেন ওঁরা। ওটা দেখে, ওই মণিরত্নের দ্যুতিতে আমার চোখ ঝলসে গেলো, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখে হারের নক্সাটি পছন্দ হলো না! কেমন যেন ঐতিহ্যের অভাব, হাল্কা ধরনের। তারওপর দু বারির জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো মনে হওয়ায় আরোই নেবো না ঠিক করলাম। ওঁরা তখন রাজাকে ধরলেন। রাজা আমার মত জানতে চাইলে বললাম, এই দামে একখানা জাহাজ কেনা যায় আর এখন ফ্রান্সের তাই দরকার।

রাজা একমত হলেও অবাক হলেন। রাজা জানালেন, আমি যদি ওটা পেতে চাই, যথাসর্বস্ব দিয়েও ওটা তিনি কিনে দেবেন আমাকে। হেসে ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আমার অনেক হীরে আছে। কোন গয়নার জন্যে ষোললক্ষ ফ্রাঁ খরচ করার কোন যুক্তি নেই।

এই প্রসঙ্গ ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর কয়েক পরে, একদিন মেয়ের সঙ্গে বসেছিলাম, বোহেমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন আমার। ওঁকে দেখেই বুঝলাম বিপদে পড়েছেন তিনি। আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কাঁদতে লাগলেন। 'মাদাম, আপনি যদি হারটা না কেনেন, আমি সর্বস্বান্ত হবো।'

'নেকলেস! সে প্রসঙ্গ তো আগেই চুকেবুকে গেছে।'

'আমার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। আপনি না কিনলে নদীতে ঝাঁপ দিতে হবে আমাকে।'

'উঠে দাঁড়ান, মঁসিয়ে বোহেমার। সাধু লোকদের নতজানু হয়ে ভিক্ষে করতে হয় না। আপনি আত্মহত্যা করলে দুঃখিত হবো আমি কিন্তু আপনার মৃত্যুর জন্যে কোনক্রমেই দায়ী হবো না। ওই নেকলেস আমি তৈরি করতে বলিনি, ওটার কোন দরকারও নেই আমার। ওই প্রসঙ্গ দয়া করে আর ওঠাবেন না। আমার মেয়ের সামনে এমন নাটকীয় আচরণের জন্যে আমি খুশি হতে পারিনি। এমন আর করবেন না। এখন যান।'

চলে গেলেন তিনি। আমিও পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। পরে জেনেছি, কন্সট্যানটিনোপ্লের সুলতান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্যে

হারটি কিনেছিলেন। আমিও স্বস্তি পেলাম।

ত্রায়ানোয় বেশিক্ষণ সময় কাটাচ্ছি। নাট্যামঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে, পালা নামাবার পরিকল্পনা করে দলকে খবর দিয়েছি। দলে আছে এলিজাবেথ, আরতোঁ, ও কয়েকজন বন্ধু।

আমার জা মারি যোসেফি যোগ দিতে চায়নি। প্রম্পটার হিসেবে রয়েছেন মঁসিয়ে কঁপাঁ। ওদিকে আমার নিন্দেয় জনগণ আবার আগের মতো উৎসাহ পাচ্ছে। প্রচারপত্র বেরোবার হার লক্ষ্য করার মতো, আমিই সে সবের মধ্যমণি। আমাকেই বেছে নেওয়ার কারণ মাথায় আসেনি আমার। বোধ হয় আমি বিদেশিনী বলেই। বিগত দিনে ফরাসীরা ঘৃণা করতো ক্যাথারিন মেডিসিকে, কারণ তিনি ছিলেন ইতালীয়, এখন করছে আমাকে, কারণ আমি অস্ট্রিয়। আরতোঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে ছোট একটা বইও বেরিয়েছে। একদিন রাজার হাতে একটি পুস্তিকা পড়লো, নাম 'আঁতোয়ানেতের পারিবারিক জীবন'। বইটা রাখা হয়েছিলো ওঁর একান্ত নিজস্ব কামরায়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আমাদের ঘরের মধ্যে শত্রুদের গুপ্তচর রয়েছে।

আবার একটা বেরোলো উত্তমপুরুষের বয়ানে অর্থাৎ আমি নিজেই স্বীকারোক্তি করছি। 'ক্যাথারিন দ্য মেডিসি, ক্লিওপেট্রা, অ্যাগ্রিপ্পিনা, মেসালিনা, আমার অপরাধ তোমাদের ছাড়িয়ে গেছে। তোমাদের পাপের স্মৃতি যদি মানুষকে এখনও শিহরিত করে তুলতে পারে, তাহলে কতখানি আলোড়ন তুলবে অস্ট্রিয়ার নিদয়া আর কামুক মারী আঁতোয়া-নেতের কাহিনী···অমার্জিতা এক রানী, এক ব্যভিচারী স্ত্রী, যার ইতিহাস উচ্ছৃঙ্খলতা আর যৌন অনাচারে মসীময়···। বইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিলাম। কেউ ওসব কথায় গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এই বই বার বার মুদ্রিত হয়ে অসংখ্য বিক্রি হয়েছে, এমন কি এখনও বাজারে চালু আছে।

এ সব যজ্ঞের হোতাদের খুজে বের করে প্রকাশ্যে তাদের এই জঘন্য মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিয়ে শাস্তি বিধান করাই উচিত ছিলো আমার। তাহলে হয়তো এই দুর্দশায় আজ আমাকে পড়তে হতো

না। আমি করেছি ঠিক বিপরীত। বিরক্তিতে অস্থির হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে ত্রায়ানো চলে গেছি। আমার নিজস্ব ছোট জগতে যেখানে আমন্ত্রণ ছাড়া কারুরই পা দেবার অধিকার ছিলো না, এমন কি রাজারও। ওখানে বাগান নিয়েও সময় কাটতো। সারা পৃথিবীর দুর্লভ গাছপালা আনিয়ে কয়েকশো মালী লাগিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তৈরি করিয়েছি। ত্রায়ানোর আশেপাশে জলের উৎস না থাকায় সুদূর মালে থেকে পাইপ দিয়ে জল এনে তৃণভূমির বুকের ওপর ছোট্ট নদী বইয়ে দিয়েছি।

নদীর ওপর গাঁয়ের সেতুর অনুকরণে একটা সেতু বানানো হলো। নিন্দুকরা বলে—সোনা আনলেও এতটা খরচ পড়তো না। একটা পুকুর ও দ্বীপ তৈরি হলো। এরপর সেরা স্থপতি মঁসিয়ে মিকুয়ের নক্সা ও শিল্পী মঁসিয়ে রবার্টের শিল্পশৈলী অনুযায়ী তৈরি হলো আটটি কুঁড়েঘর সমেত সম্পূর্ণ অকৃত্রিম একটি গ্রাম যেখানে আটটি চাষী পরিবার গরু, ভেড়া, শুয়োরের পাল নিয়ে দিব্যি রইলো। খাঁটি দুধ ও মাখন হতে লাগলো। তারপর হলো থিয়েটার, মাত্র একশো একচল্লিশ হাজার লিভারের বিনিময়ে। একটার পর একটা শখ মিটিয়েছি। টাকার অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

কিন্তু চারদিকের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠছে শুধুমাত্র ঐ একটা চাহিদায়—অর্থ। ভাবতে এতো বিরক্তি লাগে আমার। দেশের অর্থনৈতিক অধিকর্তার পদ দেওয়া হয়েছে মঁসিয়ে নেকারকে। তুর্গোর নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নেকার জাতে সুইস, কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি আবার প্রোটেস্টাণ্ট। দীর্ঘদিন কোন প্রোটেস্টাণ্টকে উঁচু পদে বহাল করা হয়নি। এতেই বোঝা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানে কি রকম উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন রাজা। রাজ-পরিবারের ব্যয় সংকোচের দিকে নজর দিলেন নেকার। আমাদের চাকরবাকরের সংখ্যা ছিলো অগুনতি। একমাত্র মাদাম রয়েলেরই ছিলো আশিজন পরিচারক-পরিচারিকা। চাকরবাহিনী ছাড়া আমরা নড়তাম না। চারশো ছজনকে ছাঁটাই করা হলো. আরও করা হবে বলে স্থির হলো।

নেকার চেয়েছিলেন জনপ্রিয় হতে। আমার সমালোচনায় নামলেন না তিনি। জানি, এর মূলে ছিলেন রাজা স্বয়ং, আমার আমোদ-আহ্লাদে বাধা দিতে তিনি চাননি। কিন্তু অর্থের অনটন সর্বত্রই অনুভূত হতে লাগলো। অপবাদ তুঙ্গে উঠলো যখন প্রিন্স দ্য গুইমিনি দেউলিয়া হয়ে গেলেন। এতে তাঁর সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হলেন। তাঁর চাকর-বাকরের বিরাট বাহিনী ছাঁটাই হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলো। কাজেই তাঁর স্ত্রীও আর রাজশিশুর ধাত্রী থাকতে পারেন না। ওঁর জায়গায় মনোনীত করলাম আমার প্রিয় পাত্রী গ্যাব্রিয়েলকে।

ওর আমার বন্ধুত্বের মধ্যে কোন স্বার্থের হাতছানি ছিলো না। কিন্তু তা নিয়েও কানাকানির অন্ত ছিলো না। গ্যাব্রিয়েলের স্বামীকে ডিউক বানিয়ে দেবার জন্যে রাজাকে অনুরোধ করেছিলাম। উনিও তা করে-ছিলেন। তবুও ওই পরিবারের কারও না কারোর চাকরির দরকার হচ্ছিলোই। কাজেই সরকারি অর্থের একটা অংশ ওই সুড়ঙ্গপথে অবিরাম গলে যাচ্ছিলো।

জুন মাসের এক মনোরম দিনে বসে বসে হার্পসিকর্ড বাজাচ্ছিলাম। বয়স আমার আরও এগিয়ে গেছে, এখন আটাশ। আনমনে ভাবছিলাম বৃদ্ধ বয়সে কি নিয়ে সময় কাটবে আমার। মেয়ের বয়স পাঁচ পূর্ণ হতে চলেছে, ছেলের দুই। এমন সময় দরজায় কারও আগমনের সঙ্কেত শুনলাম। বাদ্যযন্ত্র থেকে চোখ তুলে প্রিন্সেস লঁব্যালের দিকে তাকালাম, ও উঠে দেখে বললো একজন অতিথি দেখা করতে চান আমার সঙ্গে।

ওকে দেখেই চমকে উঠলাম। ওরও মুখের ওপর বয়সের ছাপ পড়েছে কিন্তু ওর সৌকুমার্য তাতে একতিলও কমেনি। আগের চেয়েও যেন আরও আভিজাত্য এসেছে ওর চেহারায়।

আক্সেল দ্য ফের্সেন আমার দিকে এগিয়ে এলেন। উঠে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওতে চুম্বন আঁকলেন তিনি।

হঠাৎ যেন জীবনের জোয়ারে ভেসে গেলাম। বয়স বাড়ার সেই

ক্লান্তিকর ভাবনা হঠাৎই অন্তর্হিত হয়ে গেলো। ফের্সেন ফিরে এসেছেন।

খুশিতে ভরে গেলো তারপরের দিনগুলো। ও আসতে লাগলো আমার বসবার ঘরে, আরও অনেকের উপস্থিতি সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা এবং অন্তরঙ্গতার বিনিময় হতে কোন বাধা ছিলো না।

'এখন কিছুদিন ফ্রান্সে থাকছো তো?'

'তার জন্যে তো কোন একটা অজুহাত দরকার।'

'বলার মতো কিছু নেই তোমার?'

'হৃদয়ের মধ্যে কিছু অবশ্যই রয়েছে কিন্তু সেটা তো আর সবাইকে বলা যাবে না।'

ওর মুখ থেকে শুনলাম ওর পরিবারের ইচ্ছে, ও সুইডেনে ফিরে গিয়ে ওখানেই স্থিত হয়ে বসুক। ওর বিয়ে হোক। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবুক। সেটা তো ফ্রান্সে বসে সম্ভব হবে না।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হতাশার হাসি ফুটলো দুজনের মুখে। আমরা তো গোড়া থেকেই জানতাম প্রেমিক প্রেমিকার ভূমিকা আমাদের জন্যে নয়। ও সব জঘন্য পুস্তিকায় আমার যে ছবি আঁকা হয়েছে, আমি তো তার থেকে একেবারে আলাদা। আমি রুচিবিকৃত নই। অন্তরে আমি রোম্যান্টিক। দেহদানের বাসনা আমাকে উদ্বেলিত করে না। প্রেমে আমার অগাধ বিশ্বাস, প্রেম আমার কাছে সেবা, ভক্তি, স্বার্থহীনতা··· আদর্শ। আক্সেল তাই আমাকে দান করেছে বলে আমার বিশ্বাস। ওর দেহের প্রতি আকর্ষন আমার নেই, একটুতেই ফুরিয়ে যাওয়া সহ্য হয় না আমার। ভাবি যে, আমি সাধারণ একজন অভিজাত মহিলা, ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার, ত্রায়ানোর মতো কোন নির্জন জায়গায় আমাদের আদর্শ জীবন কাটছে। এমন স্বর্গীয় ভাবনার মধ্যে কোন কটু স্বাদকে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত নই আমি।

তার ওপর দুটি সন্তানের জননী আমি। আমার চোখে ওরা পবিত্র। এবং ওরা লুইয়ের সন্তান। ওদের অন্যপ্রকার ভাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মেয়ে, মাদাম রয়েল ওর বাবার আদল পেয়েছে। সুতরাং আমার স্বপ্নের কোন মানে নেই। তবু আমি চাই আক্সেল ফ্রান্সে থাকুক।

এমন সময় সুইডেনের রাজা গুস্তাভের একটি চিঠি পেলেন লুই। তিনিও প্রত্যাশা করেন যে, ফ্রান্সের রাজা ফের্সেনকে এমন কোন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করবেন যাতে ফের্সেনের পক্ষে স্বদেশেরই সেবা করার সুযোগ হয়। আমিও কালবিলম্ব না করে এতে সম্মতি জানাতে অনুরোধ করলাম লুইকে। রাজা তাঁকে ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বহাল করলেন। দরবারে আসা-যাওয়ায় আর কোন অসুবিধে রইলো না ফের্সেনের। 'বাবা কিন্তু খুশি হননি,' আক্সেল জানালো। 'উনি ভাবছেন, আমি আমার সময় নষ্ট করছি।'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে, তাই না?' মুচকে হাসলাম।

'কিন্তু এমন সুখদায়ক অপব্যবহার আর হয়না।'

'তাই বুঝি! আজ রাতে একটা বাজনার মজলিশ আ:ছ। তোমাকে আশা করছি।'

এ ভাবেই সময় কাটতে লাগলো।

ফের্সেনের বাবা কিন্তু বসে থাকার লোক নন। জানালেন, ছেলে যদি ফ্রান্সেই সময় নষ্ট করতে চায়, তাহলে বরং বিয়ে করুক। ওর সঙ্গে মানাবে এমন একটি প্রকৃত সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করে রেখেছেন তিনি! তার বিত্তবৈভবের অভাব নেই, তার বাবা ফ্রান্সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, মেয়েটির যা দরকার তা হলো একজন অভিজাত, উঁচুপদে অধিষ্ঠিত স্বামী। মেয়েটির বাবা হলো জারমেন নেকার, ফান্সের বর্তমান অর্থনৈতিক অধিকর্তা।

আক্সেলের মুখে কথাটা শুনে হতাশ হলাম। ওর বিয়ে হলে, আমাদের প্রেমের ইতি। আমি বিবাহিতা, আক্সেলকে বিয়ে করার কোন ভবিষ্যত-সম্ভাবনাও আমার নেই কিন্তু বিবাহিত প্রেম-গীতিকবির কথাই বা কে কবে শুনেছে? বললাম 'রাজি হয়ো না।' আক্সেল সায় দিলো কেমন যেন মনমরাভাবে। ওদিকে নেকাররা আক্সেলের বাবার প্রস্তাবে খুশিই হয়েছিলেন। এখন আক্সেল যদি বিয়ের প্রস্তাব না করে মাদমোয়াজেল নেকার স্বভাবতঃই দুঃখ পাবেন। 'ওর জন্যে আর একটা বর খুঁজতে হবে আমাদের,' আবার বললাম, 'যাকে আরও বেশি মনে ধরবে ওর।'

মাদমোয়াজেল নেকার সত্যিই দৃঢ়চেতা মেয়ে। জানালো যে, যাকে মনে ধরে তাকেই বিয়ে করবে সে। কেন জানিনা, আক্সেলকে তেমন পছন্দ হলো না ওর। কিছুদিন ধরে ওর প্রেম চলছিলো ব্যারন দ্য স্টেলের সঙ্গে, স্থির করলো ওকেই বিয়ে করবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ও হয়ে গেলো মাদাম ব্যারন দ্য স্টেল।

আক্সেলের বোন শোফির কাছে লেখা মাদাম নেকারের একটা চিঠি আক্সেল দেখালো আমাকে। তাতে ও লিখেছে, 'বিয়ের ফাঁদে কখনও পা দেবো না আমি। ওটা আমার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।...যার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার অভিলাষ আমার এবং যে আমাকে ভালবাসে, তাকে যখন পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, আমি নিজেকে আর কারও কাছেই তুলে ধরবো না।'

সুতরাং আমাদের প্রেমে ফাটল ধরলো না।

১৭৮৫ সালের মে মাসে আমার দ্বিতীয় ছেলের জন্ম হলো। লুই নিজেই আমার বিছানার পাশে এসে ঘোষণা করলেন, 'আর একটা সুন্দর ছেলের অধিকার পেলাম আমরা।' পারীতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারিত হলো এই সংবাদ। নতারদাম গীর্জায় ওকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ। ওর নাম রাখা হলো লুই চার্লস্। চার দিন-রাত ধরে ভার্সাইতে উৎসব পালন করা হলো।

আমার আনন্দ বাঁধনছেড়া, সব স্বপ্নই সত্যি হয়ে উঠলো। এখন আমি দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের মা। কিন্তু কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছি এই নিষ্পাপ শিশুকে আমি টেনে আনলাম জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের মধ্যে!

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে আপাত-বৈষম্য তেমন করে

চোখে পড়বে না। বেশ মজা করেই দিন কাটাচ্ছি বলে মনে হবে। তিনটি সন্তানকে নিয়ে কখনও ভার্সাইতে, কখনও ত্রায়ানোতে দিন কাটাচ্ছি। সঙ্গী সাথীদের নিয়ে থিয়েটার করার কথাও ভাবছি। আরতোঁ তো হৈ হুল্লোড়ের সঙ্গী হিসেবে হাতের কাছেই রয়েছে। কিছুতেই যেন তৃপ্তি হচ্ছে না আমার। রাজা আর্থিক ব্যাপারে যতই অসুবিধের মধ্যে দিন কাটান না কেন, আমার ব্যাপারে ওঁর দিল এখন যেন আরও বেশি দরাজ। আমি তাঁকে তিন তিনটে সন্তান উপহার দিয়েছি, এতে ওঁর খুশি যেন আর বাঁধ মানছে না।

বারবার দেখেছি, এই আপাত-শান্ত পরিবেশের মধ্যেই হঠাৎ জন্ম নেয় কোন অশুভ ছায়া, যা মুহূর্তের মধ্যেই আমার নীল আকাশকে কালো মেঘে ঢেকে দেয়। নইলে যে ঘটনার সঙ্গে আমার কোনদিন বিন্দুমাত্রও যোগাযোগ ছিলো না, তার কলুষতার পঙ্কে আমি এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাবো কেন?

রাজা সেবার স্থির করলেন যে, আরতোঁর ছেলেকে তিনি একটা হীরের অলঙ্কার উপহার দেবেন। সময়টা হলো ১৭৮৫ সালের আগষ্ট মাসের গোড়ার দিক, আমার কনিষ্ঠ ছেলের জন্মের পাঁচ মাস পরে। ওই বিশেষ অলঙ্কারটি তৈরি করার ভার দিলেন রাজপরিবারের রত্নকার বোহেমার এবং বাসেঁগেকে, হুকুম করলেন ওটা যেন আমার হাতে দেওয়া হয়।

সেদিন আমার সঙ্গে ছিলো মাদাম কঁপা। পরিচারিকা এসে জানালো যে, মঁসিয়ে বোহেমার অলঙ্কারগুলো নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে আমার জন্যে একটি চিঠিও এসেছেন।

চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলাম। ‘মাদাম, আপনার সর্বশেষ হুকুম আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে আনন্দিত হয়েছি। আপনার প্রতি আমরা যে কত অনুগত এবং বশংবদ এটা তারই প্রমাণ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হীরেগুলো এখন পৃথিবীর সবচেয়ে মাননীয়া ও সুন্দরী রানীর কণ্ঠদেশে শোভা পাচ্ছে এমন চিন্তাও আমাদের পক্ষে একান্ত সুখকর…’

বিব্রত হয়ে চিঠিটা মাদাম কঁপাঁকে দিলাম। 'তুমিই পড়ে আমায় বলো লোকটা কি বলতে চাইছে?'

চিঠিটা পড়ে সেও অবাক হলো। বিরক্তিভরে বললাম, 'লোকটা কি যে জ্বালিয়ে মারছে আমায়! তুর্কির সুলতানের কাছে সে যদি হীরের নেকলেসখানা বিক্রি না করে থাকে, সেটা আমাকে গছাতে চাইছে। অথবা তার কাছে আরও কিছু হীরে রয়েছে, যা আমি কিনি, এটাই উদ্দেশ্য ওর। ওর সঙ্গে তোমার দেখা হলে ওকে বোলো যে, হীরে এখন আর ভালো লাগে না আমার, সারা জীবনে আর একটি টুকরোও কিনবো না আমি।'

'আপনার কি ইচ্ছে, ওর সঙ্গে দেখা করি আমি?'

'না। তার কোন দরকার নেই। সুযোগ এলেই ওকে জানাবে। ওর সঙ্গে এই ব্যাপারে যদি দেখা করতে যাও, একে ভিত্তি করেই হয়তো নতুন কোন চাল চালবে শয়তান লোকটা।'

'আমার শ্বশুরের কাছে লোকটা প্রায়ই যায়। ওখানেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে আমার।'

'বেশ তো।'

আগুনের শিখায় ধরলাম ওর চিঠিখানা। পুড়ে ছাই হতে হতে ভাবলাম, হীরের স্মৃতি চিরতরে মুছে যাক আমার জীবন থেকে।···

কিন্তু তা যেন হবার নয়।

মাদাম কঁপাঁ কয়েকদিনের জন্যে ভার্সাই ছেড়ে ওর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলো। ওর ফিরে আসার আগেই একদিন মঁসিয়ে বোহেমার ত্রায়ানোতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন, জানালেন যে, মাদাম কঁপাঁ নাকি ওঁকে বলেছেন আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে।

'মঁসিয়ে বোহেমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইনে আমি।' পরিচারিকাকে বললাম। 'লোকটা বদ্ধ পাগল। ওকে এটা বলে দাও।'

তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম একটা নতুন নাটকের মহড়ায়। আমার ভূমিকা ছিলো নায়িকার।

এর কিছুদিন পর কঁপাঁ ফিরে এলে ওকে কথাপ্রসঙ্গে জানালাম,

'বোহেমার আবার এসেছিলো আর তুমিই নাকি তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে। ওর সঙ্গে দেখা করিনি। কিন্তু ব্যাপার কি? তুমি কিছু জানো?'

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে আমার শ্বশুরবাড়িতে।' মাদাম কঁপাঁ ভেঙে পড়লো। 'আপনাকে সে সব জানাবার অনুমতি দেবেন?'

'স্বচ্ছন্দে বলো।'

'সেদিন ভদ্রলোক এসেছিলেন শশুর মশায়ের ওখানে খানার নেমন্তন্নে। আপনার খবরটা ওঁকে দেবার সুযোগ হলো আমার। বিশ্বাস করবেন না, ওটা শুনেই একেবারে হতচকিত হয়ে পড়লেন উনি। তোতলাতে তোতলাতে বললেন যে, আপনার কাছে একটা চিঠি দিয়ে ছিলেন, কোন জবাব পাননি। বললাম, ওই চিঠি আমি দেখেছি, ওর অর্থ আমাদের বোধগম্য হয়নি! বললেন যে, রাণী নিশ্চয়ই ওর মানে বুঝতে পেরেছেন। তখন অন্যান্য অভ্যাগতরা আসতে শুরু করায় ওঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ওঁর কাছে বিদায় নিতে চাইলাম। ভদ্রলোক যেন অকূল পাথারে পড়েছেন এমন ভাবে জানালেন, পরে এই ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে যেন আর একটু কথা বলি। বাগানে দুজনে বেড়াবার ছল করে ওঁকে একটু সময় দিলে সব পরিষ্কার করে বলবেন আমায়।'

'লোকটা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।'

'ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য কিন্তু ভদ্রলোক শপথ করে বললেন যে, এর প্রত্যেকটি কথাই সত্য।'

'কি সত্য?'

'বললেন, আপনার কাছে উনি অনেক টাকা পান।'

'তার মানে? ওর হিসেবপত্র তো চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'বললেন, 'রানী আমার হীরের নেকলেসটি কিনেছেন'।

'কি বললো? ওটা তো কিনেছে তুর্কির সুলতান!'

'তিনি তো বললেন ওটা সত্যি নয়। ওটা নাকি সাজানো ব্যাপার। আমি প্রতিবাদ জানাতে বললেন—'রানী মত বদলে ছিলেন'।'

'এ সবের মানে কি, কঁপাঁ?' আমি অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'কি করে জানবো বলুন? কিন্তু মঁসিয়ে বোহেমার ভারি অবিশ্বাস্য একটা গল্প শুনিয়েছেন আমায়। উনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, আপনিই কিনেছেন সেই নেকলেসটি। আমি বলেছি, এটা অসম্ভব। আপনার গয়নাগাটির মধ্যে ওই হার কখনও চোখে পড়েনি আমার।'

'কোন মানে হয় না এসবের!' আমার গলায় ক্ষোভ। 'আমি তোমাকে বলছি লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'হতে পারে। কিন্তু খুব নিশ্চিতভাবে উনি এসব বলছিলেন। অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কখন হারটি কিনবেন বলে ওঁকে জানিয়েছিলেন, কারণ আমার ধারণায় ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও আপনার ছিলো না। জবাবে উনি বললেন যে, কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ আপনার হয়ে এই যোগাযোগের কাজটি করেছেন।'

'কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ! তাহলে ওই ভদ্রলোকও নির্ঘাত পাগল। তাছাড়া রোহাঁকে ভয়ানক অপছন্দ আমার। গত আট বছর ধরে ওঁর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি আমি।'

'বোহেমারকে সে কথা জানাতে ভুল হয়নি আমার। তিনি বললেন, ওটা আপনার একটা ভান।'

'ক্রমশই মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।'

'আমারও সেই অবস্থা হয়েছিলো। অথচ বোহেমার বারবার জোর দিয়ে বলছিলেন, ওঁর বিবৃতির মধ্যে এতটুকু মিথ্যের ভেজাল নেই। প্রত্যেক প্রশ্নেরই জবাব যেন ওঁর জানা ছিলো। আপনার হুকুম ওঁর কাছে পৌঁছেছে আপনার চিঠি মারফৎ যাতে আপনি সই করেছেন। ওঁর মহাজনদের সেই সই দেখিয়ে রাজি করিয়েছেন উনি। নেকলেসের দাম কিস্তিতে শোধ করবার কথা, কার্ডিনাল দ্য রোহাঁর হাতে আপনার দেওয়া ত্রিশহাজার ফ্রাঁ ইতিমধ্যেই হস্তগত হয়েছে ওঁর। তারপরেই হারটি রোহাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে।'

'কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার।' চিৎকার করে বললাম। বুঝতে পারছি এটা একটুও হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গভীর কোন চক্রান্ত। 'মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে বোহেমার

বিরাট কোন জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। ওঁকে এক্ষুনি ডাকো।'

অবিলম্বে পারীতে একজন লোক পাঠিয়ে মঁসিয়ে বোহেমারকে ত্রায়ানোতে ডাকিয়ে আনলাম।

'মঁসিয়ে বোহেমার, যে হার কেনার ব্যাপারে আমি বারবার অসম্মতি জানিয়েছি, সেটা আমিই কিনেছি—এমন একটা আজগুবি কাহিনী আপনি কেন প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তার কারণ জানতে পারি কি?'

'মাদাম, এই অপ্রিয় কাজটি করতে বাধ্য হয়েছি আমি। মহাজনদের দেনা তো আমাকে মিটিয়ে দিতে হবে?'

'কিন্তু আপনার মহাজনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?'

'মাদাম, ভান করার আর কোন উপায় আমাদের নেই। আপনি যতক্ষণ না জানাচ্ছেন যে, হারটি আপনার কাছে রয়েছে এবং সেই বাবদ আমাকে কিছু টাকা না দিচ্ছেন, আমাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হবে এবং তাঁর কারণও অন্যদের অজানা থাকবে না।'

'আপনি হেঁয়ালি করছেন, মঁসিয়ে বোহেমার। ওই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।'

'আমি মাফ চাইছি, মাদাম।' ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেলো। 'দয়া করে টাকাটা আমায় দিয়ে দিন।'

'আমি বলছি আমার কাছে আপনার কিছু পাওনা নেই। আপনার নেকলেস আমি কিনিনি। আপনি তো জানেন অনেকদিন ওটা আমি দেখিইনি।'

'মাদাম, কার্ডিনাল ছা রোহাঁর হাতে হারটা তুলে দেবার সময় প্রথম কিস্তির টাকা আমি পেয়েছি। বাকিটাও আমার পাওয়া দরকার...'

'ব্যাপারটা নিছক জালিয়াতি।' আমি বললাম। 'এটার তদন্ত দরকার। আপনি এখন যান, মঁসিয়ে বোহেমার। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি বিষয়টির তদন্ত করবো একটুও দেরি না করে।'

বিদায় নিলেন উনি। শোবার ঘরে গেলাম। ক্ষোভে কাঁপছিলাম আমি। আমার চারপাশে এমন সব জঘন্য ঘটনা ঘটে চলেছে আর এ সবের মূলে রয়েছে ওই নষ্টচরিত্রের লোকটা—কার্ডিনাল ছা রোহাঁ। এই

লোকটা সম্পর্কে মা আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। ধর্মযাজকের পেশার পক্ষে লোকটি একেবারে অযোগ্য। ওর নৈতিক চরিত্র সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ওর দিকে ঘৃণার চোখে না তাকিয়ে পারিনি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওকে ফ্রান্সের প্রধান ধর্মযাজকের পদে উন্নীত করা হয়েছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার ছেলেদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছে ও। রোহাঁর খুড়তুতো বোন মাদাম দ্য মারসাঁ লুইকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, রোহাঁকেই যেন ওই পদটি দেওয়া হয়। লুই তো কাউকেই অখুশি করতে চান না, তাই কথা দিয়েছিলেন। আমি যখন জানতে পারলাম ব্যাপারটা, ওটা রদ করার চেষ্টার ত্রুটি করিনি। লুইকে জানালাম যে, এই ভদ্রলোক এক সময় আমার মাকে অপমান করেছিলেন। স্বামী বললেন, মাদাম দ্য মারসাঁর কাছে কথা দিয়েছেন উনি, সে কথা তো আর তুলে নেওয়া যায় না।

অনেক জল ঘোলা করেও কিছুতেই কিছু করা গেলো না। রোহাঁ ওই পদে বহাল হলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই ওঁকে স্বীকৃতি দিলাম না। ওঁর প্রতি আমার ঘৃণা দিন দিন এতই বাড়তে লাগলো যে, ওঁর কথা ভাবাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই রোহাঁই পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা স্বামীকে জানাতে একটুও দেরি করলাম না। লুই গম্ভীর মুখে সব শুনে বললেন—প্রকৃত কি ঘটেছে সেটা বোহেমারের মুখ থেকেই শোনা দরকার। বোহেমারের বক্তব্য শোনা হলো। রানীর নাম করে কার্ডিনাল রোহাঁ ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে। শুনে রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। লুইকে বললাম, রোহাঁকে পদচ্যুত করো। ওঁর সব ক্ষমতা কেড়ে নাও। ওঁকে গ্রেপ্তার করার প্রতিশ্রুতি দাও আমাকে।'

'কার্ডিনাল রোহাঁকে গ্রেপ্তার করবো। কিন্তু···'

'তিনি আমার নাম টেনে এনেছেন। মিথ্যে আর প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তার চাই, লুই।'

'ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।' লুইয়ের গলায় অস্বস্তি। 'এখনও সব কিছু পরিষ্কার নয় আমাদের কাছে।'

'পরিষ্কার নয়? বোহেমারের বক্তব্য তো শুনলে। ওঁকে গ্রেপ্তার না করলে বুঝবো যে, ওই গাঁজাখুরি গল্পে তোমারও বিশ্বাস জন্মেছে।'

'কখনই নয়। কিন্তু…'

'তাহলে ওঁকে গ্রেপ্তার করো।'

'তাই হবে।' লুই কথা দিলো। আমিও খুশি হলাম।

দিনটা ছিলো পনেরোই আগষ্ট। রাজা ডেকে পাঠালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারন দ্য ব্রেতেয়ুঁ এবং আইনরক্ষক মঁসিয়ে দ্য মিরোমেসনিলকে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

রাজা সমস্ত ব্যাপারটা ওঁদের কাছে খুলে বললেন। এও বললেন যে, উনি কার্ডিনাল রোহাঁকে গ্রেপ্তার করতে চান। মিরোমেসনিল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'হুজুর, মঁসিয়ে রোহাঁ মানী লোক। গ্রেপ্তার করার আগে ওঁর বক্তব্যও আমাদের শোনা দরকার।'

সংশয়ে দুলে উঠলেন লুই। মিরোমেসনিলের সঙ্গে একমত হতে দেরি হলো না ওঁর।

'কিন্তু আমার সই জাল করে একটা জালিয়াতের মতো আচরণ করেছেন উনি। ওঁর গ্রেপ্তার চাই।' জোর গলায় বললাম।

সায় দিলেন ব্যারন ব্রেতেয়ুঁ। 'তাঁর আসন এবং নাম—দুটোরই অপব্যবহার করেছেন তিনি।' ক্ষমার যোগ্য নন।'

স্পষ্টই বুঝলাম, একদিকে ন্যায়বিচার, অন্যদিকে আমাকে খুশি রাখা—এই দুই মনোভাবের দোলায় দুলছেন আমার স্বামী। আমি করুণ চোখে তাকালাম ওঁর দিকে।

রাজা স্থির করলেন, রোহাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

কার্ডিনাল রোহাঁকে দুপুরে ডেকে পাঠান হলো।

'আপনি কি বোহেমারের কাছ থেকে হীরে কিনেছিলেন?'

রোহাঁর মুখ পাংশু হয়ে গেলো। তবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, মহামান্য।'

'সেগুলো কোথায়?'

'আমার বিশ্বাস ওগুলো রানীকে দেওয়া হয়েছে।'

আমি রাগে গরগর করে উঠলাম কিন্তু রাজা তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। 'হীরে কেনার হুকুম কে দিয়েছিলো আপনাকে ?'

'কঁতেস দ্য লা মোৎ ভেলোয়া নামে একজন মহিলা। তিনি মহামান্যা রানীর একটা চিঠি আমাকে দিয়েছিলেন। ভাবলাম কাজটা করে রানীকে খুশি করা আমার কর্তব্য।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। 'আপনি, যাঁর সঙ্গে গত আটবছরে একটি কথারও বিনিময় হয়নি আমার, আপনি কি করে ভাবলেন যে, এমন একটা কাজের দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করবো আমি ? আর এই জাতীয় একজন মহিলাকে দিয়ে এমন কাজ করাবো—ব্যাপারটা কি একটুও অবিশ্বাস্য মনে হলো না আপনার ?'

'বুঝতে পারছি আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে।' কার্ডিনাল রোহাঁ কাঁপছিলেন। 'হারের দাম আমিই শোধ করবো।' এমন চোখে আমার দিকে তাকালেন যেন উনি আমার কৃপা প্রত্যাশী। 'আপনাকে খুশি করার আকাঙ্খাই আমাকে অন্ধ করে ফেলেছিলো। জোচ্চুরির কথা মনেই আসেনি। খুবই দুঃখিত আমি। মহামান্য রাজা কি প্রমাণ দেখতে চান যে, কি ভাবে এতে জড়িয়ে গেছি আমি ?'

রাজা অনুমতি দিলেন। কাঁপা কাঁপা আঙুলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওঁর হাতে দিলেন মঁসিয়ে রোহাঁ। হারটি কেনার আদেশপত্র। যেন আমিই চিঠিটা লিখেছি কোন এক কঁতেস দ্য লা মোৎ ভেলোয়া নামে মহিলাকে। 'ওটা আমার হাতের লেখা নয়।' আমার কণ্ঠে বিজয়ের ধ্বনি বেজে উঠলো।

'দেখুন,' রাজা বললেন, 'সই করা হয়েছে "মারী আঁতোয়ানেৎ দ্য ফ্রাঁস" বলে।' ওঁর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠলো। 'এটা যে ফ্রান্সের রানীর সই এমন কথা আপনার মতো বিদগ্ধ মানুষের মনে হলো কি করে ? আপনার তো জানা আছে যে রানীরা তাদের খ্রিস্টিয় নামেই শুধু সই করেন, রাজার মেয়েদেরও অন্য কোন ভাবে সই করা চলে না। আমার কাছে একটি চিঠি রয়েছে। আপনিই লিখেছেন বোহেমারকে। দেখে বলুন তো যে, এটা জাল নয়।'

কার্ডিনাল একটু এগিয়ে এলেন। লুই ওঁর হাতে তুলে দিলেন চিঠিটা।

'কখন কবে চিঠিটা লিখেছিলাম মনে পড়ছে না আমার, মহামান্য।'

'ওতে আপনার সই রয়েছে। ওটা কি আপনার সই?'

'হ্যাঁ, মহামান্য। আমারই সই।'

'আমি এক্ষুনি এসবের মানে জানতে চাই।' রাজা বললেন। 'আপনি যে অপরাধী, এমন প্রমাণ আমার অভিপ্রেত নয়। আমি চাই আপনার আচরণকে সমর্থন জানাতে।'

'আপনাকে এই মুহূর্তে সব কিছু বুঝিয়ে বলার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই। আমার অবস্থা এমন যে…'

'নিজেকে শান্ত করুন, মঁসিয়ে কার্ডিনাল।' রাজা নরম গলায় বললেন। 'ওখানে কালি, কলম, কাগজ সবই রয়েছে। আপনার যা বলার লিখে ফেলুন।'

কার্ডিনাল সরে গেলেন।

'ভদ্রলোক পয়লা নম্বর অপরাধী।' ব্রেতেয়্ মন্তব্য করলেন।

রাজা নির্বাক রইলেন। ওঁর চোখে মুখে ফুটে উঠলো বেদনা।

সোয়া ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হলো আমাদের।

তারপর কার্ডিনাল ফিরে এলেন। কাগজে মাত্র কয়েক লাইন লিখেছেন উনি। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে দুজনে একসঙ্গে পড়লাম ওটা। ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে। কে একজন কঁতেস মোৎ ভেলোয়া ওঁকে জানিয়েছিলেন যে, হারটা আমার জন্যে কেনা হবে ওঁর মাধ্যমে। উনি এখন ভাবছেন যে, ওই মহিলা ওঁকে প্রতারিত করেছেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজা কাগজটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। 'এই মহিলা কোথায় থাকেন?'

'জানিনা, মহামান্য।'

'নেকলেসটি এখন কোথায়?'

'ওই মেয়েটির হাতে।'

'রানী সই করেছেন বলে যে সব দলিল তৈরি হয়েছে সেগুলো

কোথায় ? সবকিছু পরিষ্কার করে খুলে বলুন।'

'আমার কাছেই রয়েছে। ওগুলো জাল।'

'আমরা সবাই জানি, ওগুলো জাল।'

'মহামান্য, ওগুলো আপনার হাতে তুলে দেবো।'

'আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

ওঁর মুখ কালো হয়ে গেলো। 'আপনার আদেশ বরাবরই শিরোধার্য করে এসেছি, কিন্তু দয়া করে এই যাজকের পোশাকে গ্রেপ্তার করবেন না আমায়।'

রাজা দ্বিধায় পড়লেন। আমার দিকে তাকালেন। আমি দাঁতে দাঁত চেপে আমার মনোভাব ব্যক্ত করলাম যে, এই লোকটার জন্যে আমার মনে একটুও ক্ষমা নেই।

'আমি দুঃখিত, এভাবেই করতে হবে ব্যাপারটা।'

'আপনি তো আমাদের দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করবেন।' কার্ডিনাল অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন।

রাজার মধ্যে সেই দ্বিধা সংশয়ের দোলা। দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেলো। তা দেখে রাজা নিজেকে শক্ত করলেন। 'মঁসিয়ে, আপনার পরিবারকে আমি যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবো। আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে আমিই খুশি হতাম সবচেয়ে বেশি। কিন্তু রাজা এবং স্বামী হিসেবে নিজের কর্তব্য আমায় করতেই হবে।'

ব্রেতেয়ুঁ উঁচুগলায় রাজার আদেশ জানালেন প্রধান রক্ষককে। 'কার্ডিনাল দ্য রোহাঁকে গ্রেপ্তার করুন।'

আমি তো বেজায় খুশি। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখি সবাই কেমন চুপচাপ, গম্ভীর। গ্যাব্রিয়েল আমার কাছে এলো না, কঁপাঁর মুখে কে যেন কালি বুলিয়ে দিয়েছে। আমার জায়েরাও খুশির ভান করলো মাত্র। ভাবলাম, ভার্সাই ছেড়ে ত্রায়ানোতে গিয়ে নাটকের মহড়ায় নেমে পড়বো। সেই 'দি বারবার অফ্ সেভিল' নাটকটি, যা নিয়ে সারা দেশে হৈ চৈ চলছে।

ত্রায়ানোতে গিয়ে তাতেই মত্ত হয়ে গেলাম। কঁপাঁ যখন জানালো যে, কার্ডিনাল দ্য রোহাঁর পরিবার ওঁর গ্রেপ্তারে এবং ব্যাস্তিল জেলে পাঠানোর ব্যাপারে ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে, আমি হেসে ফেললাম, 'ওখানেই অনেক দিন আগে যাওয়া উচিত ছিলো ওঁর। এখন শোন তো আমার প্রথম অঙ্কের অভিনয়।...'

অভিনয়ের শেষে দর্শকদের করতালির মধ্যে বিজয়ীর ভঙ্গিতে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। এমন চমৎকার অভিনয় আগে করিনি আমি। আমার নিজের থিয়েটার, প্রধান অভিনেত্রীর ভূমিকা আমার। নিজের সাফল্যের আনন্দে আমি ডগমগ। তখন কি একবারও ভাবতে পেরেছিলাম যে, এটাই হবে আমার জীবনের সর্বশেষ অভিনয়!

আমি চেয়েছিলাম কার্ডিনালের বিচার হোক এবং শাস্তি হোক; সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ বলেই তাঁর এই জঘন্য অপরাধ ক্ষমার্হ হবে এমন ভাবনা আমার মধ্যে ছিলোই না। অবশ্যই ওঁর পরিবার আশা করেছিলো যে, রাজা খুবই মৃদু শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, যা না দিলেই নয়। শুনে হাসি পেয়েছে আমার। আমি থাকতে তা কখনই হবে না।

লুই, ওর স্বভাবমতোই, সংশয়ে দুলছিলেন। একদিকে ওঁর ভালোমানুষী, বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সদুপদেশ, অন্যদিকে আদরিণী, সোহাগিনী স্ত্রীর বিলাপ—দুটোর মাঝখানে পড়ে বেচারা দিশেহারা। মনে মনে যে সংকল্পই তিনি করুন, আমার কথার তোড়ে তা খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে লাগলো। তবু তিনি কার্ডিনালকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কি রকম বিচার তিনি চান—রাজার অথবা বিচারালয়ের?

রোহাঁ জবাব দিতে দেরি করলেন না। রাজার বিচারের ওপর যথেষ্ট আস্থা ওঁর, একথা জানিয়েও তিনি প্রার্থনা জানালেন, তাঁর মামলাটি বিচারের জন্যে বিচারালয়ে পাঠাতে যেখানে তিনি নিজের স্বপক্ষে সাক্ষী সাবুদ হাজির করতে পারেন। রাজা এ চিঠি পেয়ে একটু বিচলিত বোধ করলেন। কিছুদিন হাজতবাস রোহাঁকে যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত করে ফেলেছে।

রোহাঁর পরিবারের মতো রাজাও চেয়েছিলেন, অল্পের ওপর দিয়ে

ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে জনসমক্ষে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। আমার এই মূর্খতার কথা মনে পড়লে আজও আমি কেঁপে উঠি।

কঁতেস জিন দ্য লা মোৎ ভেলোয়া নামে মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো, সঙ্গে ব্যারোনেস দ্য অলিভা নামে একটি মেয়েকে, যে নাকি ভূয়ো-আমি সেজেছিলো। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই জাতীয় উত্তেজনাকর ঘটনার নজির বেশি নেই।

একটু একটু করে ঘটনার সবটুকুই আমার কানে আসছিলো। যার মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি জড়িয়ে গেছি। আমার সম্বন্ধে জনগণের ধারণা এই ব্যাপারে আমি জড়িত থাকলেও থাকতে পারি। এই ঘটনার জটিলতা ধীরে ধীরে আমার চোখের ঘুমও কেড়ে নিলো। জীবনে এই প্রথমবার আমি বোধ হয় ফ্রান্সকে চিনতে আরম্ভ করলাম।

এই নাটকের মধ্যমণি প্রিন্স রোহাঁর মতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষ কি করে এই প্রবঞ্চনার শিকার হলেন, বোঝা মুশকিল। কিন্তু এই ঘটনার আসল পাপী হলো জিন দ্য লা মোৎ ভেলোয়া, যে সে সময় ব্যস্ত ছিলো আমার সম্বন্ধে সর্বৈব মিথ্যা অশ্লীল কাহিনী রচনায়। ও আমার একজন শত্রু অথচ ওকে কোনদিন দেখিইনি আমি। ওর জীবন-কাহিনীও কেমন অদ্ভুত। নিজেকে ও ভেলোয়া বংশীয়া বলে দাবি করে। ও নাকি রাজা দ্বিতীয় হেনরির উত্তরসূরী। ওর শৈশব কেটেছে দারিদ্রের মধ্যে, কিন্তু ওর শিরায় রাজরক্ত বইছে—এই কথাটা একমুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি ও। আর সেটাই বোধ হয় আমার প্রতি ওর বিদ্বেষের প্রধান কারণ।

ওর ঠাকুর্দা, দ্বিতীয় হেনরির জারজপুত্র সাঁ রেমির তেমন কোন রোজগার ছিলো না। জিনের বাবার জন্মের সময় সাঁ রেমি পরিবারের সম্পূর্ণ ভগ্নদশা। জিনের বাবা অসাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো কিন্তু পূর্বপুরুষের লুপ্ত গৌরবকে উদ্ধার করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও তার মধ্যে দেখা যায়নি। বরং মদ আর লাম্পট্যেই তার আগ্রহ ছিলো বেশি। জন্মসূত্রে পাওয়া জমিজমা আর প্রাসাদের কিছু না কিছু বিক্রি করে

তার দিন কাটছিলো। জোসেল নামে একটি গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে ওদের অবৈধ সন্তান জন্মের পর। এই মহিলার স্বভাব চরিত্র ভালো ছিলো না। তিন চার ভাইবোনের অন্যতমা, মা-বাবার আদরের ছোঁয়াও ওর ভাগ্যে জোটেনি। ওদের ছিলো না কোন পোশাক-আশাক, ছিলো না পর্যাপ্ত খাবার দাবার। গ্রামের লোকের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে কোনরকমে বেঁচেছিলো ওরা।

তারপর একটা সময় এলো যখন ওর বাবা-মা পথে নামাই সাব্যস্ত করলেন। ওরা চার ভাইবোন—জ্যাকোয়েস, জিন, মারগারেট অ্যান ও মারি অ্যান। মারির বয়স মাত্র দেড় বছর, মুখে ভালো করে কথাও ফোটেনি। মা-বাবা ওকে গাঁয়ের একটা চাষবাড়ির দরজার ওপরে ছেঁড়াফাটা কাপড়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে, বাকি তিনজনকে নিয়ে রওনা হলেন। জিনের মা স্বাস্থ্যবতী ও আকর্ষণীয়া কিন্তু বাবা তখন ভগ্নস্বাস্থ্য। নিজের রূপকে কাজে লাগানোই মনস্থ করলো জিনের মা। বাবাকে ছেড়ে ওরই মতো দুশ্চরিত্রের এক সৈনিকের সঙ্গিণী হলো।

ছেলে-মেয়েগুলোকে ভিক্ষায় লাগানো হলো। সারাদিন পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতো ওরা। খালি হাতে বাড়ি ফিরলে প্রচণ্ড মারধোর খেতে হতো। এই অবস্থায় একদিন ভাগ্যের মোড় ঘুরলো জিনের। ওর ভিক্ষে করার বুলি ছিলো এরকম, 'ভেলোয়ার রাজবংশের এই অনাথকে কিছু সাহায্য করুন।' এতে পথচারীদের কেউ ঠাট্টাতামাসা করলেও অনেকেই এতে আকর্ষিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মাদাম দ্য বুলেনভিলিয়ার্স অন্যতমা। একদিন তিনি গাড়ি থামিয়ে ওকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন। ওর সৌন্দর্যে এবং গর্বিত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে, জিনকে এবং মার্গারেটকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন ও স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পরে বসন্ত রোগে মার্গারেটের মৃত্যু হয়। জিনের বাবাও এ সময়ে মারা যায়।

জিনের স্কুলের পড়া শেষ হলে মাদাম বুলেনভিলিয়ার্স ওকে সাঁ-জারমেঁতে একটি পোশাক তৈরির দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু জিনের রাজরক্তের অহমিকা এতে বাধ সাধলো। মাদাম বুলেন-

ভিলিয়ার্স তখন ওকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিবারের একজন হিসেবে রাখেন। জিনের বয়স তখন একুশ. সুন্দরী, রাজরক্ত-সিঞ্চিত পরিবারে জন্মের জন্যে গর্বিতা।

জিনের চব্বিশ বছর বয়সে পুলিস বিভাগের অফিসার নিকোলাস দ্য লা মোৎ-এর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম হয়। বিয়েটা তাড়াতাড়িই সারতে হলো ওকে কারণ বিয়ের মাসখানেক পরই জমজ শিশুর জন্ম দিলো ও। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে দুটি শিশুই মারা যায়। স্ত্রীর জেদাজেদি ভদ্রলোককে কঁৎ উপাধি গ্রহণে বাধ্য করলো। ওরা কঁৎ ও কঁতেস ভেলোয়া নামে সমাজে পরিচিত হলো।

কিন্তু টাকার প্রয়োজন তো মেটেনি জিনের। স্বামীর পুলিসের চাকরিতে কত আর আয়! নানা ফন্দি-ফিকির মাথায় ঘুরতে লাগলো ওর। সুযোগ এলো যখন মাদাম বুলেনভিলিয়ার্স স্ত্রাসবুর্গে কার্ডিনাল দ্য রোহাঁর বিরাট প্রাসাদে বেড়াতে গেলেন। জিন জানতো, কার্ডিনালের নারী প্রীতি একটু বেশিই তাই ওঁর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টায় রইলো।

কাডিনাল দ্য রোহাঁর হাবভাবে একটা নিদোর্ষ অভিব্যক্তি ছিলো। তাঁর জাকজমক ছিলো ঈর্ষাণীয়। দামী পোশাক আর রত্নের প্রতি ওঁর আকর্ষণ ছিলো তীব্র। কিন্তু কার্ডিনাল কখনই আমার সুনজর পাননি। মার নির্দেশমতো আমি তাঁকে একটুও পছন্দ করতাম না। অথচ তিনি চাইতেন আমার সহযোগিতা।

কিন্তু এটুকুই বুঝি তাঁর আকাঙ্খার সবটুকু নয়। তিনি চাইতেন আমার ভালবাসা। এ ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা ছিলো না। কিভাবে তা পাওয়া সম্ভব তাই নিয়ে তিনি অনুক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করতেন তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে।

জিন দ্য লা মোৎ ভেলোয়া অল্পদিনের মধ্যেই কার্ডিনালের প্রেয়সী বনে গেলো। জিনের জানতে বাকি রইলো না আমার প্রতি কার্ডিনালের বিশেষ অনুরাগের ব্যাপারটা। কার্ডিনালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছায় আমার ব্যাপারটাকেই মূলধন করার সিদ্ধান্ত নিলো জিন। বন্ধুত্ব পাতালো ওর স্বামীর বন্ধু রিতু দ্য ভিলেতের সঙ্গে। ভিলেৎ ব্যঙ্গ কবিতা

ভালোই লিখতো। বিভিন্ন ধরনের হাতের লেখা লিখতে পারতো, মেয়েলী ধাঁচেও পারতো। ভিলেৎও জিনের প্রেমিক হলো। হয়তো তখনই জিনের মতলব ভাঁজা শুরু হয়েছিলো যার জন্যে ভিলেৎকে নিজের বশে রাখতে চেয়েছিলো।

কার্ডিনালকে জিন বোঝালো যে, ও আমার কিছুটা অনুগ্রহ ভাজন হয়েছে। রোহাঁ ওকে বিশ্বাস করেন, ও নিজের ইচ্ছার কথা ওকে খুলে বলেন। জিন ওঁকে বলে যে, ওঁর সম্পর্কে কিছু কথা আমাকে বলার সুযোগ ওর আছে। কিন্তু মিথ্যে কোন কথার ফাঁদে তো কার্ডিনালকে খুশি করা যাবে না। এখানেই ভিলেতের ভূমিকা। সে তো মেয়েদের মতো লিখতে পারে। চিঠির শেষে যদি আমার সইটা জাল করে বসিয়ে দেয় তো সোনায় সোহাগা। কার্ডিনাল ওতেই মজে যাবেন। চিঠিগুলো আমি যেন লিখছি আমার বান্ধবী জিনকে একান্ত অন্তরঙ্গতায়।

সই করা হলো, 'মারী আঁতোয়ানেৎ দ্য ফ্রাঁস' নামে। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তিনি ধরতে পারতেন যে, ওভাবে আমি কখনো সই করিনে কিন্তু তখন তিনি আমার প্রেমে অন্ধ। জিন ওঁকে বোঝায়, উনি যদি ওঁর অতীত ক্রিয়াকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আমাকে কোন চিঠি দেন, আমি ওঁকে ক্ষমা করতেও পারি। খুশি হয়েই তিনি আমাকে লম্বা চিঠি লিখলেন।

জিন তা হস্তগত করলো, প্রতিশ্রুতি দিলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার হাতে সেটা তুলে দেবে। কয়েক দিনের মধ্যে রিতু দ্য ভিলেৎ তৈরি করলো আমার জবাব ঃ 'আমি এখন আর আপনাকে দোষী মনে করিনে। আপাতত আপনাকে সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে কিছুটা অসুবিধে রয়েছে। কিন্তু শিগগির হয়তো এর একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।' এই চিঠি কার্ডিনালকে একেবারে কাত করে দিলো। আবেগের আতিশয্যে ভাসতে থাকলেন তিনি। কোন সন্দেহ দানা বাঁধলো না ওঁর মনে।

জিনের তখন অর্থের বেশ প্রয়োজন। স্বামী ও ভিলেতের সঙ্গে আলোচনা করে চমৎকার একটা ফন্দি আঁটলো ও প্রচুর টাকা কামানোর।

কার্ডিনালের বিরাট ঐশ্বর্য, ঠিক যেন একটা দুধেল গাই। ঠিকমতো দুইতে পারলে প্রচুর দুধের যোগান দেবেন তিনি। কিন্তু তার জন্যে ওঁকে রানীর মুখোমুখি করা দরকার। রানীর অনুগ্রহের কথা যেন তাঁর মুখ থেকেই সরাসরি শুনতে পান কার্ডিনাল। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? জিনের সরাসরি উত্তর—'কেন, কোন একজনকে সরাসরি রানী সাজিয়ে।' ওদের প্রয়োজন ছিলো আমার মতো দেখতে একটা মেয়ে খুঁজে নেওয়া। আমি কি ধরনের পোশাক-আশাক পরি, কি ধরনের প্রসাধনে অভ্যস্ত, এটা তো সবারই জানা। জিনের স্বামী কঁৎ দ্য লা মোৎ খুঁজে বের করলো নিকোল লেকুয়েকে, যে পরিচিত ব্যারনেস দ্য অলিভা নামে। মেয়েটি যুবতী, বয়সে আমার থেকে ছ বছরের ছোট। আমার সঙ্গে চেহারার মিল বেশ খানিকটা আছে বলেই বন্ধুমহলে ওকে 'ছোট রানী' বলে। ওকে দেখেই জিন খুশি হলো। সম্ভাবনা হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ওকে বারে বারে বোঝালো যে, রানীর হয়ে একটা সামান্য কাজ যদি ও করে দেয়, রানী খুবই খুশি হবেন। বোকার হদ্দ মেয়েটা তো সে কথা শুনেই গলে গেলো। জিন অনেক যত্নে তাকে শুধু একটা কথা বলাতে শেখালো। কথাটা হলো—'আশা করতে পারেন যে, আপনার অতীতের ইতিহাস ভুলে যাওয়া হবে।' আরও বললো যে, মেয়েটির মসলিনের জামার পকেটে থাকবে একটি চিঠি, সেটাও যে ভদ্রলোক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তার হাতে যেন তুলে দেয়। আর ভদ্রলোকের হাতে তুলে দেবে একটা গোলাপ, কথা কয়টি বলতে বলতে। বেচারী মেয়েটির কাছে এর অর্থ একটুও বোধগম্য হলো না।

রাতটা ছিলো অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই—সেই নাটকের দৃশ্যের জন্যে যেন আদর্শ রাত। পার্কের সব কিছু নিস্তব্ধ, শোনা যাচ্ছে শুধু ফোয়ারায় জলের নিক্কন। জিন ও তার স্বামী মেয়েটিকে পাইন, ফার, উইলো আর সিডার ঘেরা পথ দিয়ে কুঞ্জবন ভেনাসে ছেড়ে দিয়ে এলো। এক ভদ্রলোক এমন পোশাকে সেখানে এলেন, যাঁকে দেখে মেয়েটির মনে হলো যেন আমারই ঘরের কোন পরিজন। রিতু দ্য ভিলেৎ এই ভদ্রলোক সেজেছিলো।

জিন ও তার স্বামী অলিভাকে অর্থাৎ মেয়েটিকে বললো ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে। এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই এগিয়ে এলেন আর একজন। দীর্ঘকায় ছিপপিছে, পোশাকের ওপর আলখাল্লা আবৃত, টুপিটা মুখের ওপরে টেনে দেওয়া। ইনি হলেন কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ। উনি নতজানু হয়ে সম্মান জানালেন মেয়েটিকে এবং ও গোলাপটি এগিয়ে দিলো। ভদ্রলোক যে ভাবে তা গ্রহণ করলেন তাতে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না মেয়েটির। তিনি যখন চোখ তুললেন, সেই শেখানো কথা কয়টি আবৃত্তি করলো অলিভা। রোহাঁ আবেগের অন্ধতায় কথার ফুলঝুরি ছোটালেন। সেই মুহূর্তে অলিভার পাশে জিনের আবির্ভাব। 'চটপট চলুন মাদাম। এক্ষুনি আসছেন কঁতেস দ্য আরতোঁ।'

আরতোঁর স্ত্রী আসছেন শুনে কার্ডিনাল তখুনিই সরে পড়লেন। জিন তো আনন্দে আত্মহারা। অলিভা তাড়াতাড়িতে চিঠিটা কার্ডিনালকে দিতে ভুলেই গিয়েছিলো। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

বোকা কার্ডিনালকে জালে ফেলতে আর একটুও সময় লাগলো না ওদের। তিনি তো বিশ্বাস করেই বসে আছেন, যে আমার সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাঁর। সামান্য বিরতির পর জিন দেখা করলো ওঁর সঙ্গে, রানীর অনুগ্রহ যে তিনি পেয়েছেন সে কথা দৃঢ়স্বরে জানালো। কার্ডিনালের গলে যাওয়া অবস্থা দেখে আসল কথাটা পাড়লো। রানীর এখন একটু টানাটানি চলছে, কার্ডিনাল যদি রানীকে পঞ্চাশ হাজার লিভার দেন রানী ওঁকে আরও প্রীতির চোখে দেখবেন। টাকাটা রানী জিন মার-ফতই নেবেন। কার্ডিনালের হাতে তখন অতটাকা না থাকাতে তিনি এক ইহুদি সুদখোরের কাছ থেকে টাকা ধার করে জিনের হাতে তুলে দিলেন। এভাবে কার্ডিনালের কাছ থেকে টাকা নিতে লাগলো জিন। যে বার-স্যুর-অবেতে একসময় ওর দারিদ্রবস্থা কেটেছে, সেখানেই একটা প্রাসাদ কিনলো।

কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হবার পাত্রী নয় জিন। নেকলেস চুরির পরিকল্পনাও ওর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে তখন উদ্ভাবিত হলো। নিজের আয়োজিত এক পার্টিতে স্বর্ণকারের অসুবিধের কথা প্রথম জানতে পারে জিন। বোহেমার

ও বাসেঁগে তখন সেই হার নিয়ে বিব্রত, যা তাঁরা বিক্রি করতে পারছেন না। রানীর কাছে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু রানী সেটা কিনতে রাজি নন। জিন দ্য লা মোৎ তখন রানীর সঙ্গে ওর হৃদ্যতার কথা সগর্বে বলে বেড়াচ্ছে। রাজসরকারে ভালো চাকরি করে দেবার লোভ দেখিয়ে স্বামী স্ত্রী অনেকের থেকে টাকা খাচ্ছে। মণিকাররাও ওদের শরণাপন্ন হলো যদি হারটা কেনার জন্যে আমাকে প্রভাবিত করা যায়। জিন ওদের আশা দিলো, এটা করা সম্ভব হতেও পারে। হারটা দেখে তো ওর চক্ষু চড়কগাছ। ওতে গাঁথা রয়েছে ইউরোপের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কটি মণি। আছে সতেরটি অত্যুৎকৃষ্ট হীরে। মোট দুহাজার আটশো ক্যারেট। জিন হারটা কিনতে চায় না, কিন্তু একবার হাতাতে পারলে সারাজীবন রানীর হালে কেটে যাবে ওর। হারটার দামই তো ষোলশো হাজার লিভার। মণিকারদের ও জানালো, হারটি বিক্রি করা সম্ভব হবে, রানীই কিনবেন কিন্তু সরাসরি না, একজন অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মারফৎ। ব্যাপারটা সম্পাদিত হবে কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ, রানী ও মণিকারদের মধ্যে, ওর নাম তাতে জড়িত না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কার্ডিনালকে ও জানালো, 'রানী, রাজার সাক্ষাতে হারটি ধারে কিনতে চান কারণ রানীর হাতে এখন অত টাকা নেই। রানী কিস্তিতে টাকাটা শোধ করবেন, প্রত্যেক কিস্তি দেবেন তিনমাস পর পর। সেজন্যেই তাঁর একজন মধ্যস্থ দরকার। আপনার কথাই ভেবেছেন তিনি।' আমার নামে একটা জাল চিঠিও কার্ডিনালকে দিলো ও। কার্ডিনাল খুশি হয়ে মণিকারদের সঙ্গে ঠিক করলেন যে, ষোলশো হাজার লিভার দেওয়া হবে দু বছরের মধ্যে ছটা কিস্তিতে। ১৭৮৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হারটি কার্ডিনালের হাতে তুলে দেওয়া হবে, প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে ১লা আগষ্ট তারিখে। এই মর্মে স্বহস্তে একটি দলিল তৈরি করে তিনি ওটা জিন মোৎ ভেলোয়াকে দিলেন রানীকে দেখাবার জন্যে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা ফেরত এলো কার্ডিনালের হাতে, পাশে রানীর সই 'মারী আঁতোয়ানেৎ দ্য ফ্রাঁস' নামে, জানানো হলো—এই ব্যবস্থা রানীর মনঃপূত হয়েছে।

হারটি দেখে প্রথমবার যেন সন্দেহে ত্থলে উঠলেন কার্ডিনাল। এমন রুচিবর্জিত গয়না আঁতোয়ানেতের মতো রুচিশীলা মহিলার পছন্দ! জিন মোৎ ভেলোয়াকে তিনি জানালেন যে, রানীর স্বহস্তে লেখা একটা দলিল তিনি চান এটা কেনার আগে। জিন বিস্মিত হলো না। ঠিক আছে, আনিয়ে দেবে। আবার রিতু ভিলেৎ তৈরি করলো সেই দলিল, আমার হাতের লেখা জাল করে। সেটা পেয়ে কার্ডিনালের সন্দেহ দূর হলো। তিনি হারটা কেনার ব্যবস্থা করলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী হারটা নিয়ে তিনি গেলেন মোৎ ভেলোয়ার প্রাসাদে। তাঁকে ঘরে বসিয়ে কাঁচের দরজার ওপাশেই হারটির হাত বিনিময় ঘটলো যাতে তিনি স্বচক্ষে তা দেখতে পান। একটা লোক এলো রানীর ভৃত্যের পোশাক পরা, হাতে ধরা কাগজে লেখা, 'রানীর আদেশ মতো।' মঁসিয়ে ও মাদাম ত্থ লা মোৎ ভেলোয়ার হাত থেকে গয়নার বাক্সটা নিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কার্ডিনালের বিদায়ের পর রানীর ভৃত্যের সাজে সজ্জিত রিতু ভিলেৎ বাক্সটি নিয়ে ফিরে এলো। ওরা ওটা ভেঙে বিক্রি করা মনস্থ করলো॥

এমন ত্থপ্রাপ্য হীরে বিক্রি করা তো সহজ নয়। তা করতে গিয়ে পারী পুলিসের হাতে ধরা পড়লো ভিলেৎ। কিন্তু মাদাম মোৎ ভেলোয়ার নাম করাতে ওকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মঁসিয়ে মোৎ ভেলোয়া গেলো লণ্ডনে, অনেক সস্তা দামে বিক্রি করলেও ওদের হাতে এলো অনেক টাকা। প্রচুর সাজসরঞ্জাম সহ মাদাম মোৎ ভেলোয়া গৃহপ্রবেশ করলো বার-সুর-অবের প্রাসাদে। দরজায় উৎকীর্ণ করলে এই কটি কথাঃ 'আমার পূর্বপুরুষ রাজার কাছ থেকে আমি পেয়েছি আমার রক্ত, নাম এবং কমল।' কিন্তু ও তো জানতো এই জঁাকজমক দীর্ঘদিন টিকবে না।

কার্ডিনাল গ্রেপ্তার হবার পর জিন সম্পর্কে সব কথা বলে দিলেন। ত্থদিন পরে পুলিস হানা দিলো বার-সুর-অবের প্রাসাদে। বাধা দেওয়া অর্থহীন মনে করে জিন ধরা দিলো। তাকে রাখা হলো ব্যাস্তিল জেলে।

॥ দশ ॥

জিনের স্বামী কঁৎ দ্য লা মোৎ ছাড়া আর সবাইকে গ্রেপ্তার করে ব্যাস্তিলে রাখা হলো। দ্য লা মোৎ পালিয়ে গেলো লণ্ডনে, নেকলেসটির বাকি অংশটুকু নিয়ে। পারীতে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। বিচারের বিষয় ছাড়া কারও মুখে কোন কথাই নেই। ব্যাস্তিলে কার্ডিনালকে দেওয়া হয়েছে আলাদা একটা কামরা, ওঁর নিজের তুজন চাকর ওঁর ফাইফরমাস খাটছে। পরিবারের লোকদের ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার কোন বাধা-নিষেধ নেই। তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁকে জেরা করার জন্যে রাজা ব্রেতেয়ুকে নিযুক্ত করেছেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন—ব্রেতেয়ু ওঁর শত্রুদের একজন। লুইও সততা দেখিয়ে ব্রেতেয়ুর স্থানে বৈদেশিক মন্ত্রী ভের্গেনেসকে নিযুক্ত করলেন।

ব্যাস্তিলে বসে জিন দ্য লা মোৎও নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছিলো। বিচারের সময় তো ও রোজই নতুন নতুন কাহিনী ফেঁদে যাচ্ছিলো। একটা না টিকলে আর একটা। কিন্তু অলিভা ও রিতু ভিলেৎ ধরা পড়াতে ও খুবই অস্বস্তিতে পড়লো। অলিভা ওর প্রেমিক তুসেঁ দ্য বুশারকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রাসেলসে ধরা পড়লো। ভিলেৎ জেনেভাতে ধরা পড়লো। কঁৎ দ্য লা মোৎকে ইংলণ্ড থেকে ধরে আনার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। পারীর জনমত প্রথমের দিকে অভিযুক্তদের একান্ত বিপক্ষে ছিলো কিন্তু দিনে দিনে তার চেহারা যেন বদলাতে লাগলো। তাদের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিলো, সব কিছুর মূলে রয়েছি আমি। আমার লোভ, আমার রত্নপ্রীতি, আমার খেয়ালখুশি। জনতার চোখে কার্ডিনাল নায়ক বনে যেতে লাগলেন। আসল অপরাধিনী যেন জিন দ্য লা মোৎ নয়, হলাম আমি, ফ্রান্সের রানী।

দিন দিন বিচারের কাহিনী ফলাও করে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হতে লাগলো। সে সময় আমি আবার সন্তান সম্ভবা হয়ে বসেছি। আর বড়

ছেলের স্বাস্থ্যের অবনতিতে খুব চিন্তিতও রয়েছি। পরিবারের মধ্যেই বেশি সময় কাটাচ্ছি।

কার্ডিনাল পারীর বিখ্যাত আইনজ্ঞদের লাগালেন ওঁর স্বপক্ষে। ষাট বছরের মায়েত্রে দোয়ালোৎ জিনের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে এমনই মোহমুগ্ধ হলেন, প্রকৃতপক্ষে ওর আঁজ্ঞাবাহকই হয়ে গেলেন। অলিভাকে দেওয়া হলো এক তরুণ আইনবিদ, যিনি ওকে দেখেই মুগ্ধ হলেন।

মাদাম দ্য লা মোৎ সকলের সম্পর্কেই অবিশ্বাস্য ধরনের অভিযোগ পেশ করছিলো, কিন্তু আমার নামোল্লেখ করেনি। কার্ডিনাল যখন ওকে জিজ্ঞেস করলেন কি করে রাতারাতি ও এত সম্পত্তির অধিকারিণী হলো, ও পাল্টা অভিযোগ এনে বললো, কার্ডিনালই তো ওর প্রণয়ী ছিলেন, ও তো ছিলো তাঁরই রক্ষিতা। ও অলিভার দুশ্চরিত্রতার কথাও বলে গেলো। কিন্তু পার্কের সেই ঘটনায় অলিভা ও রিতু যখন ওকে জড়িয়ে নিলো, কিছু করার না থাকায় চিৎকার চেঁচামেচি করে ওখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

কিন্তু কার্ডিনালের আচরণে কোনরকম অসঙ্গতি নেই। শান্ত থেকে সব কিছু দেখতে লাগলেন, যেন এসব অপভাষণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো, জনগণ বলতে লাগলো তিনি কতকগুলো স্বার্থান্বেষী লোকের শিকার হয়ে গেছেন।

বুধবার ৩১শে মে সকাল ছটায় রায় দেওয়া হলো। প্রধান বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে সে কী ভিড়! বিচারক-কক্ষের প্রবেশপথের পাশেই দাঁড়ালেন রোহাঁ পরিবারের সব সভ্যরা। বিচারকদের নজরে পড়ার জন্যে প্রত্যেকের পরিধানে শোকের পোশাক। বিচারকদের প্রতি তাদের মনোভাব, কার্ডিনালকে বেকসুর খালাস না দেবার অর্থই হলো মহত্ত্বের অবমাননা।

জিন দ্য লা মোতের রায় বেরোলো প্রথমে, ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। দুজন বিচারক তো মৃত্যুদণ্ডের অভিমত জানালেন। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বলা হলো, প্রকাশ্যে তাকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করা

হবে, কাঁধে ফরাসী 'ভোলেউজ' কথাটির আদ্যাক্ষর মুদ্রিত করা হবে, এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবে সলেপিত্রিয়ের জেলে। ওর স্বামীকে তার অনুপস্থিতিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো। রিতু ভিলেৎকে নির্বাসন করা হলো। অলিভাকে মুক্তি দেওয়া হলো যদিও রায়ে তার অপরাধের উল্লেখ ছিলো।

আর কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ! বলা হলো যে, তিনি কয়েকজন শয়তানের হাতের শিকার মাত্র। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁকে পূর্ণমর্যাদা-সহ বেকসুর মুক্তি দেওয়া হলো।

এতবড় পরাজয় আমার জীবনে আর আসেনি। বিচারালয়ের এই রায় এটাই প্রমাণিত করলো যে, আমি হলাম সেই ধরনের মহিলা, একটা হীরের হার দিয়ে যাকে কিনে ফেলা যেতে পারে। দুঃখে, আতঙ্কে চোখ ফেটে জল এলো আমার। বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। রাজা এসে সান্ত্বনা জানালেন আমায়।

শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে সামান্যই বলার আছে আমার। শাস্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের চোখে জিনও নায়িকা বনে গেলো। বলা হলো, দ্য লা মোতের কাহিনী সঠিক, ও রানীর জন্যেই সব কিছু করেছে।

এর কয়েক সপ্তাহ পরেই জিন দ্য লা মোৎকে জেল থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হলো, আর এটাও প্রচার করা হলো যে, আমিই ওর পালানোর ব্যবস্থা করেছি।

আমাদের জীবনে এটাই ক্রান্তিকাল। লুই বরাবরই আমার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তখনও কি জানতাম যে, আমাদের চোখের ওপরই পৃথিবী আবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আর সারা ফ্রান্সের মনোজগতে ফরাসী রাজতন্ত্রের তিরোভাবের ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

কার্ডিনাল রোহাঁর মুক্তিতে আনন্দিত হলেও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লুই তাঁকে প্রধান পাদরির পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।

কিন্তু এ সব আমাকে এতটুকুও শান্তি দিতে পারলো না। আমি হতাশার শিকার হয়ে গেলাম। সারা জীবনে আর কোনদিন আমি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসকে খুঁজে পাবো না।

বিচারের মাসখানেক পরে আমার চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। একটি মেয়ে, নাম রাখলাম সোফি বিয়েত্রে। জন্ম থেকেই বাচ্ছাটা রুগ্ন, কারণ বিচারের সেই কঠোর দিনগুলোতে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিনি আমি। বাচ্ছাটা কিন্তু সেই অপ্রিয় স্মৃতি ভুলিয়ে দিলো। এখন আমার চারটে সন্তান। এই তো চেয়েছিলাম—মা হতে, অনেক সন্তানের মা।

আমার বিরুদ্ধে প্রচার থামেনি। পারীর প্রাচীরে প্রাচীরে আমার ছবি সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে, হীরের নেকলেস পরে দাঁড়িয়ে আছি। গল্প চালু হয়েছে যে, আমার গয়নার বাক্সেই হারটি রয়েছে। আমিই বেচারী জিনকে অকূলে ভাসিয়েছি। রাস্তায় বেরোলেই লোকেরা ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকায়। আমার দোষ কোথায় বলতে পারিনে। আমি বেহিসেবী, অমিতব্যয়ী কিন্তু কারও কোন ক্ষতি তো করিনি কোন দিন। রাজনীতি থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। অন্যদের চোখে আমি অসাধারণ সুন্দরী হলেও, আমি তো জানি আমি মোটেই ব্যভিচারিণী নই। স্ত্রী হিসেবে আমি বিশ্বাসী, আমার মতো আর একটি মেয়ে হয়তো সারা রাজসভায় নেই। হয়তো আমি রোম্যান্টিক, একটু বেশি রকমের চপল কিন্তু আমার মধ্যে যৌনবাসনা এমন প্রবল নয় যে, যে কোন ভাবে তাকে তৃপ্ত করতে হবে। হয়তো বা প্রথম যৌবনের যৌন-অতৃপ্তির খানিকটা হতাশা এখনও আমার মধ্যে রয়েছে কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনদিন শারীরিক উপত্যকায় নেমে আসেনি। সে মনোভাবই আমার কাছে অশ্লীল মনে হয়। আমার জীবন হলো মনোহারিত্বে ভরা—সূক্ষ্ম রোম্যান্টিকতায় ঘেরা। কিন্তু লোকেরা তো তা বোঝে না। আমার চালচলন এমন অকপট যে, ওরা ভাবে আমি একটা যৌনতার বাণ্ডিল। রাজা অবশ্যই আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি তো জানেন তাঁর অক্ষমতাকে কতটা সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম, তাঁর যৌনমিলনের অক্ষম প্রচেষ্টাকে আমি কতটা সহমর্মিতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি অনেক বছর ধরে। কখনও নালিশ জানাইনি, কখনও ওঁকে দোষী প্রতিপন্ন করিনি। এখন তাঁর জয়ের আমিই সমান অংশীদার। তাঁর পুরুষত্বকে আমিই প্রমাণিত করেছি।

তাই তিনি আমাকে খুশি করতে চান।

তাঁর এই মহত্ত্বকে আমি যথেষ্ট মূল্য দিই। আমার সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতার অন্ত নেই। ছেলেমেয়েরাও আমাদের খুবই ভালবাসে। তাদের কাছে আমরা কখনই রাজা আর রানী নই, তাদের আদরের বাবা আর মামণি। ভাবি, লুই আর আমি রাজা আর রানী না হয়ে যদি কোন সামান্য নাগরিক হতাম! এটাই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

অথচ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি অস্ট্রিয়ার হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছি। যে কোন ব্যাপারই আমার বিরুদ্ধে চলে যায়, লোকেরা ঘৃণার চোখে আমার পরিমাপ করে। কারণ আমি অস্ট্রিয়ান। আমার দাদা জোসেফ ওখানে তুরস্ক আর প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসেবে তিনি আশা করেন, ফ্রান্স এই যুদ্ধে তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। জোসেফ চান সৈন্য অথচ মঁসিয়ে দ্য ভেরগেনে তাকে পনের লক্ষ লিভার পাঠানোর জন্যে তাঁর মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিলেন। আমি এই ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, ফরাসীরা সম্রাট জোসেফের হয়ে যুদ্ধ করবে—এটা বাঞ্ছনীয় নয় ভেবেই তিনি অর্থসাহায্য করতে চান। আমি বললাম যে, ভিয়েনার অর্থের অভাব নেই, যার অভাব সেটা হলো লোকবলের। তিনি বললেন—আমি যেন সব সময় ভাবি যে, আমি ফ্রান্সের যুবরাজের মা, অস্ট্রিয়ার সম্রাটের বোন নই। এতে খুবই মর্মাহত হলাম। সবাই জানলো ফ্রান্সের এই মুহূর্তে যখন টাকার এতই প্রয়োজন, তখন সেই টাকা আমিই আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি যা করতে চাই তাই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা সত্যিই তখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে রাজতন্ত্র সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলো। তাঁর ক্ষমতার কোন আদিঅন্ত ছিলো না, তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্স কর্তৃত্বের শীর্ষে উঠেছিলো। যুদ্ধে, সাহিত্যে আর বিজ্ঞানে তাঁর নেতৃত্ব ফ্রান্সকে উন্নত করেছিলো। তিনি ছিলেন একনায়ক কিন্তু ফরাসীরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তাঁর পৌত্র আমার পরম প্রিয় ঠাকুর্দার দীর্ঘ রাজত্বে রাজতন্ত্রে ফাটল ধরেছিলো। জনসম্পদ লাম্পট্যের বেহিসেবী অমিতব্যয়ীতার জন্যে নষ্ট হচ্ছিলো। পঞ্চদশ লুই যে স্বেচ্ছাচারিতা করেছিলেন তার সঙ্গে কেবল অতীত দিনের রোমান সম্রাটদের তুলনা করা চলে। আমার স্বামী যখন রাজা হলেন, সবাই একটা পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি তো একটুও অমিতব্যয়ী নন, তাঁর চরিত্রও খুবই ভালো। তিনি সবার ভালো করতে চান, তিনি নিজের জন্যে কিছুই প্রত্যাশা করেননি। প্রধানমন্ত্রীর কথা যেমন মনযোগ দিয়ে তিনি শুনতেন, তেমনি আমার কথাও। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতো তাঁর, সংশয়ে ভুগতেন। সেটাই কি আমাদের অবলুপ্তির মূল কারণ? চটপট চিন্তা করতে পারেন না তিনি, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। এটা বোকামি নয়, বরং তার উল্টো। তিনি বিরোধের তুটো পিঠই দেখতেন যা করা উচিত কিন্তু নিজে কোন সমাধানে আসতে পারতেন না। তিনি একদিকে যেতে যেতে থামতেন, সন্দেহে তুলতেন, আবার পরিচালনা করতেন সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

সব ব্যাপারেই মাথা ঠাণ্ডা রাখা তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেছিলো। তবুও তাঁর সব আত্মজ গুণাবলীই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলো। মাথার ওপর যখন আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, তখনও তিনি শান্ত থাকতেন, বলতেন, মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু আসল ধাক্কাটা এলো অর্থনৈতিক চেহারায়। দেশের তখন প্রায় দেউলিয়া অবস্থা।

তুর্গো এবং নেকার—তুজনেই অর্থনীতির হাল ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। ডাকা হলো মঁসিয়ে কেলোঁকে। তিনি বললেন গণ ঋণ ওঠাতে হবে, কর কমাতে হবে। তখন বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দশকোটি লিভার। এই ঘাটতির কথাই সবার মুখে মুখে। আমার তখন অন্য নামকরণ করা হয়েছে। হারপরা আমার ছবির নীচে বড় বড় হরফে লেখা—"মাদাম ডেফিসিট"। মঁসিয়ে কেলোঁর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেলো। তিনি কিন্তু সাময়িক অস্থবিধেগুলো দূর করতেই সচেষ্ট হলেন, ভবিষ্যতের জন্যে কোন পরিকল্পনা তৈরি করলেন না।

আমি কিন্তু এসব জটিলতা থেকে অনেকটা দূরে সরে যেতে বাধ্য হলাম। আমার দুটি সন্তানের স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো যে, ছোট্ট সোফি বিয়েত্রের ভাগ্যে এই পৃথিবীর আলোবাতাস আর বেশিদিন নেই। আমার বড় ছেলে, আদরের যুবরাজ লুই জোসেফও দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলো। প্রথমে রিকেটের আক্রমণ, ডাক্তারদের সযত্ন চেষ্টায়ও ওর দুর্বলতা কাটানো সম্ভব হচ্ছিলো না। দেখা গেলো ওর মেরুদণ্ড আক্রান্ত হয়েছে এবং আমাদের আদরের সন্তান বিকলাঙ্গ হতে চলেছে। মানসিক যন্ত্রণার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমার মেয়ে মাদাম রয়েল ও অন্য ছেলে ডিউক অফ নরম্যাণ্ডি দিনে দিনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠছে।

অসুস্থতা সত্ত্বেও বড়ছেলেটা কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান, বলতে গেলে যেন একজন প্রাজ্ঞ মানুষ। ওদের কাছেই বসে বসে সময় কাটাতে লাগলাম যাতে ওদের দিকে অনুক্ষণ চোখ রাখতে পারি। যুবরাজ কিন্তু গ্যাব্রিয়েলকে একটুও পছন্দ করতো না, কারণটা আমার বুদ্ধির বাইরে। সোফি বিয়েত্রের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। যেদিন আমার কোলের মধ্যে তার শেষ নিশ্বাস ফেললো, সেই ক্ষণটিকে স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেবার উপায় আমার নেই। সেই স্থির কোমল মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে থেকে মনে হচ্ছিলো আমার মতো অভাগিণী সংসারে আর দুটি নেই। সেই মুহূর্ত থেকে আমার দুর্ভাগ্যের শুরু হলো।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই খারাপের দিকে যেতে লাগলো, লোকেদের মুখে মুখে আমার নামই ধ্বনিত হতে লাগলো। আমার অমিতব্যয়ীতাই সব কিছুর মূল। আমি হলাম অস্ট্রিয়ার মেয়ে, অস্ট্রিয়ার স্বপক্ষে আমি ফ্রান্সের বিরোধিতা করে আসছি। হীরের নেকলেস কিনে, ত্রায়ানোতে ব্যয় বাড়িয়ে আমি ফরাসী অর্থনীতিকে রুক্ষ করে ফেলেছি। কেলোঁ রাজাকে বললেন, তিনি যেন দেশের সব সম্ভ্রান্ত লোকদের ডেকে একটা সভা করে এই ব্যাপারে আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মতে একমাত্র সম্ভ্রান্ত সমাবেশই এর সমাধান করতে পারে।

রাজা প্রমাদ গুণলেন। এ জাতীয় সভার আহ্বান মানেই রাজতন্ত্রের

ওপর আঘাত হানা। কেলোঁ বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষ মহান হেনরি কোয়াত্রেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ভেরগেনে এর বিরুদ্ধে মত দিলেন। রাজা কয়েকদিন সন্দেহে দুললেন, তারপর কেলোঁর অভিমত গ্রহণ করলেন। পরিষদের সভ্য হবেন রাজরক্তে সমৃদ্ধ সাতজন রাজকুমার, চোদ্দজন আর্চবিশপ এবং বিশপ, ছত্রিশজন ডিউক, বারোজন প্রাদেশিক কাউন্সিলার, আটত্রিশজন ম্যাজিস্ট্রেট, বারোজন প্রাদেশিক ডেপুটি, বড় বড় শহরের পঁচিশজন মিউনিসিপ্যাল অফিসার প্রভৃতি। এদের নিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিষদ গঠিত। সদ্য আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত লা ফায়েৎও এতে সম্মত হলেন। আমাদের পরম শত্রু ডিউক অফ অরলিঁস প্যালেস রয়েল-এ জনসভা ডাকলেন। সেখানে সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা হলো।

কিন্তু সম্ভ্রান্তরা ব্যর্থ হলেন। কেলোঁরও পতন ঘটলো। তিনিই এই পরিষদ ডাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অ্যাবেই ভেরমঁ আমাকে বললেন, যোগ্যতম মানুষ হলেন তুঁলোর আর্চবিশপ লোমেনি দ্য ব্রিয়েনে। রাজাকে অনুরোধ করলাম এঁকেই যেন অর্থনীতির ভার দেওয়া হয়। সবাই এর বিরোধিতা করলেন, রাজা সন্দেহে দুলতে লাগলেন। আমি জোর করাতে শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। আবার আমাকে সরকারী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হলো। রাজসভায় আর্চবিশপের কোন প্রস্তাবই খাটলো না। আমার সাহায্যে উনি এসে ঢুকেছেন—এটাই ওঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ। শেষ পর্যন্ত উনি প্রস্তাব করলেন যে, আমাকেও যেন মন্ত্রিসভার সভ্যা করে নেওয়া হয় যাতে দেশের নীতি প্রণয়নে আমার বক্তব্যও রাখা যায়।

এর প্রতিবাদে জনগণ তো উন্মত্ত হয়ে উঠলো। 'মাদাম ডেফিসিট'-এর দ্বারা ওরা কিছুতেই পরিচালিত হবে না। 'দেশের দুর্গতির জন্যে রানীই দায়ী' ইত্যাদি চিৎকারে রাস্তাঘাট মুখরিত হয়ে উঠলো। ওদিকে নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা ব্রিয়েনের মগজে ছিলো না। বুঝতে পারলাম ওঁকে নিয়োগ করা আমারই ভুল। রাজা কিন্তু ব্রিয়েনের পক্ষে রইলেন। মন্ত্রিসভাকে হুকুম দিলেন ব্রিয়েনের আদেশমতো কাজ করতে। অরলিঁস

মনে করিয়ে দিলেন যে, রাজার আদেশ বেআইনী। লুই ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করলেন তাঁর জমিদারী ভিলার্স কোতেরেতে।

রাজা ও পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গেলো। দেশের সব পরিষদ পারীর পরিষদকে সমর্থন করতে লাগলো। 'ব্রিয়েনেকে সরানো হোক' বলে সারা দেশেই ধ্বনি উঠলো। কয়েকটি শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেলো। ধ্বনি উঠলো গণপরিষদ আহ্বান করা হোক।

আমি তখন ত্রায়ানোতে রয়েছি। দুটি সুস্থ ও একটি রুগ্ন ছেলের তত্ত্বাবধান করছি। রোজ বার্তিন একদিন মনোরম সিল্কের একটি পোশাক নিয়ে হাজির। আমি বললাম, 'এ সবের আর দরকার নেই। আমার ওয়ার্ডরোবে অনেক পোশাক জমে গেছে।' অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকালো ও। বললে, 'নতুন নীল ভেলভেটের এই পোশাকটা আগে দেখুন তো।' 'দেখার দরকার নেই। তোমারও এত ঘন ঘন আমার কাছে আর আসতে হবে না।' আমি না দেখেই সরে গেলাম। এতে ভীষণ রেগে গেলো রোজ। দেখলাম, আমার প্রাসাদ ছেড়ে ও বেরিয়ে গেলো।

আমি বদলে গেছি। খরচ কমাচ্ছি।

আমার চারপাশের ভিড় একটু একটু করে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল, লঁব্যাল, আমার ননদ এলিজাবেথ ছাড়া বাদবাকি সবারই যেন উড়ু উড়ু ভাব। কিন্তু আর এক একান্ত বান্ধব ফ্রান্সে ফিরে এলেন, তিনি আক্সেল দ্য ফের্সেন। ভিড়ের মধ্যেই থাকতেন তিনি, আমার সামনে এগিয়ে এলেন না।

বড় ছেলেটাকে নিয়ে আমার ভাবনার একটুও অবসান ঘটেনি। ওর স্বাস্থ্য কিছুতেই ফিরছে না। একটা পা একটু ছোট হয়ে গেছে, মেরুদণ্ডে খানিকটা বাঁক ধরেছে। চিকিৎসায় মাঝে মাঝে সামান্য উন্নতি হলেও আবার অসুস্থতা বেড়ে যায়। ডাক্তাররা বললেন হাওয়া বদল করলে হয়তো বা ওর উপকার হতে পারে। লুইও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন। যুবরাজকে পাঠানো হলো মুদোঁতে।

স্টেট-জেনারেলের সভ্যদের ভার্সাইতে জড়ো হবার কথা। এই স্টেট-

জেনারেলকে আমার ভীষণ ভয়, কারণ আমার প্রকৃত বন্ধুদের চোখে এই সন্ত্রাস বারবার দেখেছি। আক্সেলও কোন কোন মুহূর্তে এই ব্যাপারে আমাকে সজাগ করে তুলেছে। অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত, আমার জন্যেও ভয়ের অন্ত নেই তার। 'লুই, পরিষদের সভা পারী থেকে খানিকটা দূরে কোথাও করলে হয়: না?' 'ভার্সাই এবং রাজধানীতেই ওদের আনা প্রয়োজন।' স্বামী বললেন। 'কিন্তু লুই, তোমার সব ক্ষমতা ও সম্ভ্রম ওরা লুটে নেবে।' ওরা নির্বাচিত হয়েছে সমাজের সব স্তর থেকে। নীচু শ্রেণীর লোকেরা সরকারী ব্যাপারে নাক গলাবে, চতুর্দশ আর পঞ্চদশ লুই এটা কিছুতেই সহ্য করতেন না। স্বামী কিন্তু জানালেন, এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মুদোঁতে গেলাম ছেলেকে দেখতে। আমাকে দেখেই সে খুশি হয়ে বললো, 'তুমি কাছে থাকলেই আমার সবচেয়ে ভালোভাবে সময় কাটে।' আরও জানালো যে, সে স্টেট-জেনারেলের উদ্বোধন উৎসবের মিছিল দেখতে চায়।

সকালের সূর্যালোকে ঝলমল করছিলো ১৭৮৯ সালের ৪ঠা মে। ঘণ্টাধ্বনি বাজছিলো। স্টেট-জেনারেল বসছে সেদিন। ভার্সাইয়ের রাস্তাঘাট সাজানো হয়েছে, সর্বত্রই যেন উৎসবের আবহাওয়া। ফ্রান্সের শাসনভারের দায়িত্ব নিচ্ছে স্টেট-জেনারেল। রাজা মহৎ লোক। তিনি স্টেট-জেনারেল ডেকেছেন। কর বাতিল করা হবে অথবা সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। রুটির দাম কমবে। ফরাসীদেশ স্বর্গ হয়ে উঠবে।

সে দিনের সব কিছুই স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার। সূর্যালোক আমার মিষ্টি লাগছে না, জনগণের মুখের আদল আমাকে অস্বস্তিতে ফেলছে. ওদের উল্লাসধ্বনি আমাকে বিব্রত করছে। বাদ্যধ্বনি বাজছে। ফরাসী ও সুইস গার্ডরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছশো লোক মিছিলে যোগ দিয়েছেন। এরা হলেন জনগণের প্রতিনিধি। এর পেছনে রয়েছেন রাজকুমাররা,

যাঁদের প্রধান হচ্ছেন দ্য অরলিঁস। আর রয়েছেন কার্ডিনাল আর বিশপগণ। এই মিছিলেই রয়েছেন মিরাবুঁ, রোবস্‌পীয়ের প্রভৃতি বিদ্রোহী নেতাগণ, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ।

এঁদের পেছনেই আমার গাড়ি। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছি। ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছি না। আমার চারপাশে যে গম্ভীর নিস্তব্ধতা, জানি সেটা মৈত্রীর নয়। ভাবলাম আমার রুগ্ন ছেলে এই মিছিল লক্ষ্য করছে। এ সব মানুষ, যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের কথা না ভেবে ছেলের কথা ভাবতে লাগলাম। আমার স্বামীর গাড়ি এগিয়ে এলো, লোকেরা হর্ষধ্বনি করতে লাগলো। তাঁকে ওরা ঘৃণা করে না। আমিই হলাম বিদেশিনী, ওদের সব দুঃখ কষ্টের কারণ। মিছিলের পর প্রাসাদে ফিরতে পেরে স্বস্তি পেলাম।…

রাজা ও আমাকে মুঁদোতে ডেকে পাঠানো হলো। আমার ছেলের অবস্থা খুব খারাপ। চোখের জল বাধা মানছে না আমার। জল ঝরছে —সারা দেহে, সারা মনে। হায় ভগবান, পৃথিবীর সব কিছুর বদলে আমার ছেলের জীবনটুকু আমাকে ফেরত দিতে পারো না।

কিন্তু মনের তন্ত্রীতে কোথায় যেন অনবরত ঘা পড়ে যাচ্ছে—সব শেষ, সব শেষ।

॥ এগার ॥

জীবনের দেউটি এক এক করে নিভে যাচ্ছে। দু বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দুটো সন্তানকে হারালাম। বাকি দুজনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকি। আদরের মেয়েটি, অত্যন্ত সুন্দরী অথচ স্বভাবে খুবই নম্র। ওকে নিয়ে কখনও বিব্রত হতে হয়নি আমাকে। আর আমার ছোট ছেলে, যে এখন যুবরাজ, খুবই খুশমেজাজী, বড়টার চেয়েও,

আমার প্রতি ওর আকর্ষণ বেশি। সামরিক পোশাক পরিচ্ছদের দিকেই ওর বেশি ঝোঁক। রক্ষীরা ওকে খুবই পছন্দ করে।

স্বামী অনেকবারই অনুযোগ করেছেন যে, ছেলেবেলায় রাজ্যপালন সম্পর্কে ওঁকে কিছুই শেখানো হয়নি। আমি তাই ছেলেটাকে একটু একটু করে বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে বলি, 'জানো, তুমি হলে এদেশের যুবরাজ। একদিন তুমি এদেশের রাজা হবে।' 'হবো কি ?' ওর নিরীহ সরল প্রশ্ন। ওকে কোলে তুলে নিই, 'এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে, সোনা ?' নিজের ভাবাবেগকে দমন করতে ওকে এমন জোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম যে, বেচারা ব্যথায় ককিয়ে উঠলো।

ওদিকে আমরা যেন একটা ভয়ঙ্কর শীর্ষবিন্দুর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। স্টেট-জেনারেলের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। রাজা, নেকার সবাইকে অবস্থাটা বুঝিয়েছেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং পাদরিরা দেশের জন্যে সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু একটা বিশেষ ব্যাপার এই অধিবেশনে দানা বেঁধে উঠলো। কথা বলতে বলতে রাজা নিজের মাথার টুপি খুলে ফেললেন। এবং আবার পরে নিলেন। রীতি অনুযায়ী অভিজাতরা টুপি খুলে ফেলবেন এবং সাধারণ সভ্যগণ হাঁটু ভেঙ্গে দাঁড়াবেন, কিন্তু ওঁরা তা করতে অস্বীকার করলেন। অবস্থার জটিলতা বিবেচনা করে রাজা চটপট নিজের টুপি আবার খুলে ফেললেন। এভাবে একটা বিশ্রী ঘটনাকে এড়ানো গেলো। কিন্তু এতে এটা প্রমাণিত হলো অভিজাত ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনতিবিলম্বে ঘটতে যাচ্ছে।

সাধারণ সভ্যরা জাতীয় পরিষদ নামে একটা সংস্থার সৃষ্টি করলো। ওরা দাবী করলো যে, ওরা হলো শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ জনতার প্রতিনিধি। নিজেদের নিয়মকানুন তৈরি করতে লাগলো ওরা এবং ঘোষণা করলো যে, নতুন একটা শাসনতন্ত্র ওরা তৈরি করছে। যাতে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

অভিজাত দলের সভাপতি দ্যু দ্য লুক্সেমবার্গ, কার্ডিনাল দ্য লা রোশ-ফুকোঁকে সঙ্গে করে রাজার সঙ্গে দেখা করে বললেন—'স্টেট-জেনা-

্রেলকে আপনি যদি অবিলম্বে ভেঙে না দেন, ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে যাবে।'

রাজা উভয়সঙ্কটে পড়লেন। তিনি যে সবাইকেই তুষ্ট করতে চান। তিনি নেকারকে ডেকে পাঠালেন। তিনিও রাজাকে উপদেশ দিলেন যে ওদের তুষ্ট রেখে চলতে। আমি কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের দলে। আমি বললাম, ডেপুটিরা হলেন একদল পাগল। ওদের দমন করাই কর্তব্য। রাজা কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারলেন না। তিনি দুই দলের একটা আপোষের পক্ষপাতী।

২০শে জুন আবার পরিষদের বৈঠক বসলো। ওরা প্রস্তাব নিলো যে, পরিষদ এখন ভাঙবে না। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ওরা শ্বাসনতন্ত্র রচনা করবে। এটা স্পষ্টতই রাজবিরোধী কারণ রাজা ইচ্ছে করলেই পরিষদ ভেঙে দিতে পারেন। রাজা এতেও কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারলেন না। ওদিকে অভিজাতরা চান সৈন্যদের সাহায্যে পরিষদ ভেঙে দিতে। পরিষদের পেছনে শক্তি হলেন মিরাবুঁ। তিনি ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদ যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া ছাড়া ভাঙবে না। পরিষদের সভাপতি জ্যাঁ সিলভিয়াঁ বেইলীও অনুরূপ মন্তব্য করলেন। সুতরাং অধিবেশন চলতে লাগলো। ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে দু ত্ব অরলিঁস নিয়মিত আমাদের কুৎসা ছড়াতে লাগলেন। প্রত্যেক দিনই নানা স্থানে সভা বসতে লাগলো, নানা পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগলো, 'মুক্তি' ও 'জনগণ' কথা দুটি বড় বেশি প্রাধান্য পেলো। সারা ভার্সাই এমন কি পারীর আবহাওয়া উত্তেজনায় থমথমে হয়ে উঠলো। সর্বত্রই যেন সন্ত্রাসের পরিবেশ। এর পর কি ঘটতে পারে আমাদের জানা নেই। আক্সেল কথা বললো আমার সঙ্গে। 'প্রয়োজন হলে আমি এখানেই বরাবর থাকবো।' ওর কথায় একটু আশ্বাস পেলাম। বিদেশী হিসেবে জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করাতে দেশের প্রকৃত অবস্থা আমাদের থেকে বেশি ভালো করেই জানতো ও। আমাদের মনে হয়নি রাজতন্ত্রের ভিত্তি টলটলায়মান। কিন্তু আক্সেল ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করে ছিলো ওটা।

পারীতে গিয়ে পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে হবে লুইকে। ওখানে কি ঘটবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম। লুইয়ের আসল শক্তি হলো ওঁর সাহস। তাঁর মধ্যে জয়ের অস্তিত্ব কখনও দেখিনি। তিনি যে সব ভুল করেছেন তার কোনটাই ভয় পেয়ে নয়। তাঁর অসুবিধে যেটা, সেটা হলো স্বমতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্যকে তিনি চট করে ঠেলে ফেলতে অক্ষম।

পরিষদে তিনি একটি ঘোষনাপত্র পাঠ করলেন। তিনি আইনতন্ত্রের কোন পরিবর্তনে স্বীকৃতি দেবেন না। কর আদায় প্রত্যেকের কাছ থেকে সমানভাবে করবেন। অভিজাত ও পাদরিদের কোন বিশেষ অধিকার থাকবে না। বিদায় কালে তিনি হুকুম করলেন, সে রাতের মতো পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে কিন্তু সে হুকুম কেউ পালন করলো না। পুলিস অধিকর্তা যখন ঘোষণা করলেন যে, অধিবেশন বন্ধ করা হলো, মিরাবুঁ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ওঁরা ফিরবেন ওঁদের ইচ্ছেমতো, কারও হুকুমে নয়। পুলিস অধিকর্তা আদেশের জন্যে রাজার কাছেই ফিরে এলেন। রাজা তখন চুড়ান্ত সংশয়ের শিকার। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুধু বললেন, 'তাহলে ওরা যেমন রয়েছে, থাকতে দাও।' আরও এক ভুল করলেন তিনি—নেকারকে পদচ্যুত করে, সেই স্থানে বসালেন ব্রেতেয়ুকে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি তখন ত্রায়ানোতে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ত্রায়ানোর চেহারাও অনেকখানি বদলে গেছে। থিয়েটারের দরজা বন্ধ, ওতে আর আমার কোন উৎসাহ নেই। আমার চারপাশে নেই সে সব খুশি-খুশি তরুণদের ভিড়। ওরা যা যা চাইতেন, সে সব দেবার দরাজ হাত গুটিয়ে নিয়েছি বলে ওরা আমার ওপর বিরক্ত।

ওখানে বসেই পারীর খবর পেলাম। আর সে সব ভয়ঙ্কর চরিত্রের মানুষগুলোর খবরও—মিরাবুঁ, রোবস্‌পীয়েরে, দাঁতোঁ, আবার তাদের মধ্যেও যিনি ভয়ঙ্করতম—অরলিঁস, যিনি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। 'তিনি কি চান, ফ্রান্সের রাজা হতে?' লুইকে জিজ্ঞেস করলাম। 'সেটা একেবারেই অসম্ভব।'

রাজার সহজ উত্তর। অথচ শুনতে পেলাম যে, প্যালেস রয়্যাল-এর বাগানে লোকেরা দিনরাত ভিড় করছে এবং ওদের দলপতি হলো অরলিঁস। মাদাম কঁপাঁকে ধরলাম। 'বাইরে যা যা ঘটছে আমাকে সব খুলে বলো, কিছুই গোপন রাখবে না।' 'মাদাম, পারীতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। জনতা মার-মুখী হয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আর দোকানদাররা নিজে-দের দোকানগুলো আগলিয়ে রাখছে।'

'হিংসাত্মক কাজ! ওতে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা।'

'দাঁতো, প্যালেস রয়্যাল-এর বাগানে এসে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে বিদ্রোহী সাংবাদিক দেসমুলিঁও। আরতোঁর পছন্দসই সবুজ রঙ ওরা পরিত্যাগ করেছে।'

'আরতোঁকে ওরা হয়তো আমার মতোই ঘৃণা করে।'

'মাদাম, ওদের এখন পছন্দ অরলিঁসের মনোনীত লাল রঙ। লাল, সাদা আর নীল—এই ত্রিরঙ, নেকার আর অরলিঁসের প্রতিমূর্তি নিয়ে ওরা মিছিল করে বেড়াচ্ছে।'

লুইয়ের মনোভাবের আবার পরিবর্তন হলো। স্থির করলেন, ওদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। সৈনিকদের শীঘ্রই আহ্বান জানাবেন তিনি। ব্যাস্তিলে পাঠাবেন ওদের বন্দী করে। স্টেট-জেনারেলকে বন্ধ করতেই হবে। এও বললেন, সৈনিকরা জনগণের ওপর বন্দুক ওঠাবে না।

চৌদ্দই জুলাইয়ের সেই ভয়ঙ্করতম রাত কখনই ভুলতে পারবো না। অসহ্য গুমোট ছিলো সেদিন, আমার কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। রাজার কথা স্বতন্ত্র। তিনি জেগেছিলেন সংবাদ বাহকের প্রতীক্ষায়। পারী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে যিনি এলেন, তিনি হলেন দ্যু ছ্য লা রোশফুকো। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, গলা কাঁপছে। তিনি রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন, আমিও গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে রাজার কক্ষে গেলাম।

ঘরে ঢুকে রাজাকে অভিবাদন করে মঁসিয়ে রোশফুকো বললেন, 'হুজুর, জনতা ব্যাস্তিল আক্রমণ করেছে।'

লুই বিছানায় উঠে বসে তখনও দু চোখ ঘষে ঘুম তাড়াচ্ছেন।

'ব্যাস্তিল···'তিনি শুধু বলতে পারলেন।

'ব্যাস্তিল এখন ওদের অধিকারে।'

'কিন্তু ব্যাস্তিলের গভর্ণর···'

'দ্য লনেকে ওরা হত্যা করেছে। বর্শার মাথায় ওঁর মাথা গেঁথে নিয়ে ওরা ব্যাস্তিলে প্রবেশ করেছে।'

'এতো বিদ্রোহেরই নামান্তর।' রাজা মন্তব্য করলেন।

'না হুজুর।' রোশফুকোর গলা গম্ভীর। 'এটা হলো বিপ্লব।'

ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম আমরা। সেই চিরকালের আমুদে মানুষ আরতোঁ আমাদের কক্ষে এসে ঢুকলো। 'পারীতে ওরা লোকজনকে খুন করে চলেছে। এখনই শুনলাম, খুনের তালিকায় আমার নাম ওপরের দিকে রয়েছে।' 'তুমি চটপট পালিয়ে যাও।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ।' রাজার গলা শান্ত। 'যাবার তোড়জোড় করো।'

নিজের কথাই ভাবছিলাম। তালিকায় আমার নাম কত নম্বরে রয়েছে? নিশ্চয়ই সবার ওপরে। বন্ধুদের কথাও ভাবলাম। গ্যাব্রিয়েল, প্রিন্সেস লঁব্যাল,। আরও তো অনেকেই রয়েছে।

'হ্যাঁ, পলিগ্ন্যাকদের কথাও ওরা বলছিলো।' আরতোঁ যেন আমার মনোভাব বুঝেই জবাব দিলো।

নিজের ঘরে গিয়ে কঁপাঁকে বললাম গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে দিতে। হত-চকিতা গ্যাব্রিয়েল এলো। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলাম। 'তোমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।'

'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

'হাতে সময় থাকতে থাকতে।' আমি বললাম।

'আর আপনি?'

'আমাকে রাজার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'আপনি বোধ হয় ভাবছেন···'

'ভাবছি নে, গ্যাব্রিয়েল। ভাববার সাহস আমার নেই।'

'আপনাকে ছেড়ে যেতে চাই না। তার ওপর ছেলেমেয়ে রয়েছে।'

'মনে মনে বিদ্রোহীদের কি তোমার পছন্দ? ভুলে যেও না যে, আমি

এখনও রানী। তোমাকে যেতেই হবে কারণ আমার তাই ইচ্ছে।'

'অসময়ে আপনাকে ছেড়ে যাবো?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে যাবে। সেটাই আমার ইচ্ছে।' আমি যাবার উপক্রম করলাম। 'আরতোঁ চলে যাচ্ছে। তুমিও যাবে। নইলে সবারই লন-এর অবস্থা হবে। এর পর আসবে আমাদের পালা।'

রাজার কাছে গেলাম। পারী থেকে দূত এসেছে। ওখানে রাজার উপস্থিতি জনগণ দাবি করছে। উনি যদি না যান, ওরাই ভার্সাইতে ছুটে আসবে।

'ওখানে গেলে আর হয়তো ফিরতে পারবে না।' আমি বললাম।

'আমি ফিরে আসবো।' ওঁর গলা এমন স্বাভাবিক আর শান্ত যেন দৈনন্দিন শিকারে যাবার কথা হচ্ছে।

জনতা দাবি করেছে—রাজার সঙ্গে ওঁর ভাইদেরও যেতে হবে। আরতোঁর জন্যে আবার শিউরে উঠলাম। জনতার প্রচার, সে নাকি আমার প্রেমিক। রটনাটা অনেক পুরনো। কিন্তু পুরনো ব্যাপারগুলোই নতুন করে সবার মনে পড়ছে।

দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, লুইয়ের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলাম। 'ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন' লুইয়ের কানে কানে বললাম। লুই কিন্তু অবিচল। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রজারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ওঁর মতো অমন ভরসা আমার নেই। ভাবছিলাম ওঁর মুখ আবার দেখতে পাবো কিনা।

মনে ভাসছে ব্যাস্তিল ভাঙার সময় জনতার মারমুখী ছবি, বর্শায় গাঁথা দ্য লন-এর মাথা। সেটা যেন বদলে যাচ্ছে রাজার মাথায়।

গ্যাব্রিয়েলের জায়গায় মাদাম দ্য তুরজেকে বাচ্চাদের গভর্নেস নিযুক্ত করলাম। তিনি শপথ নিয়ে জানালেন, যতদিন আমি চাইবো তিনি আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন কেন গ্যাব্রিয়েলকে ছাড়ানো হলো। রাস্তায় উন্মত্ত জনতা আমার সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলেরও কুশপুত্তলিকা দাহ করছিলো।

নিজের প্রাসাদে ফিরে এসে একা একা থাকতে চাইলাম। ভেতরে ভেতরে কি প্রচণ্ড টানা-পড়েন আমার। পারীতে স্বামী কি দশায় আছেন? ওরা কি রাজাকে হত্যা করবে? এখন কি করবো আমি? বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে যাবো? নাকি কাপড় জামা গুছিয়ে নিই বরং। গাড়ি তৈরি রাখি যাতে মুহূর্তের প্রস্তুতিতে বেরিয়ে পড়তে পারি।

বাচ্চাদের ঘরে গেলাম। ওদের সঙ্গেই না হয় খানিকক্ষণ থাকি। চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতার নজিরের তো অভাব নেই।

ছেলেটা লা ফন্টেনের গল্পের বই নিয়ে এলো। 'মামণি, শেয়ালের গল্পটা বলো না। কাল রাতে একটা শেয়াল দেখেছি আমি। রক্ষীরা নিয়ে এসেছিলো।'

'এখন থাক, সোনা।'

ছেলেটা অবাক হলো। 'মাদাম পলিগন্যাক কোথায়, মামণি?'

'তিনি এখন ভারি ব্যস্ত।'

'আজ যেন সবকিছুই ওলোটপালট হয়ে গেছে। মামণি, তুমি আজ আমার বাগান দেখো।'

'আজ আমরা ঘরেই থাকি। তোমাদের বই পড়ে শোনাই।'

ওদের পড়ে শোনাতে থাকি। কান কিন্তু আমার সজাগ, কখন কেউ যদি কোন খবর নিয়ে আসে।

এগারটার সময় রাজা ফিরে এলেন। আমি তখন নিজের ঘরে, ভয়ে কাঁপছি। তিনি জাতীয় পরিষদের ডেপুটিগণ কর্তৃক পরিবৃত, পেছনে আরও অনেক নরনারী। শুনলাম জনতার ধ্বনি 'রাজা দীর্ঘজীবি হোন।' উৎসাহিত হয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেলাম।

ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, কিন্তু বরাবরের মতোই শান্ত। কোটে দাগ লেগেছে, গলায় বাঁধা রুমালটি এলোমেলো, টুপিতে লাগানো রয়েছে ত্রিবর্ণ পতাকা। আবেগে আর স্বস্তিতে চোখে জল এসে গেলো আমার, রাজাও তা বুঝতে পারলেন। 'তোমার তো শুতে যাবার কথা, অপেক্ষায় বসে থেকে কেন নিজেকে ক্ষয় করছো?' যেন এমন আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা হলো ঘুম। কিন্তু জনতা যেন আমাদের শান্তি দিতে নারাজ।

বাইরের চত্বরে ওরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। 'রাজা।' ওদের চিৎকার। তারপরই যোগ করলো। রানী, যুবরাজ।'

রাজার দিকে তাকালাম। উনি সায় দিলেন। পাশে ছিলো মাদাম কঁপাঁ। ওকে বললাম, 'ডাচেস দ্য পলিগন্যাককে বলো আমার ছেলেকে যেন এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসে!' 'মাদাম, পলিগন্যাক নিয়ে আসবে!' 'না, না, ওর আসার দরকার নেই। ভয়ঙ্কর ওই জনতা ওকে যেন দেখতে না পায়।'

মাদাম কঁপাঁ ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলো। ওকে কোলে করে রাজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। জনতা চিৎকার করে উঠলো, 'রাজা, যুবরাজ, দীর্ঘজীবী হোন।' ছোট ছেলেটা যখন ওদের দিকে হাত তুলে নাড়াতে লাগলো, ওরা যেন একটু নরম হলো।

'রানী।' আবার ধ্বনি উঠলো।

আমার বাহুর ওপর কঁপাঁ হাত রাখলো। ওর চোখে ভয়। আমাকে দেখতে পেলে ওরা কি করে বসে সেই আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারী।

কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হবেই আমায়। না গেলে ওরা সারা বাড়ি তছনছ করে ফেলবে। আমার স্বামী আর সন্তানকে ওরা স্বাগত জানিয়েছে। অন্তত এই মুহূর্তে ওদের প্রতি কোন দ্বেষ দেখায়নি। কিন্তু আমার প্রতি ?

বারান্দায় পা দিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম। মাথা উঁচু করে ভয়-ডরের লেশমাত্র না দেখিয়ে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের স্তব্ধতা যেন অন্ত-হীন···তারপরই একজন বলে উঠলো, 'রানীর জয় হোক।' তারপরই প্রচণ্ড ধ্বনি, যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম, আমার মুখে তখনও হাসি···

তবু বোকামি আর নয়। জানি আজ ওরা যাকে ভালবাসবে কাল তাকেই ঘৃণা করবে। আজ যাকে কাঁধে তুলে নাচবে, কাল তাকেই হত্যা করতে ওদের হাত কাঁপবে না।

এক সময় এই নাটকের ওপর যবনিকা পড়লো। আমাদের শ্রান্তক্লান্ত শরীর বিছানায় নেতিয়ে পড়লো। লুই তো তক্ষুনি ঘুমের অতলে ডুবে

গেলো। কিন্তু আমার মধ্যে সেই অস্বস্তিকর ভাবনা—আগামী দিন-গুলো কেমন কাটবে আমাদের…

পরদিন রাজার মুখ থেকে পারীর ঘটনা শুনলাম। রাজা যখন পারী পৌঁছলেন, মেয়র বেইলী ওঁর হাতে তুলে দিলেন শহরের চাবি। এটা পুরনো রীতি। বেইলী এখন এই তৃতীয় গোষ্ঠীর সভাপতি। তিনি বললেন, 'উত্তম শহর এই পারীর চাবি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। পুরাকালে হেনরি কোয়াত্রেকে এই কথা বলা হয়েছিলো। তিনি জনগণকে জয় করেছিলেন। আর আজ জনগণ রাজাকে জয় করলেন।'

কথাগুলো শুনতে মোটেই সুখকর নয়, ওঁর সঙ্গে ফ্রান্সের মহত্তম রাজার এই তুলনা ওঁর প্রতি অপমানসূচক অথচ রাজা কোন বিরূপতা প্রকাশ না করে শান্তভাবে চাবিটা নিলেন। পঞ্চদশ লুই-প্রাসাদে কেউ একজন ওঁর প্রতি গুলি ছুঁড়েছিলো কিন্তু ওটা ওঁর গায়ে না লেগে একজন মহিলার মৃত্যু ঘটালো। সেই হট্টগোলের মধ্যে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলো। হোটেল দ্যু ভিলের সামনে রাজা গাড়ি থেকে নামলেন, বর্শা ও তরোয়াল নিয়ে সজ্জিত একদল লোকের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। চারপাশে মানুষের ভিড়। বিশৃঙ্খলা, ওঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে কারও সামান্য মাথাব্যথাও নেই। যেন ওরাই প্রভু। ওরা জানতে চাইলো, মঁসিয়ে বেইলীর পারীর মেয়রের পদে এবং মারি জোসেফ গিলবার্ট দ্যু লা ফায়েৎ-এর জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অধিকর্তার পদে মনোনয়নে ওঁর কোন আপত্তি রয়েছে কিনা। তিনি দুটো ক্ষেত্রেই তাঁর সম্মতি জানালেন।

হর্ষধ্বনি উঠলো। তিনি নম্রভাবে হাসলেন। বিশ্বাস করতে তাঁর বাধলো যে, জনগণকে তিনি বিপ্লবের মুক্ত সনদ দিয়ে দিলেন। নিজের টুপিতে ত্রিবর্ণ পতাকা আটকাতে কোন আপত্তি জানালেন না। তিনি রাজা হলেও প্রজাদের সগোত্র হয়ে গেলেন। 'রাজার জয় হোক' বলে ওরা ধ্বনি তুললো।

পরদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো। এখানে থাকা আর

একটুও নিরাপদ নয় আমাদের পক্ষে। আমাদের বেঁচে থাকা কঠিনতর হয়ে উঠছে।

মাদাম কঁপাঁকে পাঠালাম চত্বরে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে ওদের মনোভাব জেনে আসার জন্যে। ফিরে এসে যা শোনালো তাতে শিউরে উঠলাম। ওখানে, সাধারণ গরীব মানুষের ছদ্মবেশে এমন অনেকে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, যারা আমাদের মৃত্যু কামনা করে। মাদাম কঁপাঁকে ওরা শাসাতেও ক্রুটি করেনি। রাজাকে সে সব জানাতে তিনি বললেন, 'আমাদের বিরোধীপক্ষ একেবারেই থাকবে না, এমন ভাবা ঠিক নয়।'

'আমাদের পক্ষে কেউ রয়েছে এমন ভাবাই বরং বেঠিক।' তিক্ত গলায় বললাম। 'আমাদের সরে পড়াই উচিত, লুই। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু কেমন করে ভার্সাই ছাড়বো?'

'সহজেই। ছেলেদের আর আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুদের নিয়ে গোপনে পালিয়ে যাওয়া।'

'আরতোঁর এখনই চলে যাওয়া উচিত। ওদের চোখে ওর প্রতি জিঘাংসা দেখেছি।'

'আরতোঁ এবং গ্যাব্রিয়েল, ওরা কেউ একটুও নিরাপদ নয় এখানে।'

'আমি হলাম রাজা। আমার কর্তব্য হলো প্রজাদের সঙ্গে থাকা।'

'কিন্তু তোমার সন্তানরা?'

'জনগণ চায় যুবরাজ ভার্সাইতে থাকুক।'

'ওদের চোখে খুনের নেশা, ওদেয় গলায় হত্যার হুমকি।'

'কিন্তু সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজ্যসভার ব্যাপার।'

'তাহলে পরিষদের অধিবেশন ডাকো। দেরি করা ভালো হবে না।'

'কিন্তু পালিয়ে যাবোই বা কোথায়?'

'মেইৎজ্। গৃহযুদ্ধ বাধলে ওখান থেকে বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবো আমরা।'

'এটা রাজ্যসভার সিদ্ধান্তের ব্যাপার।' রাজা আবার বললেন।

রাজ্যসভার বৈঠক চললো সারাদিন ধরে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে

লাগলাম। রাজাকে জানিয়েছি যে, দেরি করা চলবে না। বন্ধুদের রাতের অন্ধকারে চলে যেতে আদেশ দিয়েছি। পালানোই বাঁচার একমাত্র পথ।

অবশেষে উনি বেরিয়ে এলেন। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওঁকে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'রাজা থাকবে তাঁর জনগণের সঙ্গে।'

হতাশায় দুচোখ ভরে জল এলো। উনি মনস্থির করে ফেলেছেন, যাই ঘটুক না কেন, উনি এখানেই থাকবেন। আর থাকবে যুবরাজ।

রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে দিলো। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে বিচিত্র ধরনের শব্দ আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ, নীচু গলার কথাবার্তা। বন্ধুদের বিদায় নেবার সময় এসেছে। সুখের দিনের আমুদে বন্ধু সব। অ্যাবেই ভেরমঁকে চলে যেতে বলেছি অস্ট্রিয়াতে। সবাইকে বিদায় জানিয়েছি। ভার্সাই ও পারী থেকে পালিয়ে ওরা নিজেদের বাঁচাক। আমার দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেই নিদারুণ তিক্ততায়ও হাসি ফুটলো আমার মুখে। ঠিক একটা অর্ধমৃত মানুষের মতো বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

এক সময় গাড়ি চলে যাবার শব্দ হলো। সমস্ত প্রাসাদ মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো।

মুষ্টিমেয় অনুগতদের নিয়ে সকালের প্রার্থনা সভায় যোগ দিলাম। ওদের মধ্যে আছে মাদাম কঁপাঁ, মাদাম দ্য তুরজে। কোন ভোজসভা নয়, তাসের আসর নয়। শুধু অনাগত কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার আগমনের আশ-ঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা। প্রতিদিন পারীর দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর আসতে লাগলো। শুধু পারী কেন, সারা দেশেই এমন তাণ্ডব চলতে লাগলো। বড় বড় প্রাসাদ আক্রমণ করে জনতা লুণ্ঠন চালাতে লাগলো, আগুন লাগিয়ে দিতে লাগলো। আমাদের নিন্দে করে প্রচার-পুস্তিকার অবাধ বিতরণ। প্রত্যেক দিন ঘুম ভাঙলে ভাবি আজই বুঝি পৃথিবীতে আমাদের শেষদিন। রাত্রে ঘুমতে যাবার সময় মনে হয় আজ রাত্রেই হয়তো জনতা আমাদের খুন করতে আসবে। প্রত্যেকটি প্রচার-পুস্তিকায় আমার নামই মুখ্য। ওরা রাজাকে ঘৃণা করে না। ওরা মনে করে রাজা একজন দুর্বল মনের মানুষ, আমার দ্বারা চালিত হচ্ছে। আমিই হলাম মূল অপরাধিনী।

অর্থ নৈতিক দপ্তরের অন্যতম মন্ত্রী ফুলোঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। তাঁর জামাই ম'সিয়ে বার্থিয়েরও একই দশা হলো। কাদের ভাগ্যে যে কি ঝুলছে অনুমান করা শক্ত। ফুলোঁ বলেছিলেন—রুটি না থাকে তো কি হয়েছে, ওরা তো ঘাস খেতে পারে। ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমার নামে একটা মিথ্যে উক্তিও ওরা জুড়ে দিয়েছে। আমি নাকি বলেছি—রুটির বদলে মানুষ তো কেক খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। আমার পক্ষে এমন কথা উচ্চারণ করা একেবারেই অসম্ভব।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম দিনগুলো কেটে গেলো। রাজাকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনবরত অনুরোধ করে চলেছি। নিজের গয়নাগুলো বাক্সে পুরে নিয়েছি। গ্যাব্রিয়েল আর আরতোঁর কোন খবর পাইনি। আমার পাশে রয়েছে চারজন—ল'ব্যাল, আমার সন্তানদের গভর্নেস তুরজে, এলিজাবেথ, আর প্রিয়সখি মাদাম কঁপাঁ। এখন ওরাই আমাকে ঘিরে রেখেছে।

চাকর এসে জানালো একজন আমার সাক্ষাৎ চান। মনটা বিরক্তিতে ভরে গেলো। কিন্তু দরজায় যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, সে যেন আমার জন্মজন্মের সখা। 'তুমি, তুমি এসেছো? এখন, কি তোমার আসার সময়? বন্ধুরা তো আমাকে ছেড়ে চলেই যাচ্ছে।' 'সেইজন্যেই তো ফিরে এলাম।' আক্সেল জবাব দিলো।

॥ বার ॥

আবার পেতি ত্রায়ানোতে আশ্রয় নিলাম। আগে এখানে আসতাম আমোদ ফুর্তির জন্যে। এখন পালিয়ে এসেছি জনতার রোষানল থেকে বাঁচতে। আমি যা চাই তা হলো, সুখী একটা সংসার, ছেলেমেয়ের কলকাকলিতে ভরা, আর এমন একজন স্বামী যাকে আমি ভালবাসতে পারি। নিজের মতো করে লুইকে আমি ভালওবাসি। কিন্তু কেমন যেন

মনে হয় রাজার ভূমিকা পালনের জন্যে উনি যেমন ঠিক উপযুক্ত নন, স্বামী হিসেবেও ওঁকে ঠিক মানায় না।

জীবন ও মৃত্যুর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাতে থাকি, স্মৃতির মণিকোঠায় সব ছবিকে পর পর সাজিয়ে বিচার করতে থাকি, তখনও দেখি যে, আরোপিত দোষ ত্রুটির আবরণে অন্যের চোখে আমাকে যা দেখিয়েছে, আমি সত্যিই সেরকম কখনও ছিলাম না।

জানি, আমার অমন সাধের ত্রায়ানোকে আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবো না আমি। ধরে রাখতে পারবো না আমার জীবনকে…আমার সন্তানদের। সুতরাং যে কদিন থাকি এ সবের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে নিই। জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলি। আমার হাতে যে আর সময় নেই।

পূর্বে আক্সেল ভার্সাই ছেড়ে চলে গিয়েছিলো যাতে ওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার আরও কুৎসা রটনা না হয়' কিন্তু আজ! আজ তো সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজ আমারই তো ওকে একান্ত-ভাবে দরকার। প্রত্যেকটি বন্ধুকেই প্রয়োজন আমার। আর ও তো বলেছে আমার জীবনে ওর মতো বন্ধু আর আসবে না।

'এখানে থাকলে বিপদ হতে পারে তোমার।' আমি বলেছিলাম। 'তোমার জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। বিপদ এলে আসুক, মৃত্যু ঘটলে ঘটুক।' ওর নিশ্চিত জবাব।

ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম—না, তা হতে পারে না। ও বলেছিলো—আমি চাইলেও ওকে ঠেকাতে পারবো না। আমি চলে যেতে বললেও ও শুনবে না। ও আমার আরও কাছে সরে আসবে, কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করবে না।

ত্রায়ানো প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্যে আদর্শ স্থান, এখানে কেউ লক্ষ্য রাখছে না আমাদের ওপর। স্বামীকে ঠেকাতে পারি এমন সাধ্যি আমার নেই। আক্সেল ভ্য ফের্সেন সম্পর্কে লুই সব কিছু জানতেন এবং বুঝতেন। বুঝতেন যে, আক্সেলের প্রতি আমার ভালবাসা কতটা গভীর। আমি ওঁকে পরিষ্কার জানিয়েছিলাম যে, আক্সেলকে

দেহ দান করতে পারিনে আমি কারণ সেই দেহ সৃষ্টি করেছে ফ্রান্সের ভাবী রাজাকে। সেই হিসেবে আক্সেল আমার প্রেমিক নয়। স্বামী ঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেননি বা, কোন বাধানিষেধও আরোপ করেননি। হয়তো তিনি অতটা উদার বলেই আক্সেলের সঙ্গে আমার কোন দৈহিক সম্পর্ক তখন গড়ে ওঠেনি। ছোট মেয়ে সোফির জন্মের পর লুইয়ের সঙ্গেও যৌন সম্পর্কের ইতি ঘটে গেছে। আমাদের কেউই প্রকৃতপক্ষে যৌনতার দাসত্ব করিনি।

কিন্তু আক্সেলের প্রতি আমার প্রেমের সংজ্ঞা একেবারেই আলাদা। আমাদের দৈহিক সম্পর্ক মানসিক একীকরণের নামান্তর। চারদিকের অবস্থা এমন ভীতিপ্রদ না হয়ে উঠলে তাও ঘটতো কিনা সন্দেহ। এখন তো প্রত্যেক মুহূর্তেই মৃত্যুভয়, বুকের কাছে অন্যের নিশ্বাসের উত্তাপ যেন আমাকে প্রতি মুহূর্তে জীবনের আঙিনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসছে।

লুইও তাই চেয়েছেন। সেই নরম উদার মনের মানুষটি চেয়েছেন সেই আতঙ্কিত মুহূর্তে আমি যেন জীবনকে ধরে রাখার মতো কিছু রসদ সংগ্রহ করতে পারি। সুতরাং দুজন মানুষের প্রেমের পরিধিতে আমি বেঁচে রয়েছি—পাশেই রয়েছে আমার সন্তানরা। এটাও একধরনের বোকামি, একধরনের ভ্রান্তিবিলাস কিন্তু ভয়ের পরিবেশে তো বেশিক্ষণ বাস করা চলে না।

এখন আমার দুটো জীবন—ভার্সাইয়ের পরিত্যক্ত প্রাসাদের অতীতের স্মৃতিমেখলার সঙ্গে জড়িত অনাগত নিদারুণ ভবিষ্যতের ছবি তৈরি করতে করতে বেঁচে থাকা—আর ত্রায়ানোতে অন্য এক জগতের রূপ-রস-গন্ধের, হঠাৎ উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া যৌবনের, রক্ত আর রুটির গন্ধে হন্যে হয়ে ওঠা কতকগুলো জান্তব জীবনের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জীবন।

আমাদের দেখা হতো সন্ধ্যার নিবিড় মুহূর্তে, সেই প্রেমমন্দিরের গভীর ছায়ায়। ওখানে বসে বসে স্বপ্ন দেখতাম, কথা বলতাম, প্রত্যেক মুহূর্তেই ভাবতাম পরস্পরের মধ্যে তলিয়ে যাবার এটাই শেষ মুহূর্ত আমাদের।

রক্ষীরা আর নেই। ভার্সাইতে একদিন সকালে উঠে দেখলাম আমাদের পাহারা দেবার জন্যে আর কেউ নেই। আগষ্ট মাসের চার তারিখে রাজা বাধ্য হলেন সামন্তপ্রথা বিলুপ্তির দলিলে স্বাক্ষর দিতে। কদিন পরেই লা ফায়েৎ মানবিক অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা তৈরি করলেন। এটা হলো জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকারের বিলুপ্তির প্রথম পদক্ষেপ, এতে প্রথম ঘোষিত হলো সব মানুষ সমান। লা ফায়েৎ অবশ্যই মারমুখী জনতাকে নিয়মানুবর্তিতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন, সফলও হয়েছিলেন খানিকটা। নইলে রাজাকে ওরা জোর করে লুভেরে উঠিয়ে নিতো।

মার্সি এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, ভার্সাইতে নিজেকে ধরে রেখে রাজা চরম বোকামির পরিচয় দিচ্ছেন। আক্সেলও একথা বলেছিলো আমায়। রাজার উচিত মেইৎজেতে চলে যাওয়া। ওখানে রাজতন্ত্রবাদীরা রয়েছেন, রাজার কোন বিপদ হবে না। কিন্তু লুইকে রাজি করানো গেলো না।

অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। রুটির চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না শহরে। কোথাও ময়দা নেই। সামনে এগিয়ে আসছে শীত—ঠাণ্ডা ক্ষুধার্ত শীত।

পাঁচই অক্টোবরের দিন ছিলো গুমোটভরা, মাঝে মাঝে এক এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি ত্রায়ানোতে গেলাম। আক্সেল হয়তো আসতে পারে। কি রকম শ্বাসরোধ করা আবহাওয়ায় দিন কাটছে আমাদের। চতুর্দিক থেকে অবিরাম দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর আসছে। আমাদের ওপর আক্রমণ চলতে পারে যে কোনদিন।

ত্রায়ানো এই গুমোট আবহাওয়াতেও সুন্দর। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে পায়চারি করছিলাম। আক্সেল আসেনি। বাইরের প্রাঙ্গণে এখন ফুলের সমারোহ তেমন নেই, এখানে ওখানে কচি কিশলয়ের মুখ দেখছি। আজ রাতে আর ভার্সাইতে ফিরে যাবার ইচ্ছে করছে না। ভাবতে ভালো লাগছে যে, শহরের গোলমাল থেকে অনেকদূরে সরে এসেছি।

কারও পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম। খুশি হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে, বোধ হয় আক্সেল আসছে। না, আমাদের চাকর একজন। একটা

চিঠি এগিয়ে দিলো। 'মাদাম, কঁৎ ছ্য সাঁ-প্রিস্ত-এর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।' চিঠিটা পড়লাম—এক্ষুনি প্রাসাদে ফিরে আসুন। দুষ্কৃতরা ভার্সাইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। 'তুমি যাও, আমি পায়ে হেঁটে আসছি।' 'আমি গাড়ি এনেছি।' 'তা হলে চলো।'

আমার আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজাও শিকার থেকে ফিরলেন। ওঁর সারা গা কর্দমাক্ত। কঁৎ সাঁ-প্রিস্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'হাতে একটুও সময় নেই। পারীর মহিলারা ভার্সাইয়ের উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়েছে।' রক্ষীবাহিনীর ক্যাপটেন এসে রাজাকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। 'আদেশ?' রাজা যেন অবাক। 'একদল নারীকে ঠেকানোর জন্যে! আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি?' 'এরা সামান্যা নারী নয়। এর মধ্যে ছদ্মবেশে পুরুষও লুকিয়ে থাকতে পারে। হাতে হাতিয়ার রয়েছে ওদের—ধারালো ছুরি আর মোটা মোটা লাঠি। ওদের মতলব ভালো নয়।' 'তবুও নারীর বিরুদ্ধে সৈন্যদের লেলিয়ে দিতে পারি না।'

মঁসিয়ে সাঁ-প্রিস্তের ভুরু কুঁচকে গেলো। ঠিক এই সময়ে সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ উঠলো, আক্সেল ঘরে ঢুকলো প্রায় ছুটতে ছুটতে। 'জনতার আক্রমণ আসছে।' সে চিৎকার করে উঠলো। 'রানী আর শিশুদের এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়া উচিত। রাজা ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন প্রেমিক বলেই ওর মাথাব্যথা বেশি। 'হ্যাঁ, মঁসিয়ে সাঁ-প্রিস্তও সেকথা বলছিলেন। চলুন, আলোচনায় বসা যাক।'

আক্সেল অধৈর্য হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছি। ও তো মিছিলটা দেখে এসেছে। ওদের হাবভাব, কথাবার্তা শুনেছে। ও জানে ওরা আসছে রক্তের জন্যে—আমার রক্ত। নারীবাহিনীর এই মিছিলটা যে বিদ্রোহীদের চতুর চাল সেটা ও বুঝেছিলো। পুরুষ মিছিল এলে সৈন্যরা তাদের ওপর গুলি চালাতো, কিন্তু বীরচূড়ামণি রাজা মেয়েদের ওপর কখনই হাত তুলবেন না। বিপ্লবী নেতাদের এটা ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা। পারীর নারীদের উত্তেজিত করে তুলেছেন ওঁরা। আমিই হলাম তাদের শিকার। তারা আমার মাথা চায়। ওরা পারীতে ফিরে যাবে রাজা ও সন্তানদের নিয়ে সঙ্গে অবশ্য আমাকে নিয়ে, তবে সেটা হবে আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের

কয়েকটা টুকরো মাত্র। সব কিছু আক্সেলের মুখেই পড়তে পারছিলাম। ওকে এমন বিপর্যস্ত আর কখনও দেখিনি, নিজে নিরাপত্তার কথা না ভেবে শুধু আমার জন্যেই ছুটে এসেছে।

সাঁ-প্রিস্ত অবশ্যই আমার আর আক্সেলের সম্পর্কের কথা জানতেন। তিনি চান রাজতন্ত্র বাঁচাতে। আক্সেলকে একজন মহৎ হৃদয়ের বন্ধু হিসেবে ভাবেন তিনি। ওখানে রাজভক্ত মন্ত্রী যাঁরা তখনও ছিলেন, তাঁদের চটপট ডাকলেন তিনি। ফ্লাওার্স বাহিনী পাহারা দেবে শ্যেন নদীর সেতু। সাঁ-ক্লদ ও নেউলী হাতছাড়া করা হবে না। রাজপরিবারকে নিয়ে যাওয়া হবে র‍্যামবুলেতে, শক্ত-সমর্থ রক্ষীবাহিনী সঙ্গে করে রাজা যাবেন বিক্ষোভকারিণীদের সঙ্গে দেখা করতে। রাজা ওদের ফিরে যেতে বলবেন। ওরা যদি আপত্তি করে গুলি চালানো ছাড়া উপায় থাকবে না। তারপর, সৈন্যদের অধিকর্তা হিসেবে রাজা র‍্যামবুলে চলে যাবেন ও সেখান থেকে মেইৎজের মূল বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবার ব্যবস্থা করবেন। রাজাকে তিনি বললেন।

'গৃহযুদ্ধ?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'বিপ্লবের থেকে অন্তত ভালো।' আক্সেলের জবাব।

'তার মানে রাজা বিপদে পড়বেন।' আমার মন্তব্য।

'মাদাম, আপনি এখনই বিপদে ডুবে আছেন।' আক্সেল বললো।

রাজার মধ্যে সংশয়। জানি ওখানে গিয়েও নারীদের ওপর গুলি চালানোর হুকুম তিনি কখনই দেবেন না। সাঁ-প্রিস্তের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে রাজার দৃঢ়চিত্ততার অভাবে। তাঁর সঙ্গে আমারই থাকা দরকার। আমার দৃষ্টির বাইরে ওঁকে কোন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারবো না আমি। 'আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার।' রাজাকে বললাম। 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। পরিবারের অন্যেরা যাবে র‍্যামবুলেতে।'

রাজার সংশয় কাটলো না। স্থির করলেন যে, পালাতে পারবেন না তিনি। প্রজাদের মুখোমুখি হতেই হবে তাঁকে। আক্সেল অস্থির হয়ে উঠলো। খবর এলো, মিছিল প্রায় প্রাসাদের সামনে এসে পড়ছে।

ওদের অনেকের হাতে ছোরা, গলায় হুংকার—রানীর রক্ত। রাজাকে ওরা পারীতে নিয়ে যেতে চায়। 'আপনি যদি ওদের হাতে ধরা দিয়ে পারীতে যেতে বাধ্য হন, আপনার রাজত্বের অবলুপ্তি ঘটে যাবে।' সাঁ প্রিস্ত বললেন। নেকার তখন বিদ্রোহীদের প্রিয়পাত্র। সেটা হারাতে চান না বলেই উনি র‍্যামবুলেতে পালানোর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। আর রাজা এই দুই বিপরীত অভিমতের মধ্যে দুলতে লাগলেন। সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। জানি, অবস্থা যেদিকে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেই পা বাড়াচ্ছেন তিনি। এই বিপ্লবের সূত্রপাত তো তাঁর সেই মনোভাব থেকেই! আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। ভাগ্য যেসব সুযোগ আমাদের সামনে এনে দিয়েছিলো রাজার দীর্ঘসূত্রতায় সব কিছু ফস্কে গেলো।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামলো। বিক্ষোভকারীরা এখন ভার্সাইয়ে এসে গেছে। ঠাণ্ডায়, সপসপে অবস্থায়, ক্রোধান্ধ হয়ে চিৎকার করছে। নেশাসক্তও বটে, কারণ আসার সময় রাস্তার মদের দোকানগুলো ওরা লুট করেছে। ওদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে ছিলেন লা ফায়েৎ ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী। তবে এটা পরিষ্কার যে, এই নারীবাহিনীর উদ্দেশ্য হলো আমাকে হত্যা করা এবং তারপর লা ফায়েৎ ও তাঁর জাতীয় বাহিনী রাজাকে পারী টেনে নিয়ে যাবেন।

সারা শহরের ওপর কুয়াশা জমেছে। আমরা এখন মিছিলকারিনীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, 'রুটি চাই, রুটি চাই।' তারপর ওদের মুখে আমার নাম শুনলাম। ওদের রানীকে দরকার। ওদের চাই বর্শায় গাঁথা আমার মাথা। আমার হৃৎপিণ্ড শরীর থেকে আলাদা করে ওরা পারীতে নিয়ে যাবে। সেই চরম অসহায় অবস্থায় মার মুখ মনে পড়লো আমার। তিনি বলতেন, মৃত্যুভয় যেন কখনও আক্রমণ না করে আমাকে। ওটা যদি নিশ্চিত এসেই পড়ে ওকে স্বাগত জানাবার সৎসাহস যেন আমার থাকে। মনে পড়লো আমার ছেলেমেয়ের কথা। এরা নিশ্চয়ই ওদের কোন ক্ষতি করবে না।

রাজার শান্ত মেজাজ অবশ্যই খানিকটা আশা জাগালো আমাদের মনে। তিনি বিশ্বাসই করতে চান না তার প্রজারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। ওরা যখন জানালো যে, ওদের দাবিদাওয়া উপস্থাপিত করার জন্যে কয়েকজন প্রতিনিধি রাজার কাছে পাঠাবে, রাজা তাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। পাঁচজনের একটি দলকে ওরা পাঠালো, যার নেতৃত্ব করলো সুন্দরী লুইসোঁ চাবরি, যে ফুল বিক্রি করে। রাজার সামনে এসে ওঁর মার্জিত আচরণে এই মহিলা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো, মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না ওর। কোন রকমে ও উচ্চারণ করলো, 'রুটি চাই আমাদের।' রাজা চট করে ধরে না ফেললে ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েই যেতো। সংজ্ঞা ফিরে এলে রাজা একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে ওর কথা শুনলেন। বিদায় নেবার সময় লুইসোঁকে একটা চুম্বন করে বিদায় দিলেন তিনি।....

রাতের আঁধার ঘন হয়ে নামলো। সাঁ-প্রিস্ত এবং আক্সেল চটপট কিছু করতে চাইছিলেন। তাঁদের মতে এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অর্থহীন। লুইও ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে, অন্তত আমাদের জন্যে হলেও তাঁর র‍্যামবুলেতে যাওয়া উচিত। আমার হাত ধরে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছো। আমাদের ছাড়াছাড়ি চলবে না।'

একরকম ছুটেই বাচ্চাদের কাছে চলে গেলাম। মাদাম তুর্জেকে বললাম, 'আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যেই ওদের তৈরি করে নিন।' কিন্তু তখনই রাজার একজন চাকর এসে খবর দিলো—পালিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। জনতা আস্তাবলে ঢুকে পড়েছে, কোন গাড়ি বার করতে দেবে না ওরা। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আবার একটা সুযোগ হারালাম আমরা।

মাদাম তুর্জেকে বললাম বাচ্চাদের বিরক্ত না করতে। আক্সেল এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। বললো, 'হুকুম দাও, আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো বের করে আনি। তোমার নিরাপত্তার জন্যে অন্তত এটা করা দরকার।

'আমার নিরাপত্তার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করা উচিত নয়।'

'তা হলে কিসের জন্যে করা উচিত ?'

'রাজার জন্যে। আমি ভয় পাইনি। মা বলতেন, মৃত্যুভয় আমার থাকতে নেই। ওটা যদি আসেই, তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।'

চলে গেলো আক্সেল। আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু একটা মানুষের ভালবাসা কি করে অতগুলো লোকের রোষবহ্নি থেকে আমাকে রক্ষা করবে ?

মধ্যরাত্রির পর লা ফায়েৎ ভার্সাই এলেন। প্রাসাদের বাইরে নিজের লোকদের অপেক্ষা করিয়ে রেখে তিনি রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। লা ফায়েতের সবকিছু নাটকীয়, নিজেকে তিনি বিপ্লবের নায়ক বলে তখন ভাবতে শুরু করেছেন। প্রথমেই রাজার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—এমন ভাব জাহির করলেন। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে, লা ফায়েতের আনুগত্য সম্পর্কে ওঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে রাজা বললেন, 'সারাদিন ধকল গেছে, এখন তুমি বিশ্রাম নিতে যাও। মঁসিয়ে লা ফায়েৎ অন্য সবকিছুর ওপর নজর রাখবেন।'

'মহানুভব রাজার উদ্বেগের কিছু নেই।' লা ফায়েৎ নমস্কার জানিয়ে বললেন। 'জনতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সারারাত ওরা শান্ত থাকবে।'

সারাদিনের উত্তেজনা আমাকে সম্পূর্ণ ক্লান্ত-শ্রান্ত করে তুলেছে। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম…।

ঘুম ভাঙলো, রাত তখন শেষ হতে চলেছে। বাইরে সেই কর্কশ, উত্তেজিত শব্দবিন্যাস। ঘণ্টা বাজাতেই একজন পরিচারিকা এলো।

'কারা কথা বলছে বাইরে ?'

'পারীর সেই মেয়েগুলো তবে ভয়ের কিছু নেই, মঁসিয়ে লা ফায়েৎ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওরা আমাদের কোন রকম বিরক্ত করবে না।'

আবার শুয়ে পড়লাম কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেই পরিচারিকাটি জাগিয়ে দিলো আমায়। বিছনার পাশে আরও একজন দাঁড়িয়ে। 'শিগগির পোশাক পরে নিন, মাদাম, ওরা বারান্দায় উঠে এসেছে। ওরা প্রাসাদ আক্রমণ করতে আসছে।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মাদাম কঁপাঁর বোন মাদাম থিবো ছিলো ওখানে। চটপট আমার পায়ে জুতো গলিয়ে দিলো, গায়ে পরিয়ে দিলো একটা ঢিলে জামা। সেই মুহূর্তেই ওদের গলা শুনতে পেলাম। 'এদিকে। এই ওর ঘর। আমিই ওর বুকে ছোরা মারবো।' 'না, না, এ সম্মানটুকু আমারই প্রাপ্য।'

'এক্ষুনি চলুন?' মাদাম থিবো বললো। 'আর সময় নেই।'

'রাজার ঘরে।' কোন রকমে উচ্চারণ করতে চাইলাম, 'আমার ছেলে মেয়ে…'

সংকীর্ণ বারান্দা দিয়ে মাদাম থিবো একরকম টেনেই আমাকে রাজার শয়ন কক্ষের দিকে নিয়ে গেলো। দরজা বন্ধ ছিলো। ভয়ানক ভয় পেলাম, অনুসরণকারিণীরা পেছনে রয়েছে বলে। মাদাম থিবো দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলো,'দরজা খোলো, ঈশ্বরের দোহাই দরজা খোলো, রানীর জন্যে—

পেছনে ওদের গলা। 'আমাদের বোকা বানিয়েছে! পালিয়েছে! কোথায় সে? তাকে খুঁজে বের করবো।'

দরজায় দুজনে ধাক্কা দিচ্ছিলাম প্রাণপণে, চোখের সামনে এসে দাঁড়ানো মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার জন্যে। হঠাৎ খুলে গেলো সেটা। হুমড়ি খেয়ে ঘরের ভেতরে পড়লাম দুজনে। যে চাকরটা দরজা খুলে দিয়েছিলো, সেই আবার বন্ধ করে দিলো। আমি ভয়েকাঁদছিলাম। মৃত্যুকে তেমন ভয় করিনে কিন্তু এই ঘৃণ্য অশ্লীলভাবে মরাটা একটুও মনঃপুত নয় আমার।

'রাজা!' চিৎকার করে বললাম।

'তিনি তো আপনারই শোবার ঘরে গেছেন আপনার খোঁজে।'

'কিন্তু সেখানে তো ওরা রয়েছে।'

'উনি গেছেন গোপন পথ দিয়ে।' এ সেই গোপন পথ যেখান দিয়ে রাজা আমার শোবার ঘরে আসতেন আমার সঙ্গে মিলিত হতে। তিনি কি নিরাপদে আছেন?

'আমার ছেলেমেয়ে?' বলতে বলতেই দেখলাম, মাদাম তুরজে

ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওদের গায়ে ঘুমের পোশাকের ওপর ঢিলে জামা। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওদের। রাজা এলেন। শান্ত, একটুও যেন তাড়াহুড়ো নেই। 'ওরা তোমার শোবার ঘরে, ঘরটাকে তছনছ করছে।'

হঠাৎ রাজার ঘরের দরজার ওপর প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ। আমরা বসে রইলাম। লুইও ভাবলেন, আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত সমাগত। তারপর ধাক্কা বন্ধ হলো। একটা চাকর ছুটে এসে খবর দিলো, রক্ষীরা প্রাসাদ থেকে জনতাকে বের করে দিচ্ছে।

ছুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইলাম। ছেলেটা আমার পোশাক ধরে টানতে লাগলো। 'মামণি, ওরা সবাই কি করছে?' ওকে নিজের সঙ্গে চেপে ধরলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমার মেয়ে ভাইয়ের হাত ধরে বললো, 'মামণিকে বিরক্ত করো না?'

বাইরে লোকেরা অরলিঁসের নামে ধ্বনি তুললো। শিউরে উঠলাম, বুঝলাম এসবের পেছনে দু ড্য অরলিঁস রয়েছেন। এলিজাবেথ এসে রাজকুমারকে কোলে তুলে নিলো। ওকে দেখে একটু শান্তি পেলাম।

বাইরের জনতা আবার ধ্বনি তুললো। 'রাজা বারান্দায় আসুন।'

লুইয়ের দিকে তাকালাম। তিনি বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। তাঁর মধ্যে ভয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। লা ফায়েৎ ঘরের মধ্যে এলেন। জনতার এই আক্রমণে তিনি মর্মাহত। ওরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

প্রোভাঁস এলো, সঙ্গে দু ড্য অরলিঁস। প্রোভাঁসের হাবভাব ঠাণ্ডা, অরলিঁসের চোখে ধূর্তোমি। লা ফায়েৎ বারান্দায় চলে গেলেন।

'রাজা।' জনতার প্রচণ্ড চিৎকার। লা ফায়েৎ ওদের জানালেন, রাজা মুক্তির দলিলে সম্মতি দিয়েছেন। ওদের এখানে আসা সফল হয়েছে, এখন ওরা ঘরে ফিরে যেতে পারে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কর্তা হিসাবে এই অনুরোধ জানাচ্ছেন উনি।

জনতা একটুও নড়লো না। ওদের কেউ চিৎকার করে উঠলো, 'রানী, রানীকে বারান্দায় চাই।' অন্যেরা তার ধুয়ো ধরলো। কানফাটা চিৎকার উঠলো চারদিক থেকে।

'না।' রাজা বললেন। 'তোমাদের উচিত নয়…'

আক্সেল ঘরে ঢুকলো। আমার দিকে পা বাড়াতেই আমি দুচোখে ওকে বারণ করলাম, যে প্রেম আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত,এত লোকের সামনে তা যেন ও প্রকাশ করে না দেয়। আমি বারান্দার দিকে পা বাড়ালাম।

মেয়ে কেঁদে উঠলো। বললাম, 'কোন ভয় নেই মা। লোকেরা শুধু আমাকে দেখতে চাইছে।'

আক্সেলই মেয়ের হাত আমার হাতে তুলে দিলো। ছেলেকে তুলে দিলো আমার কোলে।

'না না,' আমি বললাম, কিন্তু ও আমাকে বারান্দার দিকে ঠেলে দিলো। ওর ধারণা জনতা আমার সন্তানদের ক্ষতি করবে না।

আমার উপস্থিতিতে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধতা নামলো। তারপরই ওদের চিৎকার। 'ছেলেদের চাই না, ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

বুঝলাম ওদের ইচ্ছে আমাকে হত্যা করা। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাদাম তুর্জের হাতে ওদের তুলে দিলাম।

একাই বারান্দায় গেলাম। মাথার ভেতর দামামা বাজছে। একটা পদক্ষেপেই যেন অনন্তকাল সময় নিলাম। সময় যেন থেমে রয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ওই একটি পদক্ষেপ নেবার জন্যে সারা পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে।

হয়তো বা আমার একান্ত ভয়হীনতা, আমার মধ্যে নারীত্বের দুর্লভ লালিত্য, মৃত্যুর প্রতি আমার অবিশ্বাস্য উদাসীনতা ওদের স্পর্শ করলো। কেউ হঠাৎ বললো, 'রানীর জয় হোক।' অন্যেরা তাতে গলা মেলালো। মাথা নীচু করে নমস্কার জানিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এলাম।

ওখানেও সমান স্তব্ধতা। তারপর রাজা এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন আমায়। ওঁর চোখে জল, বাচ্চারাও কাঁদতে কাঁদতে আমায় জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু সেই শান্তি তো শুধুমাত্র কয়েক মুহূর্তের। জনতা আবার চিৎকার করতে লাগলো। 'পারী। রাজাকে পারী যেতে হবে।' রাজা

বললেন—বিষয়টা জাতীয় পরিষদে আলোচিত হওয়া দরকার। ওদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হোক। বাইরের জনতা অধৈর্য হয়ে হল্লা করতে লাগলো, 'রাজাকে পারী যেতে হবে।'

'রক্তপাত আমাকে বন্ধ করতেই হবে।' রাজা বললেন। 'আমি পারী যাবো।' তারপর বারান্দায় গিয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ, স্ত্রী আর ছেলেদের নিয়ে আমি পারী যাবো। আমার প্রিয় ও অনুগত প্রজাদের আমি বিশ্বাস করি।'

জনতা হর্ষধ্বনি তুললো। তাদের মিছিল সফল হয়েছে। লা ফায়েৎ বারান্দা থেকে ঘরে এলেন। আমায় বললেন, 'এ নিয়ে আপনার ভেবে দেখা উচিত।'

'ভেবে দেখেছি।' বললাম। 'জানি, ওরা আমায় ঘৃণা করে। জানি, আমার রক্তে ওরা হাত রাঙাতে চায়। তাই যদি আমার ভাগ্যে থাকে, আমি স্বীকার করে নেবো। আমার স্থান আমার স্বামীর পাশেই।'

•

একটার সময় ভার্সাই ত্যাগ করলাম। আকাশে রোদ্দুর ফুটেছে, হেমন্তের সুন্দর দিন। কিন্তু আমাদের মনের অতল-শূন্যতা তাতে ভরে উঠলো না।

আমাদের গাড়িতে রাজার সঙ্গে আমার সন্তানরা, মাদাম তুরজে, প্রোভাঁস ও তার স্ত্রী এবং এলিজাবেথ রয়েছে।

সে যাত্রা ভোলবার নয়। গাড়ির পেছনে রয়েছে সারি সারি হিংসো-ন্মত্ত মুখ, চারপাশের মানুষের চোখে হত্যার চাহনি। ছ ঘণ্টা লেগে গেলো পারী পৌঁছতে। এসব খুনেরা রক্ষীদের হত্যা করে ওদের মাথা বর্শায় গেঁথে নিয়েছে। আমাদের অবস্থাও যে তাই হবে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

অবশেষে পারী পৌঁছনো গেলো। সেই আসাটা নিষ্ঠুর ভয়ংকর-তায় ভরা। অর্ধনগ্ন মেয়েদের মিছিল; অশ্লীলভাবে সৈন্যদের কাঁধের ওপর লেপটে পড়ছে ওরা। আসার সময় সরকারী শস্যভাণ্ডার লুঠ করেছে, ময়দার বস্তাগুলো গাড়িতে করে নিয়ে আসছে। চিৎকার করে

বলছে—আর রুটির অভাব হবে না আমাদের। রুটিওয়ালা, তার বউ আর ছেলেকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছি।' আমার ছেলেটা কাঁদছে। 'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, মামণি।' অতি কষ্টে ওর কান্না থামালাম।

পারীর মেয়র বেইলী সম্বর্ধনা জানালেন আমাদের।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আমরা হোটেল দ্য ভিল-এ পৌঁছলাম। বেইলী আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন আমরা রাজা রানী। কিন্তু আসলে ওদের হাতে আমরা বন্দী।

সামান্য সুযোগ দেওয়া হলো আমাদের। হোটেল দ্য ভিল থেকে তুলেরি যাবার অনুমতি পাওয়া গেলো। সেই বিষণ্ণ, পরিত্যক্ত জায়গা-টাই ওরা আমাদের বসবাসের জন্যে মনোনীত করে রেখেছিলো।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো তুলেরিতে প্রবেশ করলাম। ঠাণ্ডা, স্যাঁৎস্যাঁতে জায়গাটা। বারান্দা এমন অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও তেলের বাতি জ্বালাতে হচ্ছে যাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়ার উদ্‌গিরণ বেশি। এমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে, ঘুমিয়ে পড়তে পারলে সবাই বাঁচি। কুমার তো খাবার কথা ভুলেই গেছে। বললো, 'জায়গাটা ভারি বিচ্ছিরি মামণি, চলো আমরা নিজেদের বাড়িতে যাই।' একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

অনভ্যস্ত বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না। বারবার মুদিত চোখের ওপর ভাসতে লাগলো বর্শায় গাঁথা মুণ্ডুগুলো। আমাদের বরাতেও কি তাই রয়েছে? রাজা কিন্তু অঘোরে ঘুমুলেন।

সকালে একটু যেন ভালো লাগতে লাগলো। সূর্যালোকে জায়গা-টাকে তেমন ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। গত রাতে যে বেঁচেছিলাম, তাই যেন আমার সৌভাগ্য।

রাজার মুখে আশার বাণী। 'ভার্সাই থেকে আসবাবপত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো। আমার বিশ্বাস প্রজারা চায় আমরা এখানে ভালোভাবে বাস করি।' নিজের প্রজাদের সম্পর্কে ওঁর এই বিশ্বাস-বোধকে একটুও মেনে নিতে ইচ্ছে করে না।

অনুগত ভৃত্যেরা আমাদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করলো। জায়-

গাটা ঘুরে দেখারও সুযোগ হলো আমাদের। দোতলার যে কটা ঘর বাসযোগ্য মনে হলো, তাতে রাজা, এলিজাবেথ আর বাচ্চাদের শোবার ঘর নির্দিষ্ট হলো। আমার শোবার ঘর একতলায়, সঙ্গে আরও চারটে ঘর। মনে হলো সব বদলে গেছে। সব আভিজাত্য, বিলাসব্যসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আমার আর সে সবের প্রয়োজন নেই। এখন শুধু স্বামী, সন্তান ও প্রেমিকের সাহচর্য পেলেই আমার দিন কেটে যাবে।

কয়েকদিন পরে ভার্সাই থেকে আমাদের আসবাবপত্র এলো। কাঠের মিস্ত্রীরা দিনরাত কাজ করে ঘরগুলোকে বাসযোগ্য করে তুললো। রক্ষীরা অবশ্যই এলো লা ফায়েতের দল থেকে। এরা রীতি মানে না, সময়ে সময়ে আমাদের ঘরে উঁকি মারতে থাকে।

শীতের দিনগুলো এক এক করে গড়িয়ে যেতে লাগলো। আমার বয়স চৌত্রিশে পড়লো। অনেক কিছুই জানলাম এই সব দিনে। জনগণ রাজাকে ঘৃণা করে না, করে আমাকে। একেবারেই যেন বদলে গেলাম আমি। পরিবারের অন্যান্যদের থেকে আলাদা হয়ে নীচে বাস করতে লাগলাম। যে মানুষ কখনই ভাবনা চিন্তার মধ্যে সময় কাটায়নি, আজ সে-ই বসে বসে ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে লাগলো। মেয়ে থেকে পরিপূর্ণ নারীত্বে প্রবেশ করলাম যেন হঠাৎই—যেমন করে হঠাৎ আমার ভাগ্যের মোড় ঘুরেছে। সৌভাগ্য যে, আক্সেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়নি আমার। সে নিয়মিতই আসে। দু'জনে মিলে থাকার সুযোগ নেই, কিন্তু চুপিচুপি কথাবার্তা বলতে পারি। ও বলে, পারীতে যতদিন আমায় থাকতে হচ্ছে, ততদিন ওর মনে শান্তি ফিরে আসবে না। শুনি আর হাসি। সারা শীতকাল ধরে আমার প্রেমিক যে পরিকল্পনার কথা আমায় শোনালো তা হলো পারী ছেড়ে পালানোর।

যদিও মূলতঃ আমরা বন্দী, তবু রাজার চারপাশে যেন রাজসভার পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। লা ফায়েৎ প্রায়ই আসেন, জানান যে, তিনি রাজার সেবক। তাঁর মতলবে দোষণীয় কিছু ছিলো না। তিনি জানালেন, তাঁর কাছে প্রমাণ আছে, ভার্সাই-মিছিলের পরিকল্পনা করে-

ছিলো হ্ ত্ত অরলিঁস। ভবিষ্যতে ক্ষতিকর আর কিছু যাতে সে করতে না পারে সেজন্যে তাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেওয়া উচিত।

নিজের খুড়তোতো ভাই এমন বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠতে পারে, রাজা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু লা ফায়েৎ জোর দিয়ে বললেন, 'স্যার, ওর পরিকল্পনা হলো, আপনাকে গদিচ্যুত করে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়া। ওর জন্মসূত্রই এটা সম্ভব করেছে।'

অনেক বাদানুবাদের পর রাজা স্থির করলেন, অরলিঁসকে ইংলণ্ডে পাঠানো হবে। ইংলণ্ডে গিয়ে অরলিঁস সখ্যতা জমালো মাদাম ত্ত লা মোৎ-এর সঙ্গে আর দুজনে পরিকল্পনা করতে লাগলো কি করে আমাকে আরও নাজেহাল করা যায়।

আক্সেলকে ছাড়া সে-সব বিশ্রী শীতের দিন বোধ হয় কাটতো না আমার। গ্যাব্রিয়েল আমার পাশে নেই। লঁব্যাল অবশ্যই ছিলো কিন্তু সে তো গ্যাব্রিয়েলের স্থান পূরণ করতে পারে না। এলিজাবেথ বরাবরই আমার সঙ্গে থাকতো, ছেলে মেয়ে তো রয়েছেই। আমার মেয়ের স্বভাবও ভারি মিষ্টি হয়ে উঠেছিলো। কোন অভিযোগ না তুলেই এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলো ও। আমার ছেলেরও তুলেরির আবহাওয়া সহ্য হয়ে গিয়েছিলো। ওদিকে অরলিঁসের অনুপস্থিতিতে বিপ্লবের ধ্বজা হাতে তুলে নিয়েছিলো মিরাবুঁ। লোকটা বেশ বুদ্ধিমান।

ক্রমশই রাজনীতিতে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মতামতের ওপর আজকাল রাজাও অনেকখানি নির্ভর করছেন। রাজা তো এসব ব্যাপারে চিরকালের দ্বিধাগ্রস্ত। আমিই বিপ্লবের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম, আমরা তো অনেক কিছুই ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছু ছাড়া সম্ভব নয়। আক্সেল সমর্থন জানালো আমাকে। ও শুধু আমার প্রেমিক নয়, আমার উপদেষ্টাও। মিরাবুঁ নিজের মত বদলালো। বললো, 'রাজার সঙ্গে কেবল একজনই রয়েছেন—তাঁর স্ত্রী।'

ফেব্রুয়ারি মাসে আমার দাদা জোসেফের মৃত্যু আমাকে আরও অসহায় করে তুললো। মেজভাই লিওপোল্ড অস্ট্রিয়ার সম্রাট হলো।

তার সঙ্গে কোন কালেই আমার তেমন সহৃদয়তা ছিলো না। বুঝলাম ভিয়েনাও আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো।

তুলেরিতে কারও স্বাস্থ্যই ভালো যাচ্ছিলো না। রাজার ওজন বাড়ছে ব্যায়ামের অভাবে। আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। গ্রীষ্মকালটা সাঁ-ক্লুদে কাটাবার পরিকল্পনায় কেউ তেমন বাধা দিলো না। যাবার মুহূর্তে কিছু কিছু লোক অবশ্যই বাধা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জনতার বেশির ভাগই আমাদের বায়ু পরিবর্তনকে সমর্থন জানালো।

সাঁ-ক্লুদ আমাকে যেন আগের দিনে ফিরিয়ে আনলো। মার্সি তখন ব্রুসেলসে। জানালেন যে, মিরাবুঁকে যেন কোন কারণেই রুষ্ট না করে তুলি। সে-ই হলো একমাত্র মানুষ যে বিপ্লবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে রাজাকে আবার সিংহাসনে বসাতে পারে। কথাটা ভেবে দেখলাম। মিরাবুঁ নিজে এসেছে অভিজাত পরিবার থেকে, বিপ্লবী দলে অরলিঁসের পরেই ওর ভূমিকা। অরলিঁস তো এখন নির্বাসনে, মিরাবুঁ এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ইতি ঘটাতে চায়। আক্সেলও বললো, মিরাবুঁকে হাতছাড়া করা উচিত নয় আমাদের। ও-ই বললো আমাকে মিরাবুঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক করলাম সাঁ-ক্লুদেই ওর সঙ্গে দেখা করবো যাতে এর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত না হয়। সাক্ষাৎকার গোপন রাখতে হবে।

একদিন রবিবার সকাল আটটায় মিরাবুঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সবার অগোচরে বের হলাম। লোকটার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি কিন্তু ওর কুৎসিত মুখ দেখবার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। সারা শরীরে বসন্তের গভীর দাগ, চুলগুলো মাথার ওপর ফুলে ফেঁপে রয়েছে। নিষ্ঠুর মুখশ্রী যা প্রচণ্ড শক্তি ও পুরুষত্বের পরিচয় দেয়। এও শুনেছি, ওকে প্রথম দেখার মুহূর্তে মেয়েরা কেঁপে ওঠে কিন্তু ক্রমশই ওকে তীব্রভাবে ভালবাসতে বাধ্য হয়। এই মানুষটার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে কারার অন্তরালে। বর্তমানে ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রবল পুরুষ।

সে যখন কথা বললো—অপূর্ব কণ্ঠস্বর, আগে কখনও এমন কণ্ঠস্বর শুনেছি বলে মনে হলো না। ওর চেহারার ঠিক বিপরীত। তার আচরণ দেখার মতো। আমি যেন সত্যিই রানী, এমন শ্রদ্ধা দেখালো, যা

বহুদিন অনেকের কাছ থেকে পাইনি। আমাদের সহযোগিতা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলো সে। বললো, ও জনতার ইচ্ছার মোড় ঘুরিয়ে দেবে। ও চায় রাজা প্রকাশ্যভাবে ওকে আলোচনার জন্যে ডাকুন যাতে ওর পরিকল্পনা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে।

শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আক্সেল ছাড়া এমন প্রাণবন্যায় ভরা মানুষ আমার চোখে পড়েনি। ওকে জানালাম যে, ওর ক্ষমতা সম্পর্কে তিলমাত্র দ্বিধাও আমার নেই। সে জানালো, সেই মুহূর্ত থেকে আমি যেন তাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করি।

শরৎকালে তুলেরিতে ফিরতেই হলো। সেই বিষণ্ণ, হতাশ পরিবেশ। আমার উপদেশমতো রাজা মিরাবুঁকে আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। মিরাবুঁ আসা যাওয়া করতে লাগলো। ওদিকে পিসীদের স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়লো যে ওঁদের তুলেরি ছাড়া একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়লো। রাজাকে বলাতে উনি চেষ্টা করে দেখবেন বললেন কিন্তু করলেন না কিছুই। আক্সেলকে বলাতে ও বললো,'গোপনে ওঁদের সীমান্ত পার করে দিতে হবে। আপাতত ওঁরা নেপল্‌সে যান। সেখানে আমার বোন ওঁদের স্বাগত জানাবে।'

তাঁদের চলে যাবার দিনটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অরলিঁস ফ্রান্সে ফিরে এলো। কেন আসবে না? রাজা নির্বাসন দিয়েছেন বলে? রাজার ক্ষমতা আছে ওকে নির্বাসিত করার? ও সঙ্গে নিয়ে এলো মাদাম দ্য লা মোৎকে। সেও বা বিদেশে পড়ে থাকবে কেন? হীরের হারের মামলা তো পুরনো হয়ে গেছে। তাছাড়া জনসাধারণের মতে সেই মামলায় জিন দ্য লা মোৎ তো শিকার মাত্র। এসেই ও হীরের হারের ব্যাপারটার ওপর নতুন ভাষ্য দিতে লেগে গেলো, যাতে সমস্ত দোষ চাপানো হলো আমার ঘাড়ে। লোকেরা তাই সত্য বলে মেনে নিলো।

ওদিকে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে মিরাবুঁ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। সে জাতীয় পরিষদের সঙ্গে লেগে রইলো, রাজার সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলো। আমার মধ্যে

আশার সঞ্চার হলো—ও হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে আমাদের। অবশ্যই তার প্রচেষ্টা একেবারে স্বার্থহীন ছিলো না। সে চাইছিলো ক্ষমতায় বসতে, সম্পদ আহরণ করতেও। রাজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানোর পর রাজা যেন তাকে দশ লক্ষ লিভার দেন। রাজার কৃতজ্ঞতা তো তার উপরি পাওনা। মিষ্ট গলা আর ভাষার ওপর অসাধারণ দখল—এই দুই অস্ত্রে সে জাতীয় পরিষদকে দোলা দিতে লাগলো। অরলিঁস, মারাৎ, রোবস্‌পীয়ের, দাঁতো সে সব লক্ষ্য করতে লাগলো। তাদের মনে হলো, তাদের এতদিনের সযত্নে গড়ে তোলা বিক্ষোভকে মিরাবুঁ যেন নষ্ট করে দিচ্ছে।

মিরাবুঁ রাজাকে বললো,'চারজন শত্রু রয়েছে—কর, দেউলে অবস্থা, সৈন্যবাহিনী এবং শীত। এদের ঠিকমতো মোকাবিলা করবার জন্যে আমাদের তৈরি হতে হবে। এই মুহূর্তে গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে একদম উড়িয়ে দেওয়া চলে না।'

'গৃহযুদ্ধ! আমি তা হতে দিতে পারি না।'

'দেখুন মহামান্য, জনগণের বিক্ষোভের মোকাবিলার পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা-অস্ত্রটি খুবই নগণ্য। কে জিতবে, এতে আপনার কি কোন সন্দেহ রয়েছে?'

রাজা আমার দিকে তাকালেন।

'গৃহযুদ্ধে রাজা কখনই সম্মতি দেবেন না।' আমি ওকে জানাই।

'খুব ভালো কথা, তবুও বলবো—দুর্বল রাজা।' মিরাবুঁ চেঁচিয়ে উঠলো। 'এবং দুর্ভাগ্যবতী রানী। আপনার এই দ্বিধাগ্রস্ততাই আপনাদের দুর্যোগের সমুদ্রে এনে ফেলেছে। আমার উপদেশ যদি না শোনেন অথবা আমার প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়,আপনাদের কপালে আছে শ্মশানের শান্তি। আমি যদি বেঁচে যাই গর্বের সঙ্গে বলবো, "ওঁদের রক্ষার জন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম কিন্তু ওঁরা নিজেদের বাঁচাতে চাননি।" এই বলেই বিদায় নিলো সে।

চরমতম সত্য ছিলো তার কথায়। কি বোকা আমরা যে, সেটা মেনে নিতে পারিনি। 'গৃহযুদ্ধের সামিল কোনদিনই হতে পারবো না।

আমি।' রাজা বললেন।

আমিও যেন তা জানতাম। তবু আজ মনে হচ্ছে ওঁকে অন্যভাবে বোঝানো উচিত ছিলো আমার।

কোন কিছু ছেড়ে দেবার মানুষ মিরাবুঁ অবশ্যই নয়। আমার প্রতি আক্সেলের অনুরাগের কথাও তার অবিদিত ছিলো না। আমাদের পারী থেকে বের করিয়ে নেবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হলো ওদের মধ্যে। এটা মিরাবুঁর মনে ধরলো। সে আক্সেলকে বললো, অবিলম্বে মেইৎজে গিয়ে রাজবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ মারকুই দ্য বুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

আক্সেল মেইৎজে গেলো, ফিরেও এলো। কিন্তু খুব উৎসাহিত হয়ে নয়। বুলের অধীনস্থ রাজবাহিনীর সৈন্যরা দিন দিন ভরসা হারিয়ে ফেলছে। আমাদের উদ্যোগের অভাবই তার কারণ। কিছু করতে হলে চটপট করা দরকার। মিরাবুঁরও সেই অভিমত। 'আপনি ওঁদের পালানোর ব্যবস্থার ভার নিন।' মিরাবুঁ আক্সেলকে বললো। 'একজন সুইডিশ হিসেবে আপনি যা করতে পারবেন, একজন ফরাসীর পক্ষে তা অসম্ভব।

প্রথম পরিকল্পনাও মিরাবুঁ সমানে আঁকড়ে ধরে আছে। রাজাকে অনুরোধ করলো সাহসী হয়ে উঠতে, রাজপথে নেমে সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করতে, এমন আচরণ করতে যাতে সবাই ভাবে তিনি এখনও রাজাই রয়েছেন।

আমাদের বাঁচবার আশা ফিরে আসছে। প্রকৃত প্রেমিকের মতো আক্সেল আমাদের পলায়নের পরিকল্পনায় তৎপর, অন্যদিকে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মিরাবুঁরও তৎপরতার অন্ত নেই।

কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল। মিরাবুঁর হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতোই কানে বাজলো আমাদের। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত হলেও, আমাদের বিরোধীপক্ষের চক্রান্ত বলেই ধরে নিলাম। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও মিলিয়ে গেলো।

তুলেরির নৈমিত্তিক জীবনের আবর্তনে ফিরে এলাম। ঘরে বসেই

সময় কাটাই। বিগত দিনের ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারগুলো মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। ভাবি, আর একবার যদি সুযোগ পাই, একই ভুল দুবার করবো না।

ইস্টারের ছুটি এসে গেলো। ভাবলাম সাঁ-ক্লুদ গেলে কেমন হয়। রাজাকে বলাতে তিনি রাজি হলেন। কিন্তু জনতা যেতে দিলে তো? গোপনে সব ব্যবস্থা করলাম। পরিচারিকাদের বললাম সব ব্যবস্থা করতে, কিন্তু ওদের মধ্যে ছিলো নতুন একটি মুখ—মাদাম রোশেরু, সে-ও জানতে পারলো। গাড়িতে উঠে যেই রওনা হতে যাচ্ছি, জনতা এসে ঘিরে ধরলো আমাদের। এদের চেহারাও ভার্সাইয়ের সেই মিছিল-কারিনীদের মতো, অসভ্য, রীতিবিগর্হিত। 'এই যে, বুড়ো খোকা, পরিবার নিয়ে এখানেই থাকুন'। রাজার প্রতি মন্তব্য ছুঁড়লো ওরা।

লা ফায়েত এলেন নিজের বাহিনী নিয়ে। জনতাকে বললেন রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের যাবার জায়গা করে দিতে। কিন্তু ওরা শুনলো না। যারা পয়সা দিয়ে ওদের একাজে নিয়োগ করেছে, অন্যের আওয়াজ তাদের কানে ঢুকবে কেন? রাজা মুখ বাড়িয়ে ওদের কিছু বলতে গেলেন। 'মোটা শূয়োর,' বলে ওরা বিদ্রূপ করলো রাজাকে। আমার ক্রোধ বশ মানছিলো না। আমার সেই ক্রুদ্ধ আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের একজন মন্তব্য করলো—ওর দিকে তাকা। ওই বেশ্যা মাগীটার কথা শুনতে হবে আমাদের?'

রাজার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন লা ফায়েৎ। 'আপনি হুকুম দিন, ওদের ওপর গুলি চালাই।'

'আমি তা করতে দিতে পারি না। আমার জন্যে কারও এক বিন্দুও রক্তক্ষরণ হোক, আমি তা চাইনে। আমরা বরং প্রাসাদেই ফিরে যাচ্ছি।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুই বললেন, 'তুমি ধরে নিতে পারো, আজ থেকে এদের হাতে আমরা বন্দী।'

স্বামীর সঙ্গে সেই নরকে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'আমরা সত্যিই বন্দী। ওরা চায় আমরা যেন তুলেরি থেকে বেরোতে না পারি।'

আক্সেল যখন জানতে পারলো যে, আমাদের সাঁ-ক্লুদ যেতে দেওয়া হয়নি, খুবই মর্মাহত হলো সে। বুঝতে পারলো যে বিপদের অন্ত নেই। চটপট পারীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। দুজনে মিলে প্রকৃত অবস্থাটা লুইকে বোঝালাম। শুনে তিনিও সায় দিলেন যে, পালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ওদিকে আরতোঁ আর প্রিন্স দ্য কঁদে বিদেশে ঘুরে ঘুরে অন্যান্য রাজাদের সাহায্য ভিক্ষে করছিলো, যাতে ফ্রান্সে বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াই করে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। আমার ভাই লিওপোল্ড মার্সিকে জানালো: 'কঁৎ দ্য আরতোঁর দাদা আর আমার বোনের জন্যে কোন সহানুভূতি নেই। ওর প্রচারে যে ওঁদের জীবন সংশয় হতে পারে, সেদিকে তিনি নজর দিচ্ছেন না।'

মার্সি আমার ওপর জোর দিতে লাগলেন যেন পলায়নের প্রস্তাবে রাজাকে সম্মত করাই। বাইরে গিয়ে রাজা সৈন্যবাহিনী তৈরি করে রাজ্য উদ্ধার করবেন। লুইও এটা বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দেরি করে ফেলেছেন। এখন আর মিরাবু নেই যিনি ছিলেন এর জন্যে একমাত্র উপযুক্ত লোক।

আক্সেল বললো, পলায়নের ব্যবস্থার সব দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। সব থেকে আগে চাই এমন একটা গাড়ি যা পলায়নের পক্ষে উপযুক্ত।

লোকের নজরে পড়ছে বলে ও নানা ছদ্মবেশে তুলেরি আসতে লাগলো। যে গাড়ির ব্যবস্থা করতে ও তৎপর, সেটা খুবই বিলাসবহুল ব্যাপার হবে। নিজের সম্পত্তির খানিকটা বন্ধক দিয়ে আক্সেল টাকার ব্যবস্থা করলো। ওর পরিকল্পনা হলো খুবই সীমিত সংখ্যক লোক নিয়ে আমরা রওনা হবো। মাদাম তুরজেকে তো নিতেই হবে বাচ্চাদের

গভর্নেস হিসেবে, তিনি সাজবেন একজন রুশ মহিলা, নাম—মাদাম গু কর্ফ, সঙ্গে তাঁর বাচ্চারা, তাদের শিক্ষিকা, একজন উপদেষ্টা, তিন জন মহিলা পরিচারিকা, তাদের একজন হবেন এলিজাবেথ। আমি শিক্ষিকা, নাম—মাদাম রোশ। আক্সেল, মাদাম কর্ফের নামে একটা পাসপোর্টও যোগাড় করে ফেলেছে।

চটপট পেরিয়ে যাচ্ছে এক একটি দিন। আমাদের মধ্যেও উত্তেজনা। এমনকি লুইও এই ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে আমাদের পরিকল্পনায়। পারী পেরনোই সবচেয়ে কঠিন। আক্সেল নিজেই গাড়ি চালাবেন। পালানোটা জানাজানি হবার আগেই আমাদের পারী ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের সঙ্গে প্রোভাঁসও যাবে। সে বললো, অমন শৌখিন গাড়ি লোকের দৃষ্টি কাড়বেই। কিন্তু আক্সেল বললো দূর পাল্লার গাড়ি মজবুত, আরামদায়ক না হলে চলবে কি করে। ঝাঁকানিতে রানীর কষ্ট হবে। প্রোভাঁস বললো, সে এবং তার স্ত্রীর জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা সে-ই করবে। সবচেয়ে ভাঙাচোরা একটি গাড়ির ব্যবস্থা করলো সে। এর মধ্যে লুই একটা শর্ত জুড়ে দিলেন। আক্সেল ঠিক করেছিলো যে, ফ্রান্সের সীমানা অবধি ও-ই চালিয়ে নিয়ে যাবে। রাজা বললেন, প্রথম বিশ্রামস্থান অবধিই আক্সেল গাড়ি চালাবে। সেটা হলো বণ্ডি। আক্সেলের এটা পছন্দ নয় কারণ বণ্ডিতে আমাদের ছেড়ে দিলে অবস্থা কি দাঁড়াবে। লুই কিন্তু বেঁকে বসলেন। আমাকে আর আক্সেলকে সেই ব্যবস্থা মেনে নিতেই হলো। পালাবার দিন স্থির হলো ৯ই জুন।

গুছিয়ে নেবার কাজে ব্যস্ত হলাম। সঙ্গে মাদাম কঁপাঁ। আক্সেল ব্যবস্থা করছে বলেই সেই বিলাসবহুল গাড়িটা সম্পর্কে একটা গর্বের ভাব ছিলো আমার মধ্যে। আরও পরে বুঝেছিলাম, আমাদের মানসিকতায় রাজকীয় রীতি কেমন শিকড় গেড়ে বসেছে। রাজকীয় ভাবেই যেন পালাতে হবে আমাদের। গাড়িতে আমরা লোক হলাম ছজন। নিজে কখনও পোশাক পরিনি বলেই আমার সঙ্গে আরও দুজন মহিলা চাই, যারা আসবে পেছনের জুড়ে দেওয়া কামরায়। তার ওপর চাকর

ও সহকারী চাই। আক্সেল আর গাড়ির চালক তো রয়েছেই। সব মিলে বার জনেরও বেশি। নতুন বাক্সে আমাদের পোশাক নিতে হবে। সুতরাং গাড়ির গতিবেগ আরও কমে যেতে বাধ্য।

পোশাক গোছানোর জন্যে নতুন মহিলা মাদাম রোশেরুকে একটুও বিশ্বাস হয় না। গতবার সাঁ-ক্লুদে যাবার ব্যাপারটা ওই ভেস্তে দিয়েছে। কিন্তু ওকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। তাই আক্সেলকে জানালাম—ন তারিখে যাওয়া হবে না। মাদাম রোশেরু দেখেছে আমার গোছগাছ, ন তারিখের কথাটাও হয়তো আড়াল থেকে শুনে নিয়েছে। ওর চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যেই যাবার দিন ঠিক করা হলো উনিশে, যদিও আক্সেল এতে ভারি অস্বস্তি বোধ করলো।

তবু বিপ্লবীরা বোধ হয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলো মাদাম রোশেরুর খবরের ওপর ভিত্তি করে। আমরা যাতে কোনভাবেই পারী ছেড়ে পালাতে না পারি, সেজন্যে মারাৎ, পারীর নাগরিকগণকে সতর্ক করে, প্রচার-পত্র বের করলেন। ওদিকে মাদাম তুরজে খবর আনলেন যে, বিশ তারিখে মাদাম রোশেরু একদিনের ছুটি নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করলাম, উনিশের বদলে কুড়ি তারিখে বেরোতে হবে আমাদের। আক্সেলকে এই মর্মে খবর পাঠালাম। বার বার এভাবে তারিখ পরিবর্তনে ওর অস্বস্তি বেড়ে গেলেও করার কিছুই ছিলো না।

আমার কেশ-শিল্পী লিওনার্দকে আমার গয়নাগাঁটি দিয়ে ব্রুসেলসে পাঠানো স্থির করলাম। ভদ্রলোক একান্ত বিশ্বস্ত। লিওনার্দ সেসব নিয়ে ব্রুসেলসে রওনা হয়ে গেলো। আমি অস্থিরভাবে বিশ তারিখের অপেক্ষায় রইলাম।

নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেলো। সুন্দর, উজ্জ্বল দিন। গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হলো দিনটি। রাতের খাবার সময় উপস্থিত। ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করলাম। তারপর দোতালায় মেয়ের ঘরে গেলাম। ওখানে মাদাম ব্রুনিয়ারকে বললাম, চটপট মাদাম রয়েলকে পোশাক পরিয়ে দিতে, তারপর কুমার ও কুমারের পরিচারিকা মাদাম সুভিলকে নিয়ে পঁৎ

রয়েলে চলে যেতে। সেখানে ওদের জন্যে গাড়ি থাকবে, তখনই পারী ত্যাগ করে ওরা যেন ক্লেয়েতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে।

মাদাম দ্য তুরজে কুমারের হাত ধরলো এবং আমি রয়েলের হাত ধরে আমার দেখানো অরক্ষিত পথে ক্যুর দ্য প্রিন্সেসে এলাম। কোচ-ম্যানের পোশাকে আক্সেল ওখানে অপেক্ষা করছিলো। বাচ্চাদের চট-পট গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আমার দিকে বিদায়-দৃষ্টি ফেলে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলো।

প্রাসাদে ফিরে এসে দেখি প্রোভাঁস ও তার স্ত্রী বিদায় নিতে প্রস্তুত। আলিঙ্গন করে ওদের আমার শুভেচ্ছা জানালাম। রাজা তখন লা ফায়েতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। রাত তখন সওয়া এগারটা।

মাদাম থিবো ঘরে এলো। ধূসর একটা গাউন পরিয়ে দিলো আমাকে, ওপরে কালো চাদর। মাথায় বড় একটি টুপি, আমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছিলো।

মাদাম থিবো আস্তে আস্তে দরজা খুললো, বাইরে একজন পাহারা-দার। দেখেই শিহরণ বয়ে গেলো আমার শিরায় শিরায়, আবার বোধ হয় ধরা পড়ে গেলাম। মাদাম থিবো আমার কানে কানে বললো পাহারাদার ওদিকে মুখ ঘোরালেই আমি যেন চটপট বারান্দা পেরিয়ে অপরদিকের অরক্ষিত ঘরে চলে যাই। প্রাণপণে সে ঝুঁকিও নিতে হলো, সফলও হলাম। সে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলো অনুগত একজন রক্ষী, যে আমাকে রু দ্য ইকেলে নিয়ে যাবে। 'মাদাম', সে চুপিচুপি বললো, 'আপনাকে আমার হাত ধরতে হবে।'

তাই করলাম। ক্যুর দ্য প্রিন্সেস সে ভাবেই পেরোলাম। কেউ আমাদের লক্ষ্য করলো না।

আমার সঙ্গী ইচ্ছে করেই একটু ঘোরাপথ নিয়েছিলো যাতে হঠাৎ চেনাশোনা কারও নজরে পড়ে না যাই।

অচেনা অলিগলিতে প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে সবশেষে আমরা রু দ্য ইকেলে পৌঁছলাম। ওরা সবাই অধীর আগ্রহে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। পায়চারি করছে আক্সেল, এলিজাবেথের মুখ প্রেতের মতো

বিবর্ণ, রাজারও সেই স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আর নেই, আমার মেয়ে তার ভাইকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। আক্সেল আমাকে মুহূর্তে গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন।

আমাদের একঘণ্টার মতো দেরি হয়ে গেছে। ওই গাড়িতে রু দ্য ক্লিচিতে এলাম আমরা। সেখানেই শৌখিন গাড়িটা রাখা হয়েছিলো। আক্সেল জেনে নিলো যে, সময়মতো সেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুশি হয়েই আক্সেল আবার গাড়ি চালিয়ে দিলো।

ব্যারিয়ারে পৌঁছে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় গাড়িটাকে দেখা গেলো না। আক্সেল চিন্তিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই রাত অনেকটা গড়িয়ে গেছে। গাড়িটাকে খুঁজে বের করতে আধঘণ্টার মতো সময় লেগে গেলো আক্সেলের। আমাদের এত দেরি দেখে গাড়ির চালক ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিলো। এখন রাত দুটো। গরমকাল। আর একঘণ্টার মধ্যেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। এতক্ষণে আরও অনেক দূরে সরে পড়া উচিত ছিলো আমাদের।

এক গাড়ি থেকে আরেক গাড়িতে নিজেদের সরিয়ে নিলাম। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই বন্ডি পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে আক্সেল বিদায় নেবে।

'বিদায়, মাদাম দ্য কর্ফ।' আক্সেল বললো। তাকালো আমার দিকে। রাজা আবেগমিশ্রিত গলায় জানালেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের জন্যে আক্সেল যা করেছেন, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে দেনা শোধ হবার নয়। আক্সেল মাথা নত করে জানালো, এটা তার কর্তব্য। আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'ভুলে যাবেন না রাস্তায় আপনার পরিচয় হলো মাদাম রোশার, আপনি বাচ্চাদের শিক্ষিকা।' একথা বলে বিদায় নিলো।

বাচ্চারা ঘুমুচ্ছিলো, রাজাও। ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত কোন কিছুতেই হয় না। এলিজাবেথ, মাদাম দ্য তুরজে আর আমি চোখ বন্ধ করে রয়েছি, কারো চোখেই ঘুম নেই।

রাজকুমার জেগে বললো ওর খিদে পেয়েছে। আমি ওকে বললাম আমরা বনভোজন করবো, গাড়ির মধ্যেই। রাজপরিবারের উপযুক্ত প্রচুর খাবার আক্সেল সঙ্গে তুলে দিয়েছে। বাইরে তখন সোনালী

সকাল। ভয় হচ্ছে আমি কি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবো?

বণ্ডির পর ক্লেয়ে, তারপর লা ফের্তি, তারপর পৌঁছবো শালোঁ-সুর মার্লেতে। ওখানে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন আমার পুরনো বন্ধুর ভাইপো যুবক দ্যু ভ্য চোয়াসু, শহর ছাড়ালেই সাক্ষাৎ পাবো বুলের, যিনি আমাদের মংমিদি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। আক্সেল থাকবে ওখানে।

…ক্রমে পঁৎ-স্ত্য-সোমভেলের কাছাকাছি এসে গেছি। এই শহরেই দ্যু ভ্য চোয়াসু অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে। মনে হচ্ছে যাত্রার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।

গাড়ির ভেতরে প্রচণ্ড গরম। ছেলে জানালো যে, সে বাইরে গিয়ে ফুল তুলবে। রাজা জেগে উঠে বললেন রাজকুমারের ইচ্ছে পূরণ করাই ভালো। আর এখানে কিছুক্ষণের জন্যে থামলে সকলের পক্ষেই তা স্বাস্থ্যকর হবে।

সুতরাং বিরতি। আমি ছটফট করছিলাম কিন্তু রাজার ইচ্ছে আরও একটু খেলুক। সেই সময়েই পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলাম। গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় অশ্বারোহী বললেন, 'শিগগির করুন। আপনাদের পরিকল্পনা সবার জানা হয়ে গেছে। আপনাদের ধরবার জন্যে লোক আসছে।' লোকটা বেরিয়ে গেলো। তক্ষুনি সবাইকে গাড়িতে তুলে যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে চালাবার হুকুম দিলেন রাজা।

পঁৎ-স্ত্য-সোমভেলেতে চোয়াসুর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। গাড়ির ঘোড়া বদলের সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক এলো আমাদের কাছে। তার কাছ থেকে শুনতে পেলাম, আমাদের দেরি দেখে চোয়াসু ভেবেছেন আমরা পারী থেকে বেরোতে পারিনি। তাই তিনি চলে গেছেন।

ভয় পেলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের ছাড়েনি। রাস্তায় নানা কারণে অনাবশ্যক দেরি করা উচিত হয়নি। বললাম, 'কি করা যাবে। একা একাই চলতে হবে আমাদের, সাঁতে-মেনেহুদ পৌঁছলে সাহায্য অবশ্যই মিলবে।' গাড়ি আবার চলতে লাগলো।

সাঁতে-মেনেহুদেও আশার রেশটুকু চোখে পড়লো না। সারা শহর সৈন্যে গিজগিজ করছিলো। হঠাৎ কি হতে পারে তা নিয়ে শহরবাসীর

জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। এখানে এসে বিপদ ঘনিয়ে উঠলো আমাদের। এই শহরের পোষ্টমাষ্টারের ছেলে জ্যঁা ব্যাপ্তিস্ত ক্রুয়েৎ একজন কট্টর বিপ্লবী। আমাদের দিকে তাকিয়ে চিনতে না পারলেও তার চোখে মুখে সন্দেহের অন্ত ছিলো না। ঘোড়া বদল করে আমরা তখন ভারেনেসের দিকে রওনা হয়েছি।

ভারেনেস পৌঁছলাম রাত দশটায়। হঠাৎ আমাদের গাড়ি থামিয়ে কে একজন বললো, 'পাসপোর্ট দেখাও।' মাদাম তুরজে আক্সেলের দেওয়া সকল পাসপোর্টগুলো লোকটার হাতে তুলে দিলো। তখন বুঝতে পারিনি যে, এই লোকটাই হলো সেই জ্যঁা ব্যপ্তিস্ত ক্রুয়েৎ। লোকটা উত্তেজনায় কাঁপছিলো।

'পাসপোর্টগুলো গোলমেলে।' লোকটা আমার দিকে তাকালো।

'সব ঠিক আছে।' মাদাম তুরজের গলায় প্রতিবাদ। 'দুঃখিত, আপনাদের শহরের সলিসিটরের কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। মঁসিয়ে সসে-এর কাছে।' গলা বাড়িয়ে দেখলাম অনেকগুলো যুবক আমাদের গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে।

গাড়িটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। রাজার চোখে উৎকণ্ঠার কোন চিহ্ন নেই। বললেন, 'ব্যাপারটা কিছুই না। শুধু রীতিমাফিক পাসপোর্ট পরীক্ষা।'

মঁসিয়ে সসে আবার ভারেনেসের মেয়রও। সাদাসিদে ভালোমানুষ। একবার পাসপোর্টগুলোর ওপর নজর দিয়েই বললেন, সব ঠিক আছে। আমাদের চলে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ক্রুয়েৎ উগ্রপন্থী বিপ্লবী। চিৎকার করে বললো, 'এঁরা হলেন ফ্রান্সের রাজা আর রানী। আপনি কি এঁদের পালাবার সুযোগ দিয়ে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান?'

'আজ রাতে ভারেনেস ছাড়া হবে না আপনাদের।' মঁসিয়ে সসে আমাদের জানালেন। 'আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।'

নিরাশায় ভেঙে পড়লাম। জনতার ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ফিরে আসছে সেই আতঙ্কময় অক্টোবরের রাত।

সসৈ পরিবার অবশ্যই আতিথ্যের ত্রুটি করলো না। যতদূর সম্ভব ভালো খাবারদাবারের ব্যবস্থা করলেন আমাদের জন্যে। অবাক হয়ে দেখলাম সেই অবস্থাতেও রাজার ক্ষিধের বিন্দুমাত্রও অদলবদল হলো না। সেই মুহূর্তে দু দ্য চোয়াস্যু এলেন। বললেন তাঁর সৈন্যসংখ্যা সীমিত। লড়াই না করে ভারেনেস থেকে যাওয়া সম্ভব হবে না। ঘরে ঢোকার সময়েই কয়েকজনকে আহত করতে হয়েছে তাঁকে। বুলের কাছে খবর পাঠিয়েছেন তিনি। তিনিও এসে পড়বেন।

শুনে রাজা মাথা নাড়লেন। 'আমি তো আগেই বলেছি, আমার জন্যে প্রজাদের রক্তক্ষরণ হতে দেবো না। যুদ্ধ করে এখান থেকে বেরোতে হলে অনেক মানুষই মারা পড়বে। অথচ বিনাবাধায় ওরা আমাদের ছাড়বে না।'

'ওরা ক্ষ্যাপার দল।' চোয়াস্যু বললেন। 'আমাদের অস্ত্রের কাছে ওদের হাতিয়ার তুচ্ছ।'

'কিন্তু লোকজন তো মরবেই। এমনও তো হতে পারে যে, রানী এবং রাজকুমার আঘাত পাবেন।'

'বাচ্চাদের রক্ষা করতে পারবো আমরা।' আমি বললাম। 'এই সুযোগ নেওয়া উচিত আমাদের।'

'না, না।' লুই বললেন। 'আমাদের আঘাত না লাগলেও কিছু লোক তো নিশ্চয়ই মরবে। বুলের জন্যে বরং অপেক্ষা করা ভালো। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে এলেই তা দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। আমরা বিনাবাধায় ভারেনেস ছাড়বো।

'এমন তো হতে পারে যে বুলে এসে পড়ার আগেই বিপ্লবীরা আপনাদের পারীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'সেই সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি আমার জন্যে রক্তক্ষয় ঘটতে দেবো না।'

সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। অথচ লুই অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। লোকটা কি সত্যিই মানুষ, না অন্য কিছু! আমাদের এমন কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে ওঁর চোখে ঘুম নামে কি করে? তিনি রক্তপাত

ঘটাতে চান না···প্রজাদের ক্ষতি তাঁর সহ্য হয় না অথচ সেই প্রজারাই বাইরে বন্যজন্তুর মতো হুংকার ছাড়ছে।

ভোর হতে না হতেই দরজায় ধাক্কা পড়লো। দুজন লোক এসে ঘরে ঢুকলো। একজন আমার চেনা, তুলেরিতে আমাদের রক্ষী ছিলো। নাম রোমিয়ুফ অন্য জনের নাম বেয়োঁ। ওরা জানালো যে, জাতীয় পরিষদের হুকুমনামা নিয়ে ওরা এসেছে। রাজার হাতে হুকুমনামাটি তুলে দিলো। ওতে আমাদের সকল অধিকার হরণ করা হলো বলে জানানো হয়েছে, আমাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি ওটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেললাম।

'মার্কুই দ্য বুলে ভারেনেসের দিকে রওনা হয়েছেন। আমাদের যদি জোর করে পারী নিয়ে যেতে চাও, রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।' রাজা শান্ত গলায় বললেন।

'মঁসিয়ে লা ফায়েতের আদেশ অনুযায়ী আপনাদের পারীতেই ফিরতে হবে।'

'রাজার আদেশ মানবে না তোমরা ?' আমি বলে উঠলাম।

'আমরা জাতীয় পরিষদের আদেশকেই শিরোধার্য করেছি, মাদাম।'

'আমি রক্তপাত চাই না।' রাজা আবার বললেন। 'প্রজাদের সঙ্গে যুদ্ধ আমি চাই না। মাকু ই দ্য বুলে এলে আমি আমার গন্তব্যস্থলে চলে যাবো আর তারপর বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।'

'বুলে আসার আগেই আমাদের পারীর দিকে রওনা হতে হবে।' বেয়োঁ বলে উঠলো।

'আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত।' বললাম। 'তার ওপর আমার ছেলেমেয়ের কথাও ভাবতে হবে।'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলো বেয়োঁ। জনতার সঙ্গে পরামর্শ করে একটু পরেই ফিরে এসে বললো, 'এক্ষুনি পারী যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে আপনাদের।'

'কিন্তু বাচ্চারা যে ঘুমোচ্ছে।'

'ওদের জাগিয়ে তুলুন।' বেয়োঁর গলায় কোন শ্রদ্ধার আভাস নেই।

ঠিক হলো, খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা হবো আমরা। বেয়ে৺াকেও সম্মত হতে হলো ওতে। কিন্তু নানা অছিলায় আরও খানিকক্ষণ দেরি করেও কোন ফল হলো না। বুলের দর্শন নেই। ভারেনেস থেকে পারীর দিকেই রওনা হতে বাধ্য করা হলো আমাদের।

…পারী ফিরতে সময় লাগলো তিনদিন। কেমন দিন সেগুলো? প্রচণ্ড গরম, স্নান অথবা পোশাক বদলাবার সুযোগ দেওয়া হলো না আমাদের। চারপাশের লোকেরা সমস্তক্ষণ গালিগালাজ দিতে থাকলো। ওদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর লেশমাত্রও দেখিনি। ওদের অশ্লীল অপমানের সবচেয়ে বড় শিকার হলাম আমি।

আমি আর বাঁচতে চাই নে। এরা আমাকে হত্যা করতে চায় করুক। শুধু আমার ছেলেমেয়েকে সাধারণভাবে জীবন যাপনের সুযোগে দিক।

জাতীয় পরিষদের দুজন লোক পিতিওঁ আর বারনাভেকে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে নিযুক্ত করলো ওরা। লোক হিসেবে ওরা তেমন খারাপ নয়। আমাদের জানানো হলো যে, আমরা হলাম নেহাত সাধারণ নাগরিক, কোন বিশেষ অধিকার আমাদের নেই। লুই গম্ভীর ভাবে শুনলেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না। এলিজাবেথ ও মাদাম দ্য তুরজে প্রায় ভেঙে পড়েছে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিলাম। সব কিছু গ্রহণ করলাম চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে। জনতা এতে খুশি হলো না, কিন্তু আমাকে অসম্মান করা কমালো। গাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখার পক্ষপাতী পিতিওঁ আর বারনাভে কারণ জনতা ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠছে। জানালার কাছে এসে ওরা গালিগালাজ ছুঁড়তে লাগলো। 'বেশ্যা', একজন চিৎকার করলো। তবু জানালার পর্দা নামালাম না। আমাদের খাবার এলো। জনতা দাবি তুললো তাদের চোখের সামনে খেতে হবে। এলিজাবেথ তো শিউরে উঠলো। আমি ধীরস্থির। 'নিজেদের সম্মান বাঁচাতে হবে আমাদের।' 'মাদাম, ওরা গাড়িটাকে ভেঙে ফেলবে।' পিতিওঁর অনুরোধ, জানালা বন্ধ করার জন্যে। তবু নিজেকে শক্ত রেখে সব কিছু সহ্য করে গেলাম।

তুলেরিতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন,

আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ নোংরা। নিজেদের পরিত্যক্ত ঘরগুলোতে আবার ঢুকতে হলো। আগের অবস্থা থেকে আরও কয়েক ধাপ নীচে নেমে গেছি আমরা। ফ্রান্সে এখন আর রাজা-রানী নেই। মাথার টুপি খুলে চুলগুলো ঝাড়লাম। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ দুটো লাল, সারামুখ রাস্তার ধুলোয় ধূসর, পরনের পোশাক ছেঁড়া। এতে অবাক হইনি। যে সোনালী চুলের জন্যে আমার এত গর্ব, এত প্রশংসা, এত যত্ন, দেখলাম তার সব কটি সাদা হয়ে গেছে।

চোদ্দ

তুলেরিতে পুনর্বাসনের প্রথম কটা দিন কেমন আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটলো। ঘুম থেকে জাগলে মনে হতো আমার শরীরে কারও নোংরা হাত লেগেছে, আমার মুখে আর কারও নোংরা মুখের গন্ধ। পারীতে ফেরার সময় যে ভয়ঙ্করতার ছবি দেখেছিলাম এখন যেন তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ত্রাসের মধ্যে দিন কাটছে।

যেদিকেই তাকাই প্রহরীর সারি। এখন আমরা প্রকৃতই বন্দী। আর যাতে পালাতে না পারি তার জন্যে এই সতর্কতা। খবর পেলাম, প্রোভাঁস ও তার স্ত্রী নির্বিঘ্নে সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে। আরও শুনলাম, ভারেনেস থেকে রওনা হবার আধঘণ্টা পরেই বুলে তার সৈন্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। মুক্তি আর আমাদের মধ্যে মাত্র ত্রিশ মিনিটের ব্যবধান। সবই বিধিলিপি!

অস্থিরতার অন্ত ছিলো না। কি করে আবার বাঁচার পথে ফেরা যায়। তার জন্যে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। বারনাভেকে এমন ভাব দেখালাম যেন সে আমার প্রকৃত বন্ধু। ওর সাহায্য আর সহযোগিতা চাইলাম। সে এবং তার বন্ধুরা আমাকে জানালো—যদি আমার দেওররা ফ্রান্সে ফিরে আসে এবং আমার ভাই অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড যদি ফ্রান্সের

বর্তমান শাসনতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানায়, ওরা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। নিজেদের মুক্ত করতে পারবো, এই সম্ভাবনায় ভাইয়ের কাছে ওদের মারফত একটা চিঠিও পাঠালাম।

ওদিকে আক্সেলের কোন খবর নেই। শুনেছি ও নাকি এখন ভিয়েনায়। লিওপোল্ডকে অনুরোধ জানিয়েছে, সে যেন একদল সৈন্য ফ্রান্সে পাঠিয়ে বিপ্লবীদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। কঁৎ দ্য এস্তারহেজি ভিয়েনায় যাচ্ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে আক্সেলের কাছে একটি আংটি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। তার মধ্যে খোদাই করে লেখা হলো, 'হতভাগিনী কোন একজনের কাছ থেকে'। এস্তারহেজিকে বলালাম, 'ওর কাছে যদি চিঠি দেন, জানাবেন যে, দূরত্ব কখনও দুটি হৃদয়ের সম্পর্ককে আলগা করতে পারে না। এই আংটিটা ওর আঙুলের মাপে তৈরি করা হয়েছে। ওকে বলবেন, আমার জন্যে যেন এটা আঙুলে ধারণ করে। পাঠাবার আগে আমি এটা দুদিন পরেছি।'

মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছি নে। আক্সেল যদি আমার আংটি পেয়ে আবার বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার ওকে জানালাম—আমার জন্যে যেন কোন ঝুঁকি না নেয়। এদিকে ঠিক যেন বন্দীর মতো কারাবাস করছি। প্রাসাদের বাইরের দরজা রাতে তালা লাগানো হচ্ছে। নিজের কক্ষের দরজা খোলা রেখে শুতে হচ্ছে। বারনাভের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখে গেলাম।

আক্সেলের খবর পেলাম। ও পারীতে আসতে চায়। তাড়াতাড়ি জানালাম, 'এতে আমাদের সামান্য সুখ যা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাও ঘুচে যাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একান্তভাবে উৎসুক হয়েও আমি একথা তোমায় জানাচ্ছি।

সারাদিন ঘরে বসেই কাটিয়ে দিই। বাইরে যাবার বিন্দুমাত্র অভিলাষও আমার মধ্যে নেই।

ছেলেমেয়েদুটি সবসময় আমার কাছাকাছি থাকে। ওরাই এখন আমার একমাত্র আনন্দ, বেঁচে থাকার একমাত্র উপলক্ষ্য।

জাতীয় পরিষদ ওদের গঠনতন্ত্রের একটা খসড়া তৈরি করে রাজার

কাছে তা উপস্থাপিত করলো। ওটা গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর ছিলো না। রাজা তো বস্তুতঃ ওদের হাতে বন্দী, ওটা গ্রহণ ছাড়া ওঁর কাছে তো আর কোন বিকল্প নেই।

'এটা তো আমাদের নৈতিক মৃত্যুর সনদ,' আমি মন্তব্য করলাম। 'শারীরিক মৃত্যুর থেকেও জঘন্য। সেটা অন্তত আমাদের এসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতো।'

রাজা সায় দিলেন। তিনি তো জানেন এটা গ্রহণ করার অর্থই হলো পায়ের তলায় আর কোন মাটি থাকবে না।

পরিষদের বৈঠকেও রাজাকে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা হলো। দেখলাম ওঁর বক্তৃতার সময় কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো না। তুলেরিতে ফিরে এসে ক্লান্তিতে আর হতাশায় তিনি কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে সমবেদনা জানাবার সময়ও ভাবছিলাম, উনি যদি সময় মতো দৃঢ়তা আর সাহস দেখাতে পারতেন, এই দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হতো না আমাদের। ওঁর দয়া, প্রজাদের জন্যে ওঁর অতিরিক্ত ভাবালুতা—সব দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে।

গঠনতন্ত্রে রাজার সম্মতি অনেক পরিবর্তনের সূচনা করলো। তুলেরিতে আমাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে যে কঠোর রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছিলো, তা তুলে নেওয়া হলো। আমার কক্ষের বাইরে আর পাহারাদার নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করে শান্তিতে শুতে পারছি। আমরা বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছি, তার বিরুদ্ধে কোন জিগির তুলিনি। বাইরে বেরোবার সময় 'রাজার জয় হোক,' 'রানীর জয় হোক,' এমন আওয়াজও কানে এসেছে।

তখন, ফেব্রুয়ারি মাস, কঠিন শীতের প্রকোপে পড়েছি। নীচের-তলার আমার শোবার ঘরে একা শুয়েছি, হঠাৎ যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছি। ভয়ে সারাশরীরে কাঁপুনি শুরু হলো আমার। ভয়ঙ্কর হিংস্র কয়েকটা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

…আমার ঘরের দরজা খুলে গেলো। আমি যেন জেগে জেগে স্বপ্ন

দেখছি। যা দেখছি তাতে বিশ্বাস ন্যস্ত করা শক্ত।

ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ওকে চিনতে একমুহূর্তের বেশি সময় লাগলো না আমার। আমার ভেতরের রূপান্তরও সমান অবিশ্বাস্য। ভয়ের স্থান নিলো রোমাঞ্চ, কাঁপুনির বদলে যা অনুভব করলাম তা হলো অসাধারণ পুলকের আস্বাদন, জীবনে আর কখনও এমন অপূর্ব রসের উপলব্ধি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

'আক্সেল! না, এটা সম্ভব হতে পারে না!'

'তোমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না?' সহাস্য প্রশ্ন।

'তা বলে এখানে আসা! এর চেয়ে বিপদ আর কিছু নেই। তুমি এক্ষুনি ফিরে যাও, লক্ষিটি!'

'চমৎকার অভ্যর্থনা!' সে হেসে উঠলো। এমন ভাবে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো যেন ফিরে যাবার ইচ্ছে ওর আদৌ নেই।

এমন ভাবে নিজেকে সমর্পন করলাম যে, কিসের জন্যে তার উপস্থিতি, কি করে সে এলো—এসব ভাবনা যেন একান্তই অবান্তর। কেমন মুহ্যমান হয়ে গেছি। চরমতম নৈরাশ্য থেকে সুখের স্বর্ণচূড়ায় উত্তরণ যেন অলীক কল্পনামাত্র। একথা জানালাম ওকে। কাঁদলাম, হাসলাম, আরও নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করলাম পরস্পরের অস্তিত্ব, সারা পৃথিবীর পুঞ্জীভূত দুঃখ আর ত্রাসের রাজত্ব যেন রেণু রেণু হয়ে আমাদের যুগল অস্তিত্বের পায়ের তলায় ঝরে পড়লো। রইলো শুধু আমাদের প্রেম—যা মুহূর্তকে জয় করে নিয়ে তাকেই মহিমায় স্রষ্টার সমান করে তোলে।

তারপর একটু একটু করে সবই শুনতে পেলাম। সেই যে আক্সেল লিখেছিলো, 'শুধু তোমার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।' সে কথা একেবারে অভ্রান্ত।

জাল একটা পাসপোর্ট বানিয়ে তার ওপর সুইডেনের রাজার সই নকল করে বসিয়েছে সে। তার অর্থ হলো—এই পাসপোর্টের অধিকারী রাজার প্রতিভূ হয়ে যাচ্ছে লিসবনে। ওটার জোরে পারীতে ঢুকতে তেমন অসুবিধে হয়নি ওর।

'সন্ধ্যা নামতেই প্রাসাদে ঢুকেছি,' আক্সেল বললো, 'তোমার ঘরের

একটা চাবি তো ছিলোই আমার কাছে, কোন পাহারাদার নেই দেখে চট করে ঘরে ঢুকে পড়েছি।'

'ওরা তো জানে আমাদের পালানোর পেছনে তোমার হাত ছিলো। এটা নিছক পাগলামি।' মুখে বললেও আমি জানি ওকে এমন করে কাছে পাওয়ার চেয়ে মহৎ প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না আমার কাছে।

সে রাত আর পরের সারাটা দিন আক্সেল আমার সঙ্গে রইলো। সেদিন সন্ধ্যায় লুইকে ডেকে পাঠালাম আমার ঘরে। উনি আসতেই আক্সেল ওঁর কাছে পালানোর আর একটা প্রস্তাব পেশ করলো। 'আগের বার থেকে অনেক শিখেছি আমরা, এবার আমরা সফল হবো।'

'অসম্ভব।' লুই মাথা নাড়লেন।

'চেষ্টা করে দেখাই যাক না।' আমি বললাম।

'আমরা মন খুলে কথা বলতে পারি।' লুইয়ের চোখে কঠিন ইচ্ছের ছায়া পড়লো। 'লোকে বলে আমি দুর্বল, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি না। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে অন্যেরা কেমন করে তার মোকাবিলা করতো আমার জানা নেই। পালাবার আসল মুহূর্তটি আমার ভুলে ফসকে গেছে। তারপর থেকে আর কোন সুযোগ আসেনি। আজ আমি সবারই পরিত্যক্ত।'

'কেবল কঁৎ দ্য ফের্সেন তার ব্যতিক্রম।' আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'সত্যি।' তাঁর মুখে ম্লান হাসির চকিত চমক। 'আমাদের জন্যে আপনি যা করেছেন, তার তুলনা মেলে না। কিন্তু এখন এই প্রাসাদের চারপাশে জাতীয় পাহারাদারদের সতর্ক প্রহরা। পালাবার চেষ্টা নেহাত বাতুলতা। আর একটা প্রচেষ্টার অর্থই হলো নিজেদের অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তোলা।'

রাজা ওকে আসল কারণটাও জানালেন। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমার চরম নৈরাশ্যের মধ্যে আক্সেলের মন্তব্য: 'রাজা সত্যিই মহৎ প্রাণের মানুষ।' কিন্তু শত্রুদের মোকাবিলার মুহূর্তে মহত্বের কি কানাকড়িও দাম আছে?

তবু আক্সেলের ধারণা সুইডেনের রাজা গুস্তাভের সহায়তায় আমা-

দের মুক্ত করতে সক্ষম হবে সে। তক্ষুনি বিদায় নিয়ে দেশের দিকে রওনা হতে উৎসুক হয়ে উঠলো ও। ওকে বিদায় দিতেই হলো। তবু বেঁচে থাকার জন্যে খানিকটা প্রাণশক্তি আমার মধ্যে দিয়ে গেলো সে।

আরও যে কত দুর্ভাগ্যই লেখা রয়েছে আমাদের ললাটে! ওর দেশে ফেরার সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে রাজা গুস্তাভের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছলো। মুক্তির আর একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেলো আমাদের চোখের সামনে।

শুধু অস্ট্রিয়া আর প্রুশিয়ার ওপর আমাদের যা কিছু ভরসা এখন।

আমার ভাই লিওপোল্ডের মৃত্যু হয়েছে। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে এখন ওর ছেলে ফ্রান্সিস। ওর বয়স মাত্র চব্বিশ, বলতে গেলে আমার সঙ্গে কোন পরিচয়ই ওর নেই। আমার অবস্থায় ওর দিক থেকে কোন সহানুভূতির নজীর দেখা গেলো না। ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সম্পর্ক একটুও ভালো ছিলো না। লুইকে বাধ্য করা হলো অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার। আমার এতে অবশ্যই তেমন কিছু আসে যায় না।

ওদিকে রাজাকে নিগৃহীত করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে লাগলো। দুটো সনদে ওঁর সম্মতি দেবার জন্যে চাপ দেওয়া হলো ওঁর ওপর। প্রথমটি—যাবতীয় পাদরিদের ফরাসী দেশ থেকে নির্বাসিত করার আইন, দ্বিতীয়টি—প্যারীর বাইরে বিশহাজার লোকের জন্যে একটি শিবিরের ব্যবস্থা করার। লুই হয়তো সম্মত দিতেন কিন্তু আমি বললাম দুটি প্রস্তাবের ওপরই ভেটো প্রয়োগ করতে। এতে বিপ্লবীরা আমাদের ওপর আরও ক্ষেপে গেলো। আমার নতুন নামকরণ হলো 'মাদাম ভেটো।' ওদের মনে পড়ে গেলো যে, আমি হলাম অস্ট্রিয়ার মহিলা আর অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এখন যুদ্ধ চলছে ফ্রান্সের। বিপ্লবী নেতারা বুঝতে পারলেন ঘরের শত্রুকে বিনাশ না করলে বাইরের শত্রুদের বিনাশ করা আরও কঠিন হবে। রাজা ওদের শত্রু নন, শত্রু হলাম আমি।

সেই বিশে জুন, আমাদের পলায়ন-বার্ষিকী। তুলেরির চারদিকে জনতার ভিড় জমতে লাগল। ওদের গলায় ধ্বনি উঠছে। 'ভেটো নিপাত যাক।' 'জাতির শত্রুর বিনাশ হোক।'

জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওদের। মাথায় নোংরা লালটুপি, ওদের হাতে ছুরি আর লাঠি। রক্তের লোভে উন্মত্ত। প্রাসাদে এসে পৌঁছলো ওরা। ছেলেদের নিরাপত্তার জন্যে দোতলায় ছুটলাম, ওখানে ওরা রয়েছে মাদাম তুরজে আর মাদাম ল'ব্যালের হেফাজতে।

'ওরা রাজাকে ধরেছে।' ল'ব্যাল বললো।

'আমি যাচ্ছি রাজার কাছে।' চিৎকার করে বললাম। 'বিপদের মুখে রাজার কাছেই থাকা উচিত আমার। ছেলেমেয়েকে পাহারা দাও। 'কিন্তু একজন পাহারাদার আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো। 'মাদাম, যাবেন না, ওরা আপনাকে খুঁজছে। আপনাকে দেখতে পেলে ওরা পাগল হয়ে যাবে। এখানেই থাকুন, রাজকুমার আর রাজকুমারীর সঙ্গে।

ছেলে তখন আমার পোশাক ধরে টানছে। 'মামণি, আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদের সঙ্গে।' প্রহরীটি তখন আমাদের দেওয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে আমার ছেলেমেয়ে, মাদাম তুরজে, ল'ব্যাল আর পরিবারের অন্যান্য-দের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাদের সামনে একটা টেবিল টেনে খানিকটা ঘেরার ব্যবস্থা করলেন।

'ওরা তোমাকে মারবার জন্যে এসেছে।' এলিজাবেথ বললো। 'আমি এগিয়ে যাচ্ছি। ওরা আমাকে তুমি বলে ভুল করবে। সেই সুযোগে বাচ্চাদের নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালাবার সুযোগ পাবে তুমি।'

প্রতিবাদ জানালাম। প্রহরীও ওকে যেতে দিলো না। সে জানালো, জনতা সারা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। জাতীয় রক্ষীরা আমাদের রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলো। ওদের একজন আমার মাথায় একটা লালটুপি পরালো, রাজকুমারের মাথায়ও গলিয়ে দিলো আর একটা।

ওদিকে রাজার ঘর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। স্বামীর ভাগ্যে কি ঘটছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু পরে শুনেছি রাজা কি করে ওদের হিংস্রতাকে জয় করেছিলেন। তাঁর সেই চিরাচরিত শান্ত, ভয়হীন, একান্তভাবে নিস্পৃহ মনোভাব ওঁকে রক্ষা করেছিলো। ক্রুদ্ধ জনতা শেষ পর্যন্ত বর্শায় গেঁথে একটা লালটুপি ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো, অবলীলায় সেটি বর্শা থেকে খুলে নিয়ে মাথায় পরে নিয়েছিলেন।

'রাজার জয় হোক' বলে জনতা আমার অন্বেষণে ছুটেছিলো।

প্রাসাদের সেই বিস্তীর্ণ কক্ষে টেবিল দিয়ে ঘেরা অবস্থায় ওরা দেখতে পেলো আমায়। রক্ষীবাহিনীর আরও কয়েকজন তখন টেবিলের চারপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। অত বড় টুপিটায় রাজকুমারের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসাতে সে চিৎকার করছিলো, একজন প্রহরী সেটা খুলে নিলো। জনতার প্রতিবাদের উত্তরে বললো—লজ্জা করে না তোমাদের ? দেখছো না ছেলেটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সেই মুহূর্তে মৃত্যুর করাল ছায়া আমার সমস্ত মানসিকতাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রহরীরা বেয়নেট বের করে তৈরি হয়ে রইলো, জনতার কিছু পুরুষ ও নারী আমাকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। মাথা উঁচু করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি তোমাদের কখনও কি কোন ক্ষতি করেছি ?'

'জাতির দুঃখদুর্দশার জন্যে আপনিই দায়ী।' একজন জবাব দিলো।

'তোমাদের মিথ্যে শেখানো হয়েছে। তোমাদের প্রতারণা করা হয়েছে। ফ্রান্সের রাজার স্ত্রী আর যুবরাজের মা হিসেবে আমি একজন ফরাসী মহিলা। যে দেশে আমার জন্ম, এই জীবনে আমি আর তা দেখবো না। আমার সুখদুঃখ ফ্রান্সের সঙ্গেই জড়িত। তোমরা যখন ভালবাসতে আমায়, আমি সুখী ছিলাম।'

আমার কথায় ওর মুখে কথা সরলো না। ঠোঁট দুটি নড়তে লাগলো। রাজকুমারের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলো সে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মাফ করুন আমায়, আমি জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে আপনি ভালো মানুষ।'

এবং তাতেই সাহস পেলাম আমি। সবাইকে জানানো উচিত যে, ওদের বিশ্বাসের ভিত মিথ্যের ওপর গড়া।

ওরা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগলো। আটটা বেজে গেলো প্রাসাদ থেকে ওদের হটিয়ে দিতে। ভাঙা দরজা জানালা আর কাঁচের টুকরোর ভেতর দিয়ে আমরা যে যার ঘরে আশ্রয় নিলাম।

কিন্তু ভীতির দিন তো শেষ হয়নি। দক্ষিণ থেকে দলে দলে লোক

এসে পারীতে ভিড় করছে। ওরা উগ্রপন্থী বিপ্লবী, মার্সাইয়ের অধিবাসী। ওরা ওদের সঙ্গে আমদানী করেছে একটা নতুন ধরনের সঙ্গীত, যার রচয়িতা হলো রুগেৎ দ্য লিসলে। গানটা পারীতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যখনই গানটা শুনি, ভয়ে যেন কাঁপতে থাকি। গানটা আমায় যেন যাদুমন্ত্রে অসাড় করে তোলে। রাতের ঘুম দুচোখ থেকে পালিয়ে গেলো আমার।

জানালার বাইরে জনতার ভিড় লেগেই আছে। যে কোন দিন আমাদের ওপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে। ফিরিওয়ালারা জানালায় উঁকি দিয়ে হাঁকছে, 'একটা কিনবেন নাকি মাদাম, বেড়ে রসালো জিনিস।' দেখি ওদের হাতে আমারই নানা ধরনের অশ্লীল ভঙ্গীর মূর্তি, কোনটায় পুরুষের সঙ্গে, কোনটায় মেয়ের সঙ্গে। দেখে ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। 'আমার বেঁচে থাকার আর কোন মানে হয়?' মাদাম কঁপাকে বললাম। 'যে জীবনের কানাকড়িও দাম নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এ সব সতর্কতার বাহুল্য আমাকে লজ্জিত করছে।'

আক্সেলকেও এই ভীতির কথা জানালাম। জানালাম যে, আমাদের বাইরের বন্ধুরা যদি এমন হুমকি না দেয় যে, আমাদের ক্ষতি হলে পারী আক্রান্ত হবে, তো যে কোনদিন ওরা আমাদের হত্যা করবে। জানি, আক্সেল আমাদের জন্যে প্রাণপাত করছে। কোন সম্ভাবনাকেই ছেড়ে দিতে রাজি নয় ও। রাজার যদি তার অর্ধেকও প্রচেষ্টা থাকতো! ওঁকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছি কাজকর্মে ভাবেভঙ্গীতে সেই রাজকীয় গাম্ভীর্য আর আভিজাত্যবোধ তিনি কখন হারিয়ে বসে আছেন। আজ তিনি একতাল মাংসপিণ্ড মাত্র, নড়তে চড়তেও যেন কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ওঁর সমস্ত অবয়বটাই যেন মূর্তিমান হতাশা।

অবস্থা চরমে পৌঁছলো যেদিন কোবলেঞ্জে, ডিউক অফ ব্রুন্সউইক ঘোষণা করলেন যে, ফ্রান্সের রাজা ও রানীর ওপর অত্যাচার হলে পারী শহর আক্রান্ত হবে। ওরা যেন ঠিক এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। সারা পারী মিছিলে মিছিলে ছেয়ে গেলো। সবার কণ্ঠেই লিস্লে রচিত জাতীয় সঙ্গীত। ওরা ঘোষণা করলো তুলেরিতে বসে আমরা

প্রতিবিপ্লবের বিষ ছড়াচ্ছি।

চৌদ্দই আগষ্ট মিছিলকারীরা তুলেরির দিকে যাত্রা শুরু করলো।

ঘনিয়ে আসা ঝড়ের পূর্বাভাস পেলাম। ন তারিখের সারা দিনরাত আর দশ তারিখের সকাল পর্যন্ত পোশাক ছাড়িনি। মাদাম কঁপাঁ আর প্রিন্সেস দ্য ল'ব্যালকে নিয়ে সমস্তক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করেছি। রাজা পুরো পোশাক পরেই ঘুমুচ্ছেন। এলিজাবেথও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

দশ তারিখের ভোর সমাগত। পূবের আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। ওটা কিসের সঙ্কেত—আমাদের রক্তক্ষরণের?

'সেণ্ট বার্থোলোমিউর হত্যার সময় পারীর আকাশের চেহারা বোধহয় এমনিই হয়ে উঠেছিলো।' আমি বললাম।

আমার হাতটি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে এলিজাবেথ বললো, 'আমরা একসঙ্গেই থাকবো।'

'আমার অন্তিম মুহূর্ত যদি একান্তই ঘনিয়ে আসে আর তখনও তুমি বেঁচে থাকো…'

'বাচ্চাদের কথা বলছো তো? এমন ভাবে দেখবো ওদের যেন ওরা আমার আত্মজ সন্তান।'

ঘন স্তব্ধতা নামলো। যেন মৃত্যুর আগের মুহূর্তের নাটমঞ্চ। জাতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার মার্কুই দ্য ম'দাঁৎকে ডেকে পাঠানো হলো হোটেল দ্য ভিলে। তিনিই আগে আমাদের বার কয়েক প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তাঁকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হলো না কারও। তিনি যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই একজন খবর আনলো যে,হোটেল দ্য ভিলে যাবার পথে তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে তাঁর মরদেহ সীন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর একটু পরেই পারীর এটর্নি জেনারেল এসে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। রাজাকে ঘুম থেকে তোলা হলো।

'ভয়ঙ্কর এক মিছিল এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। ওদের উদ্দেশ্য হত্যা।' তিনি বললেন।

রাজা বললেন, প্রহরীদের ক্ষমতার ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে।

'সারা পারী ভেঙে পড়েছে এদিকে। আপনাদের পক্ষে নিরাপদ

আশ্রয়স্থল হলো জাতীয় পরিষদ। ওখানেই নিয়ে যেতে হবে আপনাদের দের তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে। অত লোকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই ফলপ্রসূ হবে না।'

'তাহলে চলুন,' রাজা বললেন, 'প্রাসাদের সবাইকে খবর দিই।'

'শুধু আপনি আর আপনার পরিবারের জন্যেই এই ব্যবস্থা।' এটর্নি জেনারেল বললেন।

'কিন্তু নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাদের ত্যাগ করি কি করে?' আমি প্রতিবাদ জানালাম। 'জনতার হাতে ওদের সঁপে দিয়ে যাবো?'

'মাদাম, এতে আপত্তি করলে রাজা আর আপনার সন্তানদের মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী হবেন।'

কি করার আছে? কঁপাঁ, লম্ব্যাল, তুরজে, একে একে সব মুখগুলোই মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো। দেখলাম, রাজকুমার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তক্ষুনি প্রাসাদ ছাড়লাম। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু লোক এসে প্রাঙ্গণে ভিড় করেছে। তবে আমাদের যাত্রায় কোন বাধা দিলো না ওরা। দূরে জনতার ক্রুদ্ধ চিৎকার আর হল্লা কানে এলো।

পরিষদ ভবনে প্রবেশ করার পর পরিষদের সভাপতি ঘোষণা করলেন যে,গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিষদ রাজার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

তুলেরিতে আমার বশংবদ বন্ধুদের ভাগ্যে কি ঘটছে তাই ভেবে দুচোখে জলের ধারা নামলো আমার। তুলেরির সেই ধ্বংসস্তূপে ফিরে যাবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু কিইবা আর আসে যায়? যে অস্তিত্বের এতটুকুও দাম নেই, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই অসম সংগ্রামে নেমে আমাদের আর কি হবে?

আমাদের রাখা হলো টেম্পলে। এটা একটা দুর্গ, অন্ধকার জেলের মতো। বাস্তিলের মতোই এখানে সূর্যের প্রবেশাধিকার নেই। এখানে আমাদের বন্দী হিসাবেই রাখা হলো। ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর জ্যাকোয়েস রেনি হিবার্ট হলেন টেম্পলের হর্তাকর্তা। আদর্শবাদী বিপ্লবী নেতারা ওঁকে ঘৃণার চোখে দেখেন। লোকটা নিষ্ঠুর, অবিবেচক। বিপ্লবের ভক্ত কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, কেবল ওতে তার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ হচ্ছে বলে। এই লোকটার তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে জেনে খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। কিন্তু দলে এমন লোকেরও অভাব ছিলো না যাঁরা আমাদের এবং পৃথিবীকে দেখাতে চান যে, আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ওঁদের কাম্য নয়। ওঁরাই ক্রুদ্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ওঁরাই আমাদের জনতার অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন। এঁরা পরিবর্তন চান, চান সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে। এঁদের হাতেই তখন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো।

সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রায় আরামের ছিটেফোঁটা তখনও ছিলো। টেম্পলের বিরাট দুর্গে আমাদের বাসস্থান তৈরি হলো। রাজার জন্যে চারটি কক্ষ, এলিজাবেথ, আমার আর ছেলেমেয়ের জন্যে অন্য চারটি কক্ষ। প্রাঙ্গণে বেড়াবার সুযোগ ছিলো আমাদের যদিও অতি সতর্ক প্রহরার মধ্যে। খাবার-দাবারের প্রচুর আয়োজন ছিলো, পোশাক-পরিচ্ছদ আর বইয়েরও অভাব ছিলো না।

লুই এবং এলিজাবেথ অল্প সময়ের মধ্যেই এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে গেলো। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিলো, প্রতিবাদের ক্ষীণতম ইচ্ছেও ওরা হারিয়ে ফেলেছে। এলিজাবেথ খুবই শান্ত প্রকৃতির, এমন অবস্থাকে ঈশ্বরের ইচ্ছে বলে মেনে নিয়েছে। ওর মতো বিশ্বাস-প্রবণতা আমার

নেই। ওদের হাবভাব হলো আত্মসমর্পণের, ওরা যুদ্ধে নামতে অনিচ্ছুক। ওরা আমার হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তুললো।

লুইয়ের মধ্যে রাজার ছায়াও নেই। যেন শান্তশিষ্ট একজন নাগরিক, কোন কিছুর সাতে পাঁচে তিনি নেই। খানাপিনা আর প্রচুর ঘুম—এই হলো তাঁর নিত্যকার রুটিন। কখনও কখনও দুর্গপ্রাঙ্গণে রাজকুমারকে ঘুড়ি ওড়ানো শেখাতেন। যে সব লোক আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলো, ওঁকে দেখে তাদের বিস্ময়ের অন্ত ছিলো না। আমাকে দেখেও। আমি সেলাই করতাম, বাচ্চাদের পড়াতাম, ওদের গল্প শোনাতাম। এমন সাদা-মাটা দম্পতি সম্পর্কে কি করে এমন নিন্দে প্রচারিত হয়েছে—তার কোন কারণ খুঁজে পেতো না ওরা।

সেপ্টেম্বর মাস এসে গেলো। আবহাওয়া এখনও গরম। খবর এলো যে, প্রুশিয়া আর অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। রাস্তায় জনতার ভিড়। ওরা বলছে শিগগির আমার আত্মীয়রা পারী দখল করবে। রানীর ওপর যারা অত্যাচার করেছে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

···প্রচণ্ড হল্লা চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। আবার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। বিপদের সংকেত। একঘরে জড়ো হলাম আমরা মৃত্যুকে ভাগাভাগি করে গ্রহণ করবো বলে। আমার মধ্যে কোন প্রত্যাশা নেই। বাঁচার কোন প্রেরণাও আজকাল বোধ করি নে।

ক্রমে জনতা জানালার বাইরে এসে হল্লা করতে লাগলো। 'মারী আঁতোয়ানেৎ, জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখো। দেখে নাও তোমার জন্যে কি এনেছি আমরা।'

রাজা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই আমাকে বারণ করলেন জানালার কাছে আসতে কিন্তু তখন আমার নজরে পড়ে গেছে—বর্শায় গাঁথা রয়েছে আমার প্রিয়সখি প্রিন্সেস দ্য ল'ব্যালের কাটা মুণ্ডু। জানি, আর যে কদিন বেঁচে থাকি, সেই স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো না। সেই সুন্দর মুখ, সেই মসৃণ চুলের মাঝখানে রক্তের ধারায় ভয়াল-ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লাম আমি।···

দাঁতোঁ হুকুম দিয়েছিলো, যেসব বন্দীরা সন্দেহের তালিকায় পড়ে, তাদের যেন হত্যা করা হয়। জনতা আসুরিক উল্লাসে আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের একে একে হত্যা করেছে। ইতিহাসে সেপ্টেম্বরের সেই গণহত্যার দিন হলো সবচেয়ে কলঙ্কময়।

সেই ভয়ঙ্কর দিনের তিন সপ্তাহ পর রাস্তায় আবার হল্লা উঠলো। আবার একঘরে জড়ো হলাম আমরা। প্রহরীরা বললো, আজ জনতা ক্রুদ্ধ নয়, ওরা আনন্দে মশগুল। রাস্তায় নাচানাচি করছে ওরা। কারণ হলো ফ্রান্স এতদিনে রাজতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আমাদের প্রতি ওদের আচরণও বদলে গেলো ' রাজাকে এখন আর কেউ 'মহামান্য' বলে সম্বোধন করে না। আমরা কেউ আর রাজা রানী নই, আমরা শুধু লুই আর আঁতোয়ানেতৎ ক্যাপেৎ। রাজার মন্তব্য : ওটা আমার নাম নয়। ওটা আমার পূর্বপুরুষদের কারও কারও নাম, কিন্তু আমার নয়।

হিবার্ট আমাদের অপমান করে, মজা পাচ্ছে। সে লুইকে ডাকে 'ক্যাপেৎ' বলে। অন্যেরাও আমাদের মুখের ওপর অশ্লীল ভঙ্গী করে, আমাদের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ে, মেঝেয় থুতু ফেলে, যা মনে আসে করতে থাকে শুধু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে, রাজারানীর মর্যাদা থেকে আমাদের সজোরে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

কিন্তু এসবও যেন ব্যর্থ হয়ে গেলো একসময়। রাজা এখনও একটা প্রতীক হিসাবে জনমানসে বিরাজ করতে লাগলেন। এখনও এমন মানুষ আছেন যাঁরা গোপনে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হন।

আমাদের এখন মাত্র দুজন চাকর—তিসোঁ আর ক্লেরি। তিসোঁ বুড়ো হলেও শয়তান, বৌকে লাগায় আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে। ওরা শোয় আমার পাশের ঘরে। রাজকুমারকে আমার ঘরে তুলে এনেছি আমি। আমার মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে অন্য ঘরে শোয়। রাজা ছটায় বিছানা ছাড়েন। তারপর ক্লেরি এসে আমার, আমার মেয়ের আর এলিজাবেথের চুল বেঁধে দেয়। তারপর রাজার সঙ্গে বসে আমরা প্রাতরাশ সারি।

ছেলেকে আমি আর রাজা মিলে পড়াই। রাজার ইচ্ছে ছেলে যেন বড় হয়ে মূর্খ না থাকে। বলাবাহুল্য সদা সতর্ক প্রহরা কখনই শিথিল হয় না। এভাবেই দিন কাটছে আমাদের।

কিন্তু কোন কিছুই স্থির হয়ে থাকে না। একদিন লুই বলেছিলেন, ওঁকে ওরা হত্যা করবে না, ওঁকে সরিয়ে ফেলার অন্য কোন পন্থা ওরা গ্রহণ করবে। যেন ওঁর অনুমান সত্য প্রমাণিত হবার জন্যেই শুনলাম যে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ওঁর বিচার হবে।

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যে কোন রকমের কাটবার যন্ত্রপাতি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। ছুরি, কাঁচি এমনকি খাওয়ার জন্যে কাঁটাচামচ পর্যন্ত। খাবার টেবিলে অবশ্যই কাঁটাচামচ দেওয়া হতো কিন্তু আমাদের খাওয়া শেষ হলেই সেগুলো সরিয়ে ফেলা হতো।

একদিন সন্ধ্যায় ওঁকে বলা হলো—ওঁকে আমাদের কাছ থেকে আলাদাভাবে থাকতে হবে। এই আঘাতটা প্রচণ্ডভাবে বাজলো আমাদের। ভেবেছিলাম সবাই একসঙ্গে থাকতে পারলে যে কোন যন্ত্রণাই সহ্য হবে। অনেক কাঁদলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। লুইকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

তারপর দীর্ঘদিনের অপেক্ষা। কি হচ্ছে জানবার উপায় নেই। শুধু জানি রাজা এখন কেবল বন্দী নন, তাঁর অন্তিম সমাগত। সমস্ত শীতকালটাই খবরের জন্যে হাপিত্যেশ করে থাকতে হলো। বিশে জানুয়ারি আমাকে জানানো হলো যে, ছেলেমেয়ে এবং ননদকে নিয়ে আমি স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারি। এর অর্থ বুঝে নিতে এক মুহূর্তও সময় লাগলো না আমার। ওরা আমার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

সেই স্মৃতিও ভোলার নয়। ঘরে চারজন প্রহরী। তেলের প্রদীপ থেকে সামান্য আলোয় ঘরের সবকিছু আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রাজকুমারের হাত ধরে আমি যখন ঘরে ঢুকলাম, রাজা চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

ওঁর বুকের সঙ্গে লেপটে রইলাম। বোবার মতো, বলার কথা যেন

কবেই ফুরিয়ে গেছে। দেখলাম, এলিজাবেথ আর আমার মেয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। রাজা হঠাৎ জোরে জোরে ফোঁপাতে লাগলেন। আমার চোখের জল আর বাধা মানলো না। রাজা আমাদের শান্ত করার চেষ্টা করলেন। ওঁর কোন ভাবাবেগ নেই, শুধু আমাদের দুঃখেই কষ্ট পাচ্ছেন।

'এমনও মাঝে মাঝে ঘটে যে, পূর্বপুরুষের পাপের ঋণ কোন কোন রাজাকে শোধ করে যেতে হয়।' তিনি বললেন।

তাঁর পরনে লালচে কোট, তার ওপর সাদা ওয়েস্ট কোট, মাথার চুল সামান্য আঁচড়ানো, মুখভঙ্গিতে যেন ক্ষমা চাওয়ার ভাব ফুটে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে আমাদের একা ফেলে চলে যেতে হচ্ছে, এটাই যেন তাঁর দুঃখ।

বিচারের কথা বললেন তিনি। এমন সব প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে যেগুলোর উত্তর তাঁর জানা ছিলো না। তিনি তো কারও কোন ক্ষতি করতে চাননি। তিনি প্রজাদের মনে করতেন তাঁর আপন সন্তান। তাই তিনি বলেছেন ওদের। বিচারকদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই—অরলিঁস।

'ওর জন্যেই আমার মৃত্যুদণ্ড হলো, কারণ সর্বশেষ ভোটটা ওকেই দিতে হয়েছে।'

'আমি ওই লোকটাকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছি, প্রথম থেকেই সে আমার শত্রু ছিলো।'

স্বামী আস্তে হাত রাখলেন আমার কাঁধে, বললেন, ঘৃণা করা আমার উচিত নয়, আমি যেন এসব ব্যাপারে উদাসী হয়ে যাই। ওঁর মনোভাব আমাকে এই শেখালো যে, মৃত্যুর মুখোমুখি হবার মুহূর্ত যখন আসবে, আমি যেন ওঁর মতোই তাকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি।

বেচারা লুই-চার্লস বুঝতে পারলো যে, ওর বাবার মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই। যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে সে বলে উঠলো : 'কেন? কেন? তুমি তো ভালোমানুষ, বাবা। কে তোমাকে মারতে চাইছে? আমি তাদের মেরে ফেলবো। আমি…'

স্বামী ওকে দুই হাঁটুর মধ্যে নিয়ে বললেন, 'বাবা, প্রতিজ্ঞা করো যে,

আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ তুমি কখনও নেবে না।'

ছেলের মুখের রেখা শক্ত হয়ে উঠলো, ঠোঁট দুটি পরস্পরের মধ্যে আটকে গেলো। রাজা ওকে কোলের ওপর তুলে নিলেন। 'এখন আমি চাই, তুমি হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করো যে, বাবার শেষ ইচ্ছের অবমাননা করবে না তুমি।'

ছেলেটা শপথ নিলো, বাবার হত্যাকারীদের সে ভালবাসবে।

ওঁর সঙ্গে দেখা করার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলো। ওঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে তো?'

'আটটার সময়।' তিনি আস্তে আস্তে জবাব দিলেন। মেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলো, ওকে দেখতে বললেন।

ছেলেটা প্রহরীদের কাছে ছুটে গিয়ে অনুরোধ জানালো ওকে পারী নিয়ে সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে যাতে বাবার মৃত্যুর আদেশ সে রদ করতে পারে।

ওকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ঘরে ফিরে বিছানার ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম। আমার দুধারে আমার ছেলে আর মেয়ে। এলি-জাবেথ বিছানার ধারে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলো।

সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় কাঁপুনির মধ্যে কাটলো। খুব ভোরে উঠে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো বলে অপেক্ষা করতে লাগলাম কিন্তু ক্লেরী এসে আমাদের বললো, 'উনি ভাবলেন যে, আপনাদের সঙ্গে দেখা করলে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন আপনারা। তাই বারণ করলেন আপনাদের দেখা করতে যেতে।'

বসে রইলাম। স্বামীর কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং কালকের শেষ সাক্ষাতের মুহূর্তগুলো মনের আয়নায় ভেসে বেড়াতে লাগলো।

সময় কখন গড়িয়ে যেতে লাগলো বুঝতে পারিনি। হতাশার যন্ত্রণা আমাকে সম্পূর্ণ অসাড় করে ফেলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড দামামার আওয়াজে চমকে কেঁপে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে জনতার বিকট উল্লাস ধ্বনি। আমার জানালার নীচে দাঁড়ানো প্রহরী বলে উঠলো, 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।'

তক্ষুনি বুঝতে পারলাম—আমি বিধবা হয়ে গেছি।

ওরা আমায় শোকের পোশাক এনে দিলো। কালো পোশাক, পেটি-কোট, একজোড়া কালো সিল্কের দস্তানা, মাথায় জড়াবার দুটি কালো স্কার্ফ। উদাসীন চোখে ওগুলো দেখলাম। জানি আমার বিদায়ের পালাও সমাগত।

নীচে আর নামি না। এলিজাবেথ আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছাদের ওপরে যাই মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে।

জনৈক প্রহরী আমায় এনে দিলো একটি আংটি, একটি শীলমোহর ও লুইয়ের একগুচ্ছ চুল। সরকার এগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলো কিন্তু তুলেঁা নামক সেই প্রহরীটি এগুলো চুরি করে নিয়ে এসেছে। ওর বিশ্বাস আমি এতে সান্ত্বনা পাবো। লোকটা ছিলো প্রচণ্ড বিপ্লবপন্থী। সেজন্যেই ওকে আমাদের প্রহরায় লাগানো হয়েছিলো। ওরা ভুলে গিয়েছিলো যে, এই লোকটার মধ্যেও হৃদয় বলে একটা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। আরও রয়েছে ক্লেরী, তুর্গি যারা এখনও আমাদের অনুগত। তুলেঁাই সেই একান্ত দুঃখের দিনে আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলো: 'মাদাম, ফ্রান্সের একজন রাজা এখনও রয়েছে।'

সত্যি। আমার ছেলে এখন সপ্তদশ লুই। ওকে যদি জেল থেকে মুক্ত করতে পারি··যদি বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি···। আবার যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। বেঁচে থাকার এখনও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে।

আশেপাশের সবাই আমার এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলো। আমি এই ছোট বৃত্তের মধ্যমণি। এলিজাবেথ বড় বেশি চুপচাপ, বাচ্চারা নেহাত ছোট। তুলেঁা আর লেপিতার নানাভাবে বাইরের খবর আমায় দিতো। তুর্গি, যে খাবার পরিবেশন করতো, বোতলের ছিপিতে জড়িয়ে চিঠিপত্র নিয়ে আসতো। এতে জানলাম যে, লুইয়ের হত্যা সারা ইউরোপকে নাড়িয়ে দিয়েছে, এমন কি ফিলাডেলফিয়া ও ভার্জিনিয়ার লোকেরা এতে ভয়ানক দুঃখ পেয়েছে। রাজতন্ত্র এদের কারও কাম্য নয় কিন্তু এর প্রতীক-মাত্র যিনি ছিলেন তাঁকে হত্যা করা সর্বপ্রকারে নিন্দার্হ।

এসব প্রত্যক্ষ করে প্রজাতন্ত্রের নায়করা আমাদের ওপর আরও কঠোর হয়ে উঠলেন।

কিন্তু বাইরের বন্ধুদের সহায়তায় পালানো সম্ভব হতে পারে, এমন বিশ্বাস আমায় বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগালো। আরও জানতে পারলাম আক্সেল চেষ্টা করছে একদল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে আমাকে টেম্পল থেকে উদ্ধার করতে।

শুনলাম জেমাপ্পের যুদ্ধে জ্যাকোয়েস আরমাঁদ মারা গেছে। রাস্তা থেকে তুলে আনা সেই ছোট্ট শিশুটির নিষ্পাপ মুখ আমার স্মৃতিতে এখনও মুদ্রিত রয়েছে। যখন আমি সন্তানহীনা ছিলাম, নিজের সন্তানের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম ওকে। আর সেজন্যে সারাজীবন সে ক্ষমা করতে পারেনি। সে বেচারাও মারা পড়লো।

সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাতে একজন বাতিওয়ালা আসে। সঙ্গে আনে ওর দুটি ছেলেকে। ওরা বাপকে বাতি জ্বালাতে সাহায্য করে বোলে ওদের পোশাক নোংরা, ওতে তেলের দাগ। তবু ওদের ভালো লাগে আমার। বাতিওয়ালা আমার দিকে কখনও তাকায় না। ভয়ে যেন জড়সড়। বাচ্চা দুটি সতৃষ্ণ নয়নে টেবিলের ওপর রাখা খাবারের দিকে তাকাতে থাকে। কিছু কিছু ওদের হাতে তুলে দিই। ওরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে আর সতর্ক চোখে আমায় দেখে। জানি না, ভূতপূর্বা রানী সম্পর্কে ওদের কি জানানো হয়েছে।

মাদাম তিসোঁ দৌড়ে এসে ওদের জামা কাপড় হাতড়াতে থাকে যদি ওদের মারফৎ আমি কোন চিঠিপত্র পাচার করতে যাই।

একদিন বাতিওয়ালা একাই এলো। অবাক হলাম, হয়তো একটু নিরাশও।

'মহামান্যা রানী।'

চোখ তুলে তাকালাম। মনে হলো লোকটা কেমন যেন অপটু হাতে বাতি জ্বালাচ্ছে। আগের লোকটি নয়।

'আমি জারজায়ে, মাদাম। জেনারেল জারজায়ে।'

'তাই নাকি!'

'তুলোঁ বাতিওয়ালাকে ঘুষ দিয়ে কব্জা করেছে। একটা সস্তা পান-শালায় ওকে মদ খাওয়াচ্ছে। কঁৎ দ্য ফের্সেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে...'

ওর নাম শুনেই আমার প্রায় সুখে মূর্ছা যাবার অবস্থা।

'আপনাকে মুক্ত করতে ফের্সেন বদ্ধপরিকর। তিনি জানিয়েছেন যে, আপনি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই।'

'জানি উনি তা করবেন। জানতাম...'

'সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। তৈরি থাকবেন, মাদাম। তুলোঁ আর লেপিতার আমাদের সুহৃদ। তবে লেপিতার সম্পর্কে এখনও তেমন নিশ্চিত হতে পারিনি।'

দেখলাম দরজার কাছে মাদাম তিসোঁ সন্দেহজনকভাবে পায়চারি করছে। ইশারায় জেনারেলকে তা জানাতে তিনি উঠে পড়লেন।

আক্লেল তাহলে আমাকে একটুও ভোলেনি।

তুলোঁর কাছ থেকে শুনলাম পরিকল্পনা হিসেবমতো এগুচ্ছে। সে এমন পোশাক-আশাক আনবে যাতে আমার মেয়ে আর ছেলে বাতি-ওয়ালার ছেলে মেয়ে বনে যায়। আমরা পরবো মিউনিসিপ্যাল কাউন্সি-লারের পোশাক। অসুবিধে হবে তিসোঁ স্বামী-স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া। তুলোঁ অবশ্য ভেবেছে ওদের নেশায় অসাড় করে রাখবে। স্পেনীয় তামাকে ওদের খুব আসক্তি। তারই খানিকটা, নেশার আরক মিশিয়ে ওদের দেবে। ওতে কয়েকঘণ্টা ওদের চৈতন্য থাকবে না। সেই সুযোগে পালাবো আমরা। জানালাম যে, আমার একটা পাসপোর্ট চাই। তুলোঁ জানালো যে, লেপিতারের ওপর সে ভার দেওয়া হবে।

কিন্তু লেপিতার লোকটা সাহসী নয়। পাসপোর্ট তৈরি করলো বটে, কিন্তু মাদাম তিসোঁ কিছু আঁচ করে ফেলেছে এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বললো, আর একটা পরিকল্পনা করা হোক যাতে আমি একা পালাতে পারি। আমার পক্ষে সেটা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।

জারজায়েঁকে ব্যাপারটা জানালাম। স্বামীর আংটি আর চুলের গুচ্ছও

ওঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম যাতে সেগুলো তিনি প্রোভাঁস অথবা আরতোঁর হাতে দিতে পারেন।

একে একে আমার স্বপ্নের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে লাগলো। পালানোর জন্যে দ্বিতীয় একটা পরিকল্পনাও ব্যর্থ হলো তিসোঁ পরিবারের সন্দেহ-প্রবণতার জন্যে। উপরন্তু তুলেঁা এবং লেপিতারকে আমাদের প্রহরার কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

আঘাত নামলো চরমভাবে, রুদ্রমূর্তিতে। এই যন্ত্রণা এমন তীব্র-তীক্ষ্ণ যে, লিখতে গিয়েও আমার হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে তীব্রতম যন্ত্রণার পরিকল্পনা ওরাও হয়তো করতে পারবে না। এতদিনের কষ্ট, যন্ত্রণা আর হতাশার একমাত্র প্রতিষেধক ছিলো আমার সন্তান দুটি। ওদের অপমান আর নিষ্ঠুরতা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি মাতৃত্বের এই বর্মের জন্যে। ওরা এখন সেই বর্মে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হলো।

তখন জুলাই মাস। গরম, শ্বাসরোধী। সবাই মিলে একটি কামরায় ছিলাম—এলিজাবেথ, মারি থেরেসি, ছেলে আর আমি। ছেলের কোট সেলাই করে দিচ্ছিলাম এবং এলিজাবেথ একটা বই পড়ে শোনাচ্ছিলো আমাদের। এমন সময় পৌরসভার ছজন সভ্য এসে আমাদের ঘরে ঢুকলেন।

উঠে দাঁড়ালাম। 'আপনারা—'

'আমরা এসেছি লুই-চার্লস ক্যাপেৎকে তার নতুন বন্দীশালায় নিয়ে যেতে।' ওদের মধ্যে একজন বললেন।

চিৎকার করে উঠলাম। ছেলের দিকে হাত বাড়ালাম। ও ছুটে আমার কাছে এলো, চোখের তারা ভয়ে নীল হয়ে গেছে।

'অসম্ভব…'

'সরকার মনে করেন যে, ওকে শিক্ষকের আওতায় রাখা দরকার। নাগরিক সাইমন ওর দায়িত্বভার নেবেন।'

সাইমন। লোকটাকে বিলক্ষণ চিনি আমি। নীচু, অধম, একেবারে চাঁচাছোলা মুচি একটি। 'না, না, না।' আমি চিৎকার করে বললাম।

'আমাদের হাতে সময় অল্প।' আর একজনের রুক্ষ গলা।

'চলো, ক্যাপেৎ। তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো।'

ছেলে আমার স্কার্ট ধরে রয়েছে। কিন্তু ওর হাতে রুক্ষ হাতের পরশ লাগলো। ওরা ওকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদের পেছনে পেছনে ছুটলাম কিন্তু ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো, এলিজাবেথ ও আমার মেয়ে পড়ার সময় ধরে ফেললো আমায়।

ওরা চলে গেলো, নিয়ে গেলো আমার ছেলেকে। এলিজাবেথ আর মেয়ে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কিন্তু সে সব আমার কানে ঢুকছে না। ছেলের আর্তকণ্ঠের কাকুতি আমাকে তীব্র দহনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ভুলতে পারি নে, আমার প্রতি এই বর্বরতা যারা দেখালো, তাদের ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আরও কিছু বাকি ছিলো।

জীবনের সব অর্থ হারিয়ে গেলো আমার কাছে। ছেলেকে হারিয়ে আর কিই বা করার থাকে। মাতৃত্বের উর্বরতাও আর আমার মধ্যে নেই। বিছানায় পড়ে থাকি, মেয়ে পাশে বসে আমার হাত ধরে থাকে। যেন মনে করিয়ে দেয় যে, ও এখনও রয়েছে।

মাদাম তিসোঁর আচরণ কেমন যেন হয়ে উঠলো। কবে থেকে মনে করতে পারছি নে। ছেলের ভাবনা ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু নেই। ওকে নিয়ে কি করছে ওরা? মাঝে মাঝে কানে আসে মাদাম তিসোঁ স্বামীর সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়া করছে, কখনও বা গলা ছেড়ে কাঁদতে বসেছে। একদিন আমার ঘরে এসে, আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো। 'মাদাম, ক্ষমা করুন আমায়! পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি! অযথা আপনার বিপদ বাড়িয়েছি আমি! আপনার স্বামীর মতো আপনাকেও হত্যা করতে যাচ্ছে ওরা···আর সব কিছুর জন্যে আমি দায়ী। স্বপ্নে ওঁকে দেখি···দেখি ওঁর রক্তাক্ত মাথা গড়িয়ে পড়লো···আমার বিছানায়! উঃ কী যন্ত্রণা! আপনি ক্ষমা করুন···পাগল হয়ে যাচ্ছি, পাগল···'

'তুমি আদেশ পালন করেছো মাত্র।' ওকে সান্ত্বনা দিই। 'শুধু শুধু নিজেকে দোষী করে তুলো না।'

প্রহরীরা এসে ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।···

পাগল হয়ে গেলো মাদাম তিসোঁ।

জানালার একটা ফুটো দিয়ে নীচের প্রাঙ্গণ দেখতে পাই। ছেলেকে ওরা নিয়ে যায় মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে। ওকে চোখে দেখাও যে কত আনন্দের!

ওকে আর আমার ছেলে ব'লে মনে হয় না। অপরিচ্ছন্ন পোশাক, অবিন্যস্ত চুল, মাথায় নোংরা একটা লাল টুপি। তবে দেখে অসুখী বোলে মনে হয় না ওকে। বাচ্চারা অবস্থার সঙ্গে চটপট খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ওরা ওকে ওদের একজন বানিয়ে তুলছে···বিপ্লবের উত্তরসাধক। ওর শিক্ষকের কাজ হলো সেটিই, ওকে ভুলিয়ে দেওয়া যে, ওর শিরায় শিরায় রাজরক্ত বইছে, ভুলিয়ে দেওয়া যে, সাধারণ মানুষের সন্তানের সঙ্গে রাজার সন্তানের পার্থক্য।

মাঝে মাঝে গান শুনি ওর কণ্ঠে। ওদের গৃহীত জাতীয় সঙ্গীতের টুকরো। বিপ্লবের রক্ত-ভূষিত গান। ও কি ভুলে গেছে যে, ওরাই ওর বাবাকে হত্যা করেছে?

ছেলেকে নিয়ে যাবার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে দরজায় টোকা পড়লো।

সরকারের দূতরা দেখা করতে এসেছে। পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিধবা ক্যাপেৎ-এর বিচার হবে। তাকে তাই টেম্পল থেকে কঁসিয়েজ্রিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

জানি এটাই আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। আমার বিচারের প্রহসন লুইয়ের মতোই ঘটবে।

ওরা দেরি করবে না। এই মুহূর্তে তৈরি হতে হবে আমাকে। ননদ এবং মেয়ের কাছ থেকে শুধু বিদায় নেবার সময়টুকুই দিলো ওরা। 'আমি প্রস্তুত।' বললাম ওদের।···

সুতরাং আমি এখন এখানে। কঁসিয়েজ্রিতে বন্দী জীবন যাপন করছি।

ফ্রান্সের মধ্যেও এমন নির্মম জেল আর দুটি নেই। বলা হতো এটা মৃত্যুর বিকল্প মাত্র। অপেক্ষা করছি মৃত্যুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে, যেমন ভার্সাইতে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনেকেই অপেক্ষা করতেন।

অবাক্ হই যখন এখানেও দয়ামায়ার ছিটেফোঁটা দেখতে পাই। আমার জেলার মাদাম রিচার্ড দয়াবতী মহিলা। ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিছানায় জল পড়ছিলো বলে তিনি স্বামীকে ডেকে ওপরে একটা কার্পেট লাগিয়ে দিলেন। মাদাম রিচার্ডের একটি ছেলে ছিলো সে আমার ছেলের বয়সী হবে। নাম ফাঁফাঁ। বললাম ওকে আমার কাছে নিয়ে আসতে।

ফাঁফাঁকে দেখে ছেলের শোক আবার উথলে উঠলো। ওকে খুব আদর করে পাশে বসিয়ে ওর কথাবার্তা শুনলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগলো এতদিনে। ঘরের ঠাণ্ডায় বুকে খুব ব্যথা হলো। ঘরটা ছোট, দেওয়ালগুলো ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে, দেওয়ালের কাগজ অনেক জায়গায় ছিঁড়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। খাট এবং জানালার পর্দা ছাড়া ঘরে অন্য কোন আসবাব নেই। মাদাম রিচার্ড ওর ঝি রোজালি লেমরলিয়েরকেও আমার কাজে লাগিয়েছেন। এই মেয়েটিও বেশ ভালো। দুজনে মিলে ওদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা দিয়ে আমার কঁসিয়েজ্রির অন্ধকারময় জীবন যতটা সহনীয় করে তোলা যায়, তার চেষ্টার ত্রুটি করছেন না।

মাদাম রিচার্ডই জেলের প্রধান পরিদর্শক মিকোনিঁকে বললেন আমাকে যেন এলিজাবেথ ও মারি থেরেসির খবর এনে দেন। মিকোনিঁও তাই করলেন। এমন কি টেম্পল থেকে আমার পোশাক-আশাকও নিয়ে এলেন।

দীর্ঘ দিনগুলোতে কিছুই করার থাকে না। কিছু কিছু লিখি। কিন্তু সদাসতর্ক পাহারা আমার ওপর। ঘরের কোণে একজন প্রহরী সর্বক্ষণ বসে থাকে। কখনও কখনও দুজন। ওরা তাস খেলে। মাদাম রিচার্ড বই এনে দেন। তাই পড়তে থাকি। আমার লকেটে লুই-চার্লসের একটি ছবি আছে। প্রহরীর অসতর্ক মুহূর্তে তাতে চুমু খাই।

রাতগুলোও অনেক লম্বা। কোন বাতি এমন কি সামান্য মোমবাতিও আমাকে দেওয়া হয় না। বেশির ভাগ সময়ই ঝিমুতে থাকি, ঘুম তেমন আসে না।

মিকোনি আজ আমার সেলে এলেন। প্রহরীদের খানিকক্ষণের জন্যে সরিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে অপরিচিত আর একজন। তাঁর দিকে ভালো করে দেখে চিনতে পারলাম। শেভালিয়ের দ্য রুজভিল, রাজার একান্ত অনুগত মানুষ। আমার চোখে পরিচয়ের আলো ফুটতেই তিনি চট করে স্টোভে কি যেন একটা ফেলে দিলেন।

ওরা চলে গেলে স্টোভের কাছে গিয়ে দেখলাম একটা কারনেইশন ফুল, পাপড়ির সঙ্গে একটা কাগজ জড়ানো। কাগজটা খুলে পড়লাম: 'তোমাকে কখনই ভুলতে পারবো না। যারা তোমায় ঘিরে রয়েছে তাদের বশ করতে যদি তিন-চারশো লিভারের দরকার হয় তোমার, আগামী শুক্রবার তা নিয়ে আসবো।'

আমাকে উদ্ধার করার জন্যে আক্সেলের আর এক প্রচেষ্টা। এতে তার কোন ক্লান্তি নেই। তক্ষুনি লিখলাম, 'তোমার ওপর নির্ভর করছি। আমি রাজি।' কিন্তু পাঠাই কি করে? রোজালিকে দিয়ে? না, ভালো মেয়েটাকে আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে না। একজন প্রহরী, গিলবার্টকে ওটা দিয়ে বললাম, সেদিনের সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে দিতে। গিলবার্ট রাজি হলো কিন্তু পরে ভয় পেয়ে মাদাম রিচার্ডকে ওটা দেখালো। উনিও বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ওটা মিকোনি'র হাতে দিলেন।

গিলবার্ট তার উর্ধ্বতন অফিসারকেও কথাটা বলে দিলো। তাতে মিকোনি'র চাকরি গেলো আর রিচার্ডদেরও সরিয়ে ফেলা হলো।

নতুন জেলার এলো। ওদেরও দয়ামায়া আছে কিন্তু যা ঘটে গেছে তাতে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নন ওরা। দিন আর রাতের মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগলো। শিগগিরই ওরা আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

সেই দিন এসে গেলো। সকালে আমার সেলের দরজা খুলে গেলো। প্রবেশ করলো একজন কোর্টের দ্বাররক্ষী আর কয়েকজন ফৌজি-পুলিস। ওরা আমাকে বিচারকক্ষে নিয়ে যাবে।

বিপ্লবী ট্রাইবুনাল বসেছে। পাবলিক প্রসিকিউটরের সামনে একটা

বেঞ্চে আমাকে বসতে দেওয়া হলো। মাত্র দুটি মোমবাতির আলোয় ঘরটি সামান্য আলোকিত।

ওরা আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। বললাম, 'অস্ট্রিয়ার লোরেন নিবাসী মারী আঁতোয়ানেৎ।'

'বিপ্লবের আগে বিদেশের শক্তিগুলোর সঙ্গে আপনার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিলো যা ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী। এর থেকে আপনি অনেক সুবিধে আদায় করেছিলেন।'

'এটা সত্য নয়।'

'আপনি আপনার আরাম আনন্দের জন্যে ফ্রান্সের অর্থনীতিকে তছনছ করেছেন, যা নাকি জনগণের শ্রমের ফসল।'

'না।' বললেও মনে মনে জানি এই ব্যাপারে আমি অপরাধিনী।

'বিপ্লবের পরে বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগসাজসে ফ্রান্সের মুক্তিকে আপনি বারে বারে বিড়ম্বিত করেছেন।'

'বিপ্লবের পরে আমি বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগ পাইনি, ঘরের ব্যাপারেও নাক গলাইনি।'

'লুই ক্যাপেৎকে আপনিই শিখিয়েছিলেন প্রকৃতই ভান করতে যাতে ফরাসী জনগণকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঠকিয়েছেন।'

জবাবে শুধু মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালাম।

'১৭৯১ সালে পারী ছাড়ার সময় আপনিই দরজা খুলে সবাইকে বের করে নিয়েছিলেন। লুই ক্যাপেৎকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ আপনিই দিয়েছিলেন।'

'দরজা খোলার এই অর্থ হতে পারে না যে, অন্য কারও কার্যাবলীকে আমিই নিয়ন্ত্রণ করেছি।'

'মুক্তিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় আপনার প্রচেষ্টায় কোন বিরতি ছিলো না। যে কোন দামে ফরাসী সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দেশপ্রেমিক-দের নাজেহাল করতে আপনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।'

'সিংহাসন পুনরুদ্ধারের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা তাতেই আসীন ছিলাম। ফ্রান্সের মঙ্গল ছাড়া আমাদের আর কিছুই কাম্য ছিলো না।

যতদিন ফ্রান্সে সুখ বিরাজ করেছে, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম।'

'আপনি কি মনে করেন জনগণের সুখের জন্যে একজন রাজার প্রয়োজন?'

'কোন মানুষ এককভাবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই আপনি দুঃখিত যে, আপনার ছেলে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জনগণ যদি রাজতন্ত্র ধ্বংস না করতো আপনার ছেলেই তো সিংহাসনে বসতো।

'ছেলের জন্যে আমার কোন খেদ নেই যতক্ষণ তার স্বদেশ সুখে রয়েছে।'

প্রশ্নের ধারার বিরতি ছিলো না। ওরা জিজ্ঞেস করলো ত্রায়ানোর খরচ কে জুগিয়েছে।

'ত্রায়ানোর জন্যে আলাদা একটা তহবিল ছিলো।'

'ত্রায়ানোতেই কি মাদাম দ্য লা মোৎ-এর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো আপনার?'

'ওর সঙ্গে কখনই দেখা হয়নি আমার।'

'কিন্তু হীরের হারের ব্যাপারে ওই তো হলো আপনার শিকার।'

'ওর সঙ্গে কখনই দেখা হয়নি আমার।'

ওই দানবগুলো এর পর কি বললো? আমি বেঁচে আছি, না নরকের অতলতায় ডুবে গেছি কয়েক মুহূর্ত তাই বুঝতে পারলাম না। আমার ছেলে সম্পর্কে কি যেন বলছে ওরা? আমাদের যৌন অনাচার সম্পর্কে অভিযুক্ত করলো ওরা, আমার নিজের ছেলে! আট বছর মাত্র ওর বয়স। ওই জংলী, অসভ্য, খেকশেয়াল হিবার্টটা কোর্টে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি নাকি আমার ছেলেকে নীতিবিগর্হিত আচরণ শিখিয়েছি···যে আমি··· না, কলমের মুখে আসছে না আমার···এমন কদর্য, এমন অকল্পনীয়, অসহ্য।

আমার ছেলে নাকি স্বীকার করেছে আমরা এসব অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছি·· সে, আমি আর এলিজাবেথ···তার ধর্মপরায়না পিসী আর আমি···তার মা।

নিজেকে ছাড়িয়ে অনেকখানি দূরে চলে গেলো আমার দৃষ্টি। প্রাঙ্গণে খেলছে একটা ছোট্ট শিশু···মাথায় নোংরা লাল টুপি, ওর গলায় অসংস্কৃত গানের কলি···ওই অসভ্যগুলো শিখিয়েছে ওকে।

বিবরণীর খানিকটা কানে গেছে আমার। ওকে নিয়ে যাওয়া হয় ওর দিদি আর পিসীর কাছে। ওরা অবশ্যই এসব কথা অস্বীকার করেছে। এ লোকগুলোর মন্তব্য হলো—এসব অনাচারের কথা কেউ কি আর স্বীকার করে?

ওরা কি করে তুলেছে ছেলেটাকে! ভাবতেই ভয়ে আড়স্ট হয়ে যাচ্ছি। ওরা অত্যাচার চালিয়েছে ওর ওপর···খেতে দেয়নি, মারধোর করেছে। সে, ফ্রান্সের রাজা, আমার ছেলে, আমার নয়নের মণি।

হিবার্টকে দেখেই কি বিচারকরা বুঝতে পারছে না যে, ওটা একটা নরকের কীট? আবার আমার দিকে ধূর্ত চোখে তাকাচ্ছে। দানব একটা! এই পৃথিবী ওর জন্যে নয়। ভগবান, আমার ছেলেকে ওর হাত থেকে রক্ষা করো।

মনে হচ্ছে যেন সংজ্ঞা হারাচ্ছি। নিজেকে সোজা রাখার জন্যে জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন মনে পড়লো জেলেও অন্য মহিলা আমায় মমতা দেখিয়েছেন। এখানে, এই বিচারসভায়ও মায়েরা রয়েছেন, আমার মনোভাব ওরা ঠিকই বুঝতে পারছেন। আমি রাষ্ট্রের শত্রু হতে পারি, বদমেজাজী, গোঁয়ার, ফ্রান্সের অর্থনীতিকে তছনছ করা—সবই করতে পারি, কিন্তু আমি তো মা, আমি আমার ছেলেকে ভালবাসি। ওঁরা নিশ্চয়ই আমার সমর্থনে এগিয়ে আসবেন।

হিবার্টও যেন বুঝতে পারলো। ওকে অস্বস্তিবোধ করতে দেখলাম। শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা আর অনীহার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। আমি এখন রানী নই, আমি শুধু মা, একজন দানব অনাচারের অভিযোগ এনেছে আমার বিরুদ্ধে।

'বন্দী তো এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করলেন না।' কেউ একজন বললো।

'যদি জবাব না দিয়ে থাকি তার কারণ কোন মায়ের বিরুদ্ধে এমন

অভিযোগ প্রকৃতিকে মূক করে তোলে। এখানে উপস্থিত সব মায়ের সামনে এই আবেদন আমি রাখছি।'

অসন্তোষে সারা সভা গজগজ করতে লাগলো।

'বন্দিনীকে নিয়ে যাও।'

সেলে ফিরে এলাম। রোজালি অপেক্ষা করছিলো আমার জন্যে। আমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করলো, কিছু মুখে ঢুকলো না আমার। ও আমাকে শুইয়ে দিলো।

ও জানালো যে, আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনায় রোব্‌স্‌পীয়ের নাকি হিবার্টের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছেন। সবাই জানে—এসব মিথ্যে। ছেলের প্রতি আমার ভালবাসায় কারও এতটুকু সন্দেহ নেই। রোব্‌স্‌পীয়ের এই ভেবে শঙ্কিত হয়েছেন যে, আরও খানিকক্ষণ বিচার-সভায় রাখলে সব মহিলারা বিচারকদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমার মুক্তি দাবী করতেন আর ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে বলতেন।

আবার কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো আমায়। নিজের পাপের পূর্ণ বিবরণী আমায় শোনানো হলো। স্বামীকে কুকাজ করতে বাধ্য করিয়েছি আমি, ত্রায়ানো আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে দেশের অর্থ নষ্ট করেছি, স্বজন পোষণেও আমার জুড়ি নেই। কিন্তু যৌন অনাচারের অভিযোগ আর উঠলো না।

তারপরই জুরিদের মতামত চাওয়া হলো। আমাকে অন্য একটা ছোট কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

অনেকক্ষণ পরে জুরিরা তাঁদের মতামত দিলেন আমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছি। শাস্তি—মৃত্যু।

ঘরে বসে লিখছিলাম। কাহিনীর আর বিশেষ বাকি নেই।

প্রথমে এলিজাবেথকে লিখতে হবে। ছেলে যা বলেছে তাতে ওর নরম মনে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ওকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে।

'বোন, শেষবারের মতো তোমাকে লিখছি। একটু আগে আমার শাস্তিবিধান হয়েছে। লজ্জাজনক মৃত্যু নয়, মৃত্যুর জন্যে লজ্জিত হয় শুধু

অপরাধীরা, আমি তোমার দাদার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। তাঁর মতোই নির্দোষ বোলে শেষের মুহূর্তগুলো তাঁর মতোই সাহসের সঙ্গে কাটাবার আশা রাখি। আমি একান্তই শান্ত কারণ আমার আচরণে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই। সন্তানদের ত্যাগ করে যাবার দুঃখটাই বড় বেশি করে বুকে বাজছে। তুমি তো জানো যে, ওদের এবং তোমার জন্যে আমি বেঁচে ছিলাম। তোমাকে যে অবস্থার মধ্যে ফেলে যাচ্ছি তাতে আমার শান্তি নেই। আমি তো জানি নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তুমি কেমন করে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে।…'

সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমাকে নিতে গরুর গাড়ি আসবে। ওরা আমার চুল ছেঁটে ফেলবে, পিছমোড়া করে আমার হাত দুটো বাঁধবে। প্রসিদ্ধ রাজপথ ধরে আমার গাড়ি চলবে যা দিয়ে অতীতে আমার প্রখ্যাত বন্ধুরা চলাফেরা করেছে…লুইও ওই পথ দিয়েই গেছেন, আমিও একবার সাদা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ওই পথ দিয়ে গেছি যখন ম`সিয়ে ত্থ ব্রিশাক আমায় বলেছিলেন যে, দুলক্ষ ফরাসী আমার প্রেমে পড়ে গেছেন…যাবো রু সাঁ হোনোরে দিয়ে যেখান থেকে মাদাম রোজ বার্তিন হয়তো আমায় দেখতে থাকবে, যাবো বিপ্লবের প্রাসাদে দানব গিলোটিনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

ওরা সেই চিৎকার ওঠাবে যা আগে আরও বারকরেক শুনেছি। যেতে যেতে নিজের প্রাণের কথা ভাববো আমি। রাস্তার দিকে তাকাবো না যেখানে জনতা আমার রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছে। ভাববো লুই-এর কথা যিনি আমার আগে মহাপ্রয়াণ করেছেন, ভাববো আক্সেলের কথা যে এখনও আমার দুঃখে আত্মহারা…কিন্তু দুঃখ করো না প্রিয়তম, আমার সব যন্ত্রণার অবসান হতে চলেছে। ভাববো আমার ছেলের কথা, প্রার্থনা জানাবো তার জীবনে যেন প্রচণ্ড দুঃখ না নেমে আসে। সোনা আমার…ওসব কিছু না। আমি ক্ষমা করেছি তোমায়…কি বলেছো তা তোমার জানা নেই।

এখন প্রার্থনা জানাই যেন অন্তিম যাত্রার মুহূর্তে আমি আমার মায়ের

সত্যিকারের সন্তান হতে পারি, তিনি যে ভাবে চেয়েছিলেন সেই সাহসের সঙ্গেই মৃত্যুকে আমি যেন স্বাগত জানাতে পারি।

আর লেখার সময় নেই। ওদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

আমার মানসিকতায় অখণ্ড শান্তি নেমে এসেছে। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সবচেয়ে কঠিন যা ঘটার ঘটে গেছে। তীব্রতম যন্ত্রণার শিকার হয়েছি আমি। তীক্ষ্ণ যে আঘাতটা এখনও বাকি তাতে আমি মুক্তি কিনে নেবো।

আমি প্রস্তুত। একটুও ভয় পাচ্ছি নে। বেঁচে থাকতে গেলেই সাহস চাই—মরতে তার প্রয়োজন থাকে না।

লেখকের কথা

একটা কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়া ভালো। এই বইয়ের গ্রন্থনায় আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কিছুই নেই। আখ্যানভাগের প্রায় অনেকখানিই গ্রহণ করেছি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে, রানী এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলোর হাবভাব, কথোপকথন ভিক্টোরিয়া হোল্টের 'দি কুইন্‌স্‌ কনফেশন' নামীয় বিখ্যাত উপন্যাসটি থেকে। গ্রহণ বর্জনের রীতিটুকুই শুধু আমার ব্যক্তিগত। পাঠক-পাঠিকার অনুসন্ধিৎসা যদি এতে খানিকটা মেটে, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।